জবার বদলে

কাল যমুনার বিয়ে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৬৮

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও আর. বি. মণ্ডল কর্তৃক ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

রথীন সেন   প্রীতিভাজনেষু

শ্রীমতী মমতা সেন   সুচরিতাসু

ডবার বদলে কালো যমুনার বিয়ে

অনুতোষ সেন সত্যিই রিটায়ার করলেন।

আজ শেষ দিন। আজও কাজ নিয়ে বসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোম্পানির সতীর্থরা তো বটেই, ওপরওয়ালা কজনও বাদ সাধলেন। এমন্ কি বম্বের হেড অফিসের শ্বেতাঙ্গ কর্ণধারটিও এই একজনের বিদায় উপলক্ষে কলকাতায় এসে হাজির। বিদায়-সংবর্ধনার এমন ঘটা এই বিদেশী তেল-কোম্পানিতে এর আগে কেউ দেখেনি। অনেক সাদা চামড়ার বড়সাহেব এসেছে, গেছে। তাদের কারো কারো আসাটা যদিবা দাপটের মনে হয়েছে, যাওয়াটা বরাবরই অনাড়ম্বর। এমন কি অনেক সময় চলে যাবার পরে জানা গেছে ওমুক শাখার ওমুক বড় সাহেব হোমে ফিরে গেলেন বা অন্য কোথাও বদলি হয়ে গেলেন।

এই নামকরা বিদেশী তেল-কোম্পানির সঙ্গে সর্বসাধারণের কেনা-বেচার কোনো যোগ নেই। এদের পণ্যের গ্রাহক স্বয়ং ভারত সরকার অথবা তার আর বিভিন্ন রাজ্যের সরকার-পুষ্ট বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রি। আগে এই সংস্থায় হোমরা-চোমরারা সকলেই ছিল সাদা চামড়ার মানুষ। স্বাধীনতার পরেও আট দশ বছর পর্যন্ত প্রধান আসনগুলোতে সর্বত্র তারাই জাঁকিয়ে বসেছিল। ক্রমে সেইদিন গেছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে বড় বড় পোস্টে ভারতীয়দের পদার্পণ সহজ হয়েছে। কিন্তু সাহেবদের সেই একাধিপত্যের যুগেও যে মানুষ তাদের বিশেষ দৃষ্টি কাড়তে পেরেছিলেন তিনি এই সেন সাহেব—অনুতোষ সেন।

···সুপারিশের জোর তাঁরও অবশ্যই ছিল। তাতে তাঁর এই সংস্থায় প্রবেশপথ সুগম হয়েছে। শুধু এই জোরের ওপর নির্ভর করলে তিনি কতটা বা কতদূর এগোতেন বলা যায় না কিন্তু বহাল হবার পরে এই জোরের দিকটা তিনিই সকলের আগে ভুলেছেন। আসল পুঁজি আত্ম-বিশ্বাস, নিষ্ঠা আর দক্ষতা। কিন্তু সেদিনের ওপরওয়ালারা আরো কিছু পুঁজি লক্ষ্য করেছেন যা খুব বেশি চোখে পড়ে না। বলিষ্ঠ অথচ সহজ

স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব। এটুকু খুব সহজাত না হলে সেদিনের সাহেব-মুরুব্বিদের চোখে ধৃষ্টতা মনে হত। বরং কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কালে দিনে এই লোক অনেক উঠবে, অনেক বড় হবে। উঠেছেন, বড় হয়েছেন। বছরের পর বছর ওপরওয়ালারা তাঁর নিষ্ঠা, দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাস দেখেছেন। বলিষ্ঠ অথচ স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের মহিমা দেখেছেন। এই মহিমার গুণে সব থেকে বেশি দেখেছেন মানুষটার অনায়াস সংগঠন ক্ষমতা আর কঠিন পরিস্থিতিরও অনায়াস ফয়সল্লা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁরাই তাঁকে ওপরে তুলেছেন, বড় করেছেন।

অনেক বছর ধরে আজ এই অবসর গ্রহণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কোম্পানির ইস্ট জোন সেলস-এর কর্ণধার। এই পদমর্যাদা নিয়ে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরেছেন।

চাকরির মেয়াদ শেষেই রিটায়ার করতে চলেছেন তিনি। কিন্তু কি কর্তৃপক্ষ, কি সতীর্থ সকলের কাছেই এটা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের মতো মনে হয়েছে। কারণ যেখানে যে মর্যাদায় তিনি প্রতিষ্ঠিত, বয়েসটাই সেখানে কর্মশেষের মাপকাঠি নয়। বাধ্যতামূলক তো নয়ই। ফিজিক্যালি ফিট ও মেণ্টালি অ্যালার্ট—এই ছাড়পত্রের জোরে কম করে আরো চার-পাঁচটা বছর তিনি চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে পারতেন। এই ষাটের শেষেও তাঁর দেহ যেমন মজবুত, মনের দিক থেকেও তেমনি তাজা। দীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটি নেবার রেকর্ড নেই। কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও এই মানুষ ষাট পেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে যেতে চায় কেন এটা কারোরই বোধগম্য নয়। তিন মাস আগে এখানকার বড়সাহেবকে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন বছরের ওমুক মাসে ওমুক দিন তিনি ষাট উত্তীর্ণ হবেন। ওই দিনের পর থেকে তিনি যথাবিধি অবসর নেবেন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা কাম্য।

কোনো স্টাফের কাছ থেকে এরকম নোটিস কোম্পানি এযাবৎ পায়নি। প্রয়োজন বোধে কোম্পানিই এরকম নোটিস দিয়ে থাকে। পদস্থ কর্মচারীদের কেউ কেউ নিজের কদর বাড়ানোর এ এক মোক্ষম চাল ভাবলেন। দুই-একজন আরো উচ্চাশার গন্ধ পেলেন। অর্থাৎ, নিজেকে

ম্পরিহার্য ভাবেন বলে এভাবে মোচড় দিয়ে আরো ওপরে ওঠার আর মারো কিছু আদায়ের মতলব ভিন্ন এরকম নোটিস দেওয়ার আর কি অর্থ ়তে পারে! খুব ভাল করেই তো জানেন মুরুব্বিদের সকলেরই চোখের াণিটি হয়ে বসে আছেন।

পাকে-প্রকারে এই গোছের আভাস এখানকার বড়সাহেবের কান র্যন্ত পৌঁছেছে কিনা কেউ বলতে পারবে না। নোটিস পাবার পর দিন চয়েক খুব গম্ভীর দেখা গেছে তাঁকে। মর্যাদায় বড় হলেও দু'জনের বন্ধু ম্পর্ক। সাহেবের নিজের বয়েসও ষাট গড়াতে চলেছে, কিন্তু অবসর নেবার চিন্তা কখনো মাথায়ও আসেনি।

দিনকতক বাদে তাঁকে ঘরে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর।—কি ব্যাপার সেন, কোম্পানির বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ?

সেন সাহেবেরও অবাক মুখ। চেয়ার টেনে বসতে বসতে ফিরে প্রশ্ন করলেন, অভিযোগ আবার কবে পেশ করলাম?

—তাহলে এরকম নোটিসের অর্থ কি?

সেন হাসতে লাগলেন।—এই সাদা অর্থটা বোঝবার জন্য তুমি আমাকে ঘরে টেনে আনলে! অর্থ, নেক্সট ম্যান ঠিক করো, আর আমার প্রাপ্য গণ্ডার হিসেব কষার নির্দেশ দাও···রিটায়ারমেণ্টের দিন পনেরোর মধ্যে যা পাবার হাতে পেতে চাই—টাকার দরকার হবে।

—কিন্তু রিটায়ারমেণ্টের প্রশ্ন তোমার মাথায় আসছে কেন—হু ইজ গোইং টু আস্ক ইউ টু রিটায়ার?

—আমি নিজেই···বাধা দেবার বদলে বন্ধু হিসেবে আমি তোমার সাহায্যই আশা করব।

সাহেব থমকেছেন।—কাম স্ট্রেইট···এখানকার থেকে আর কোথাও বেটার অফার পেয়েছ?

শোনামাত্র সেন সাহেবের বিরক্ত মুখ।—তা পেলে আমার দিক থকে সেটা তোমাদের খোলাখুলি জানাতে অসুবিধে কি? আমাকে তামরা শেকলে বেঁধে রাখবে?

সাহেব থতমত খেয়েছেন।—যাক অত কথায় কাজ নেই, আমি

জানতে চাই আমার অনুরোধে তুমি এই নোটিস উইথড্র করছ কি করছ না ?

—করছি না, ওটা রেকমেণ্ড করে তুমি বম্বে অফিসে পাঠিয়ে দিলে আমি খুশি হব।

—বাট হোয়াই ? হোয়াই ডু ইউ ওয়াণ্ট টু লিভ দি কম্পানি ?

ঠাণ্ডা অথচ নিশ্চিত গলায় সেন সাহেব জবাব দিয়েছেন, ইউ আর এ গুড ফ্রেণ্ড, সো ফর ইওর ইনফরমেশন···আই অ্যাম সুন গোইং টু লিভ দিস ল্যাণ্ড···অ্যাণ্ড ছাট ফর রিজনস ভেরি মাচ অফ মাই ওউন—বাট প্লীজ, নো ফারদার ক্রস এগ্‌জামিনেশন।

সাহেব হাঁ করে চেয়েছিলেন। গম্ভীর থমথমে মুখে সেন সাহেব চেয়ার ঠেলে উঠে এসেছেন।

এই সাহেব বম্বে অফিসে কি নোট পাঠিয়েছিলেন তিনিই জানেন। বম্বে অফিসের বড়কর্তা আর মাত্র দুটি বছর থেকে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করে সেন সাহেবকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন। সেন সাহেবের এক জবাব, তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন—আর চাকরি করবেন না।

আজ সেই রিটায়ারমেণ্টের দিন।

শুধু অফিসের লোক নয়, তাঁর সঙ্কল্পের কথা শুনে মেয়ে-জামাইও আশা করেছিল শেষ পর্যন্ত মতি বদলাবে। নিতান্ত আপনার জন বলতে ঘরে স্ত্রী ছাড়া আর আছে মেয়ে-জামাই আর একটি মাত্র আড়াই বছরের নাতনী। মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি কাছেই। জামাই বড় ফার্মের মস্ত চাকুরে। রোজ সন্ধ্যায় তারা আসে। কিন্তু নাতনীর দু'বেলাই আসা চাই। আর দাদুর ছুটির দিনে এখানে থেকে যাওয়াও চাই। এইটুকু বয়েস থেকেই দাদুর সঙ্গে তার রসের সম্পর্ক। এদের ছেড়ে মানুষটা বরাবরকার মত দেশ ছেড়েই চলে যাবে এ কি বিশ্বাস করার মত কথা। জামাই মেয়েকে তার মায়ের সামনেই আশ্বাস দিয়েছে, কিছু ভেবো না, এ কখনো হয়নি—চারদিকের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে দেখে বিপ্লবী মেজাজ বিগড়েছে, আবার ঠাণ্ডা হলেই ঠিক হয়ে যাবে—স্বাধীনতার পর থেকেই তো এই রকম দেখে আসছেন, ক্ষিপ্ত পর্যন্ত হয়েছেন শুনেছি, আবার সহ্যও

করেছেন।

জামাইয়ের কথা শুনে শাশুড়ী মমতা সেন আদৌ আশ্বস্ত হতে পারেননি। বলেছেন, তোমরা তো মেজাজ দেখোনি বাবা, আমি অনেক দেখেছি, আবার ভাসুর আর ননদ বলে বয়েসকালে যা ছিল তার কিছুই দেখিনি—না দেখেও কেবল শুনেই আমার বুক কেঁপেছে···তবে আনন্দও হয়েছে সত্যি কথা। তবু আমি যেটুকু দেখেছি তাও তোমরা ভাবতে পারবে না···এখন ক'বছর ধরে দেখে যাচ্ছি, বন থেকে সত্ত ধরে আনা খাঁচায় পোরা বাঘের মত অবস্থা—তোমরা টেরও পাও না। ভিতরে যত অশান্ত বাইরে তত ঠাণ্ডা তত স্থির—টের পাবে কি করে—সপ্তাহের মধ্যে কটা রাত ভাল ঘুমোয় তারও ঠিক নেই।

মায়ের কথায় মেয়ের দুশ্চিন্তা আরো বেড়েছে, সেই সঙ্গে আরো কিছু মনে পড়েছে।—আর মা, তোমার সেই জ্যোতিষীর কথা? বাবার ধনু রাশি ধনু লগ্ন, আর কোথায় কি একটা তুঙ্গী গ্রহ—ও বিশ্বাসই করে না, ওকে বলো না?

—ওরকম থাকলে কি হয়? জামাইয়েরও এখন কৌতূহল।

এসব আলোচনায় মমতা সেনের এই মুহূর্তে খুব আগ্রহ নেই। দাপটের সঙ্গে এতকাল ধরে এত বড় চাকরি করার পর আজ রিটায়ার করে ঘরে ফিরবে—কাজ ছাড়া যে লোক একদিনে হাঁপিয়ে ওঠে, কাল থেকেই তার আর কোনো কাজ নেই—যেখানেই গিয়ে থাকা হোক, শুয়ে বসে কি করে দিন কাটবে তিনি ভেবে পান না। প্রথম দিন প্রস্তাবটা শুনেই মমতা আঁতকে উঠেছিলেন, আর তারপর উড়িয়ে দেবার মত করেই এই সব কথা বলেছিলেন। জবাবে যা শুনতে হয়েছে, তাতে অস্বস্তি আরো বেড়েছে বই কমেনি।

সেন সাহেব হেসেছেন, এমন বিষণ্ণ হাসিও মমতা কম দেখেছেন। বলেছেন, দু'চার বছর আগে হোক আর পরে হোক, রিটায়ার তো একদিন করতেই হবে—তখনো তো সামনে একই সমস্যা।

—সে তখন দেখা যাবে, পরের ভাবনা পরে—

—পরের ভাবনা আমি সর্বদা আগেই ভাবি আর সেরকম ভেবেই

অভ্যস্ত। আমি আর বেশিদিন এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব—বুঝলে? তারপর একটু থেমে আবার বলেছেন, তোমারই খুব অসুবিধে হবে···এখানে বাড়িঘর রইল মেয়ে-জামাই রইল, তুমি এদের নিয়ে থেকে যাও—কখন কোথায় থাকি না থাকি জানতেই তো পারবে—যখন ইচ্ছে হবে চলে যাবে, যত দিন ভাল লাগে থাকবে, আবার ফিরে আসবে—অত দুশ্চিন্তা করার কি আছে।

—হ্যাঁঃ, এটা একটা কথা হল। বলতে বলতে তিনি সরে গেছেন। কারণ, ভিতরের দুশ্চিন্তার ছায়াও এই মানুষের কাছে গোপন করা সহজ নয়। তাই দেখে একবার যদি মনে গেঁথে বসে একলা বেরুবে—তাহলে আর হাজার সাধ্যসাধনা করেও ফল হবে না। সেদিন সেই জ্যোতিষীর কথা মনে পড়েছিল মমতা সেনেরও। ধনু রাশি, ধনু লগ্ন—আর বৃষে তুঙ্গী রবি···

মা-কে নীরব দেখে মেয়ে তার বরকে জ্যোতিষী বচনের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছে।—বাবাও তোমার মত ঠিকুজি-মিকুজি মোটে বিশ্বাস করে না—কিন্তু বাবার সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে, মিলে যাচ্ছে। ধনু মানে হল তীরধনু, লগ্ন বা রাশি একটা ধনু হলেই সে স্থির লক্ষ্যের মানুষ—লক্ষ্যভেদ করার মেজাজ তার—বাবার রাশি লগ্ন দুইই ধনু—তার মানে স্থির লক্ষ্য স্থির নিশানা—কোনোভাবেই সেই নিশানা থেকে টলানো যাবে না নড়ানো যাবে না—যা ধরবে তা করবেই।···আর, দু'চোখ মায়ের দিকে, আর কোথায় কোন গ্রহ যেন তুঙ্গী মা?

মমতা ছোট্ট জবাব দিলেন, বৃষে তুঙ্গী রবি।

—হ্যাঁ, আর তুঙ্গী রবি মানে বুঝতেই পারছ···তার প্রবল তেজ, কোথাও কারো কাছে মাথা নিচু করবে না।

জামাই জিগ্যেস করল, কিন্তু তিনি কোথায় গেলে কোনো অশান্তির খবর কানে আসবে না ভাবছেন?

মমতা বিমনা একটু। জবাব দিলেন, কি জানি বাবা, খবরের কাগজ নেই রেডিও নেই টিভি নেই এমন কোনো জায়গা পেলে সেখানে গিয়ে বোধ হয় ভাল থাকত—এগুলোই কাল হয়েছে···।

ঘরের সকলেই সচকিত। নিচের গেটের সামনে গাড়ি থামার শব্দ এবং পরিচিত মৃদু হর্ন। ওই হর্ন শুনলেই সদা চাকর ছুটে যায়। অর্থাৎ সাহেব ফিরলেন, আর তার কিছু বয়ে নিয়ে যাবার আছে—

মেয়ে উঠে এসে দোতলার বারান্দার রেলিং-এ দাঁড়াল। বাবাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখল। গাড়িতে ফুল বোঝাই—ফুলের তোড়া ফুলের মালা। কয়েকটা মিষ্টির বাক্স, আরো কি সব উপহার-টুপহার। দেখে মেয়ের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এল। সত্যিই তাহলে বাবা রিটায়ার করে এল।

একটু বাদেই সেন সাহেব দোতলায় এলেন। তাঁর পিছনে ড্রাইভার আর সদার দু'হাত বোঝাই ফুলের তোড়া ফুলের মালা বাঁধানো ফেয়ারওয়েল অ্যাড্রেস, মিষ্টির বাক্স আর নানারকমের উপহার।

তারা কর্ত্রীর দিকে তাকাতে তিনি বললেন, রাখ কোথাও—

রেখে তারা চলে গেল। জামাইকে সুদ্ধু ঘরে দেখে সেন সাহেব সহজ গলায় বললেন, কি ব্যাপার, তুমি সুদ্ধু এ-সময়ে এখানে···আপিস ছিল না ?

—ছিল, আগে বেরিয়ে এসেছি।

সেন সাহেব হাসলেন একটু, কেন, তোমারও মন খারাপ নাকি ?

জবাব দিল মেয়ে, তুমি চাকরি থেকে রিটায়ার করলে বলে কারো মন খারাপ হতে যাবে কেন ?

টাইটা খুলতে খুলতে সেন সাহেব বললেন, তাই তো···।

স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে মমতা জিগ্যেস করলেন, ফেয়ারওয়েল কেমন হল ?

—বেশ ঘটা করেই তো হল।···কর্তারা আর কলিগরা আনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশ করল আর নির্ঝঞ্ঝাট ভবিষ্যৎ জীবন কামনা করল, আমার দিক থেকে আমিও তেমনি কম্পানির ফলাও উন্নতি চাইলাম আর সকলের মঙ্গল কামনা করলাম—

—আনুষ্ঠানিক কেন, এর মধ্যে কোনটা মিথ্যে ?

সেন সাহেবের নির্লিপ্ত জবাব, মিথ্যে নয়, তবে ঘটা করে গলা কাঁপিয়ে

বলার মতও কিছু নয়—আমার বিরক্তই লাগছিল।

মেয়ের ক্ষুব্ধ মন্তব্য, তোমার এখন সবেতেই বিরক্তি—

পোশাক-আশাক বদলানোর জন্য সেন সাহেব পাশের ঘরে এলেন। এ-ঘরের খাটে আড়াই বছরের ফুটফুটে নাতনী মালা ঘুমোচ্ছে। পাখার বাতাসে তার ঝাঁকড়া পাতলা চুল উড়ছে। আলনা থেকে লুঙ্গিটা টেনে নিতে নিতে ওকে দেখলেন একটু। খাটের পাশে এসে কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে আদর করলেন। খুব সন্তর্পণে কপালের চুল কটা সরিয়ে দিলেন। এই এক জিনিস। দেখলেও মন ভরে, স্পর্শ করলেও মন ভরে। সেন সাহেবের গম্ভীর কালো মুখখানা অদ্ভুত কোমল হয়ে এল।

এ-ঘরে ফিরে আসতেই মেয়ে বলল, রিটায়ার করেছ বেশ করেছ, কতকাল আর চাকরি ভাল লাগে—এখন চল সকলে মিলে বেশ কিছু-দিনের জন্য কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি—কতবার তো তুমি একলাই ফরেনের কত জায়গায় গেছ, মায়ের বা আমাদের তো কিছুই দেখা হল না।

প্রস্তাবটা কোন বক্তব্যের সূচনা সেন সাহেব ভালই জানেন। ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসে জবাব দিলেন, সবুর কর, আগে আমি আর তোর মা দেখেশুনে কোথাও গিয়ে স্থিতি হয়ে বসি—

—তার মানে? মেয়ের গলা দিয়ে প্রায় আর্তনাদের মত বেরিয়ে এল।—তার মানে এখনো তুমি একেবারে ছেড়ে চলে যাবার চিন্তা ধরে বসে আছ? আমাদের ছেড়ে তুমি এ-ভাবে চলে যেতে পারবে? মালাকে বরাবরকার মত ছেড়ে থাকতে পারবে?

শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে মেয়ে তার শেষ অস্ত্র ছুঁড়ে বসল।

সেন সাহেবের কমনীয় কালো মুখখানা থমথমে হয়ে উঠতে লাগল। স্ত্রীর ওপরেও উষ্মা। বললেন, আমি কত কঠিন আর নিষ্ঠুর লোক তোর মায়ের কাছে এখনো জানতে বাকি আছে?

এই নিরুত্তাপ ঠাণ্ডা গলা শুনে মমতা ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত। মুখে বললেন, এর মধ্যে আমাকে টানছ কেন, আমি আবার কি বললাম!

সেন সাহেবের গলা এর পরেও চড়ল না। ভিতরে যত তপ্ত বাইরে

তত ঠাণ্ডা। এই মুখ দেখলে বা এই গলা শুনলে স্ত্রী শুধু নয়, মেয়েও ভিতরে ভিতরে ঘাবড়েই যায়। বাবা যদি চিৎকার চেঁচামেচি করে তাহলে বুঝতে পারে তার অনেকটাই মেকি।

স্ত্রীর কথার জবাবে ছুরির ফলার মত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, সব কথা না বললেও বোঝা যায়, তোমাকে তো কতদিন বলেছি মেয়ে নিয়ে নাতনী নিয়ে থাকো—এই মন নিয়ে আমার সঙ্গে যাবার জন্য সাজছ কেন? কেবল আমাকে তোমরা রেহাই দাও—এখানে আমি দিনে দিনে পাগল হয়ে যাচ্ছি—বুঝলে?

মেয়ে তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা করল—মায়ের ওপর তুমি খামকা রাগ করছ কেন বাবা, মা তো একটা কথাও বলেনি, যা বলার আমি বলেছি—

—তুই-ই বা বলবি কেন? তোদের ছেড়ে-যাওয়া ছেড়ে-যাওয়া করবি কেন? আমার শুনতে খুব ভাল লাগে? ঠাকুরের দয়ায় তোরও কিছুর অভাব আছে? টাকার জোর থাকলে এই দিনে পৃথিবীর কোন্ দেশটা আর ভয় পাবার মত দূরে? যখন খুশি তোরা আমাদের কাছে চলে যেতে পারবি না—যখন খুশি তোর মা এসে তোদের দেখে যেতে পারবে না? তোদের ছেড়ে আমরা একেবারে স্বর্গে চলে যাচ্ছি?

স্ত্রী নির্বাক। মেয়ে চুপ। একটু উসখুস করে জামাই এই প্রথম মুখ খুলল।—একটা কথা বলি?

ইজিচেয়ারে মাথা রেখেই সেন সাহেব তার দিকে ঘাড় ফেরালেন। অর্থাৎ বল।

—আপনার এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটা কি প্রকারান্তরে পালানো নয়?

এই বেপরোয়া প্রশ্ন শুনে মেয়ে মনে মনে প্রমাদ গুনল, মায়ের মুখেও শঙ্কার ছায়া। সেন সাহেবের তেমনি ঠাণ্ডা মুখ। দু চোখ জামাইয়ের মুখের ওপর স্থির একটু। সামান্য মাথা নাড়লেন।—হ্যাঁ, পালানো।··· তোমার আমার সকলের সব থেকে প্রিয় কি?···নিজের প্রাণ, নিজের দেহ। এত প্রিয় যে দেহ থেকে প্রাণকে আলাদা ভাবে না—তফাত করার

কথা চিন্তাও করে না। কিন্তু যন্ত্রণা অসহ্য হলে ? সেটা এত প্রিয় দেহটাকে কুরে কুরে খেতে থাকলে ? অমন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোনো উপায় না থাকলে ? মানুষ তখন আত্মহত্যা করে এত প্রিয় দেহ ছেড়েও পালাতে চায় না ? নিজে হাতে নিজের প্রাণ নেয় না ? এই যন্ত্রণাটা কেমন জানে না বলেই তুমি পালানোটা বড় করে দেখছ।

কারো মুখে আর একটি কথা নেই। তিনজনেরই বুকের মধ্যিখানে যেন হাতুড়ির ঘা পড়েছে।

অমুতোষ সেন নামটা ভদ্রলোকের নিজের কাছেই এত পোশাকি যে অব্যবহারের দেরাজে আলতো করে সরিয়ে রাখার মত। কেবল স্কুল কলেজ য়ুনিভার্সিটি আর কর্মক্ষেত্রের রেকর্ডে এই নাম আছে। আর কোথাও না। সর্বত্র তিনি এক নামে পরিচিত। অন্তু বা অন্তু সেন। স্কুল কলেজ বা য়ুনিভার্সিটির রেকর্ডের নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি—পোশাকি নাম তাদেরও বেশির ভাগ জানেই না। জানে অন্তু, অন্তু সেন। কলেজ বা য়ুনিভার্সিটির আঙিনা তিনি খুব বেশি মাড়ানোর সুযোগ পাননি। কারণ ছাত্র-জীবনের বেশির ভাগ সময় জেলে কেটেছে। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকার জেলে বসে তিনি আই. এ. বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন—পাস করেছেন। এম. এ. পড়ার সময় তাঁর রাজনৈতিক কর্মস্থল কলকাতা। এখানকার জেলে বসে তিনি এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন, পাস করেছেন। স্বদেশী করে আর জেল খেটে প্রতি বছরই পড়াশুনায় ছেদ পড়েছে—এক ম্যাট্রিক ছাড়া আর কোনো পাসই আর পাঁচজনের মত সময়ে করতে পারেননি। সতেরো থেকে সাতাশ—এই এগার বছরের মধ্যে কম করে সাত বছর তাঁর জেলে কেটেছে। কিন্তু কলেজ বা য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে তাঁর যোগ থাক বা না থাক দুই বাংলারই ছাত্রমহল তাকে এক নামে চিনত—অন্তু, অন্তু সেন। জেল থেকে তাঁর আমন্ত্রণ এলেই সেটা দৈনিক কাগজের প্রথম পাতার খবর হত। আর সেই দিন সমস্ত স্কুল-কলেজে স্ট্রাইক অবধারিত। শুধু স্কুল কলেজ বা য়ুনিভার্সিটির ছাত্ররা নয়, দুই

বাংলার বয়স্ক স্বদেশী লিডার আর দাদারা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন, জানতেন। যে কোনো প্রকাশ্যে বা গোপনে ছাত্র আর যুব সংগঠনের দরকার পড়লে যাদের ভার দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন—অন্ত বা অন্ত সেন তাদের প্রথম সারির একজন।

এ তাঁর বাড়ির কারো মুখের আদরের নাম নয়। তিনি ছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে—খোকা। বাচ্চা বয়সে পুব বাংলার যে মহিলার মুখ থেকে অন্ত নামটা চালু, তাঁর মুখখানা মনে পড়লে সেন সাহেবের কালো মুখ অদ্ভুত কোমল আর কমনীয় হয়ে ওঠে। দু-চোখ আজও চিকচিক করে। সকলের মত অন্ত সেনের বাড়ির লোকও জানত তিনি সাধিকা। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। সেই থেকেই ছেলেবেলায় এই অন্ত সেনের সঙ্গেও তাঁর যোগ। সকলের মা, অন্তরও মা। আজও অন্ত সেনের মতে এই মায়ের মত সাধিকা কমই হয়। কিন্তু অপার্থিব জগৎ নিয়ে তাঁর সাধনা নয়। দেশমাতৃকার সাধনাই তাঁর আসল পরিচয়। আই. এ. পড়ার সময় অন্ত সেন সেটা প্রথম জেনেছিলেন। পরদেশী শাসনের কেনা গোলামেরা যখন শিকারী কুকুরের মত স্বদেশীঅলাদের খুঁজে বেড়াতো বা তাড়া করত—তখন এই মায়ের বাড়ি তাদের আশ্রয়। এই আশ্রয়ে অন্ত সেনও অনেক সময়ে থেকেছেন। মায়ের এমনি হাব-ভাব-স্বভাব আর সাধিকা মূর্তি যে ইংরেজ শাসনের দক্ষ চরেরাও এখানে হানা দেবার কথা ভাবেনি।···একবার মাত্র ব্যতিক্রম হয়েছিল, সেটা অন্ত সেনের বেলায়। তা-ও মায়ের প্রতি কোনো সংশয় নিয়ে তারা তাঁর বাড়িতে হানা দেয়নি। তাদের খবর এই মায়ের প্রতি অন্ত সেনের অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা—এবং সেই কারণে তাঁর মায়ের বাড়িতে আনাগোনা। ভক্তি-শ্রদ্ধার টানে যদি কখনো চুপিচুপি আসে সেই আশায় চরেরা বাড়ির চারদিকে ওত পেতে থাকত।

···সেই তেরো বছর বয়সে যোগাযোগের চতুর্থ দিনেই ওই মায়ের মুখে অন্ত ডাক। অন্ত সেন খেয়াল পর্যন্ত করেননি, সাড়াও দেননি। ভেবেছিলেন, আর কাউকে ডাকছেন। মা কাছে এসে বলেছিলেন, কি রে, ডাকছি শুনছিস না—খাবি কিছু, ঘি আর চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে দেব?

অপ্রস্তুত মুখে সেই বারো-তেরো বছরের ছেলে বলেছিল, আমাকে অন্ত বলে ডাকছেন বুঝব কি করে··· ?

—কেন, তোর ডাকনাম কি ?

—খোকা।

মা হেসে উঠেছিলেন, দূর, ও আবার একটা নাম নাকি, নরেন মহারাজ বলেন, কালেদিনে তুই মস্ত একজন হবি—তার খোকা নাম !···তার থেকে অনুতোষকে আমি অন্ত করে নিয়েছি, তোকে আমি অন্ত বলেই ডাকব।

সেই থেকে ক্রমে সকলের কাছেই তিনি অন্ত—অন্ত সেন। ছাত্রমহল, স্বদেশী লিডার আর দাদাদের মুখে। এমন কি পুলিসের রেকর্ডেও তিনি অন্ত, অন্ত সেন—এলায়াস অনুতোষ সেন।



অন্ত সেন শেষবারের মত কলকাতার জেল থেকে বেরিয়েছেন সাতচল্লিশ সালে পনেরই আগস্টের পরেই। দেশ স্বাধীন, তিনিও মুক্ত। তাই তিনি ছেচল্লিশের ভয়াল দাঙ্গা দেখেননি, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দেখেননি, সমস্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয় দেখেননি, প্রথম পর্যায়ের উদ্বাস্তু বন্যা চাক্ষুষ দেখেননি। সবই জেলে বসে কাগজে পড়েছেন। তাইতেই তাঁর ধমনীর রক্ত-চলাচল স্তব্ধ হয়েছে।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর মনের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর। পুব বাংলা তখন পূর্ব পাকিস্তান। সেখান থেকে উদ্বাস্তু এসেছে এই বাংলায় দশ লক্ষ। বেশির ভাগই তারা মধ্যবিত্ত। গ্রামে যারা চাষবাস করে খায় এরপর তারাও সেখানে টিকতে পারছে না। মানুষ উপচে পড়ছে তো পড়ছেই। পঞ্চাশটার ওপর উদ্বাস্তু শিবির। সেসব জায়গায় দুরবস্থার চিত্র দেখে তাঁর দম বন্ধ হবার দাখিল। শিয়ালদা স্টেশন নরককুণ্ড। নতুন বয়সের উদ্বাস্তু মেয়েগুলোকে ঘিরে হাঙর-কুমিরের উল্লাস। কালো-বাজারীদের লুটেপুটে খাওয়ার উৎসব। খাদ্যের অভাব। পাহাড়প্রমাণ বেকার সমস্যা। জেল থেকে বেরুনোর আরো দেড়-দু বছরের মধ্যে আরো বারকয়েক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল, মানুষের তাজা রক্তে মাটি

ভিজল।

দেশ স্বাধীন হবার পর উঁচু পর্যায়ের দেশপ্রেমিকরা অনেকে পদস্থ হয়েছেন, অনেকে অনেক রকমের দায়িত্বভার পেয়েছেন। কেউ কেউ বড় মন্ত্রী ছোট মন্ত্রীও হয়েছেন। অন্ত সেন অনায়াসে তাঁদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারতেন। এপার বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পুব বাংলার মানুষ—তাঁর কাছে পৌঁছনোর অনায়াস সুযোগও ছিল। অন্যদিকে সংগঠন জোরদার করার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের দলে ভিড়েও নিজের ভবিষ্যতের ভিত অনায়াসে গড়ে নিতে পারতেন। তাঁদের দিক থেকেও সাদর অভ্যর্থনার অভাব ছিল না।

অন্ত সেনের একটাই জবাব। এই স্বাধীনতার জন্য আমি সংগ্রাম করিনি। আমার কাজ ফুরিয়েছে।

অন্যদিকে নতুন শাসক দলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত প্রতিপক্ষও জোরদার হয়ে উঠেছে। তাঁরাও কম তৎপর নয়। শুরু থেকেই তাঁদের শ্লোগান এ আজাদী ঝুঠা হ্যায় ভুলো মাত। ফলে সংঘর্ষেরও বিরাম নেই। আগুন জ্বলছে, গুলিগোলা চলছে, স্বাধীন বাংলার মাটি স্বাধীন মানুষের রক্তে লাল হচ্ছে। শাসক দলের সঙ্গে সংস্রব কাটাবার ফলে প্রতিপক্ষ দলের হোমরাচোমরাও অন্ত সেনকে সাগ্রহে টেনে নিতে চেয়েছিলেন। পরাধীন যুগের আপসশূন্য যোদ্ধা হিসেবে এঁদের কাছেও তিনি কম পরিচিত নন।

অন্ত সেনের একই জবাব। আমার কাজ ফুরিয়েছে।

হঠাৎই স্থির করেছিলেন ব্যবসা করবেন। একজন বিজনেসম্যানের সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছিল। তিনি এই মানুষের কদর জানতেন। এই সময়ে তাঁদের মত দেশসেবকদের ব্যবসায় নামার একটা সুযোগও এসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ট্যাক্সি আর বাসের পারমিটের বেশির ভাগ এঁদের সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এছাড়া সিভিল সাপ্লাই থেকে যেসব চাল ডাল সরষের তেল ইত্যাদি আমদানি করার জন্য যে সব পারমিট বেরুত—তাও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদেরই পাওয়া সহজ ছিল। ওই

বিজনেসম্যানের অংশীদার হিসেবে এই দুই ব্যবসাতেই যুক্ত হবেন ঠিকই করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এগিয়ে এসে দেখেন বাস্তব চিত্রটা একেবারে অন্যরকম। এসব ব্যবসা করতে হলে বেশ মোটা রকমের পুঁজি দরকার। কিন্তু নির্যাতিত রাজবন্দীরা বা স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা এমন পুঁজি পাবেন কোথায়? অনেক চতুর ব্যবসায়ী এই সুযোগ নেবার জন্যই দেশসেবক খুঁজে বার করছে, তাদের মারফত বেনামীতে লাভের ব্যবসা ফেঁদে বসছে—এই লাভের পনেরো আনাই তাদের গ্রাসে। অন্তু সেনের আপাত-শুভানুধ্যায়ী এই বিজনেসম্যানটির ধারণা ছিল না যে লোকের সামনে টোপ ফেলা হয়েছে সে কত বুদ্ধি ধরে। একটু নাড়াচাড়া পড়তেই তার আসল মূর্তি বেরিয়ে এল। অন্তু সেন সরে গেলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জন্য এই পারমিটের ব্যবস্থা কোন্ সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে ঢুকছে অন্তু সেন কর্তৃপক্ষকে তাও স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন। তাতে কোনো ফল হয়নি।

বিনা পুঁজিতে ব্যবসায় নামার চেষ্টা আর করেননি। তারপর এই বিদেশী তেল সংস্থায় চাকরির সুযোগও যেন একদিন সেধেই এসেছে। তাঁর বিপ্লবী জীবন এই সংস্থার কর্মকর্তাদের জানা থাকলে তাঁরা হয়তো সভয়ে দশ হাত পিছিয়ে যেতেন। কিন্তু এখানে যাঁর সুপারিশের জোরে এসেছেন তিনিই তাঁর প্রধান ছাড়পত্র। সংস্থার নিয়ামকদের কাছে তাঁর সুপারিশ সমস্ত সংশয়ের ঊর্ধ্বে তো বটেই—হেলাফেলারও নয়। এর ওপর এম. এ. পাস যখন, এই সুপারিশের জোরে চাকরি-জীবনের শুরুটাও খারাপ হয়নি।

…এক অবাঙালী দেশপ্রেমিক শিল্পপতির এই স্নেহ অন্তু সেনের জীবনে ভোলবার নয়। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগের ব্যাপারটা এ কাহিনীর প্রসঙ্গ নয়। মোটামুটি একটা ভাল চাকরি পেলে করতে আপত্তি নেই জেনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনিই এই বিদেশী সংস্থায় তাঁর জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

এই কর্মক্ষেত্রে অন্তু সেন অন্যরকম মানুষ। শুধুই প্রবল কর্মী তিনি। কাজ ছাড়া কিছু জানেন না। দায়িত্ব নিলে তা নির্বাহ করার ব্যাপারে কোনরকম দুর্বলতার সঙ্গে আপস নেই। যত দিন গেছে, যত পদোন্নতি

য়েছে তত তাঁর নিয়মনিষ্ঠার কড়াকড়ি বেড়েছে। নিচের কর্মচারীরা তাঁকে দ্ধা করত, ভালবাসত—কারণ, প্রত্যেকের আপদ-বিপদে, এমন কি ক্তিগত সমস্যাও তাঁর গোচরে এলে তিনি নিজে এগিয়ে এসে সহায় তেন। কিন্তু তারা তাঁকে ভয়ও কম করত না। কারণ ওপরঅলা হিসেবে িনি কড়া তো বটেই, প্রয়োজনে কঠিন মানুষও। কারো কাজের গাফি- তি তিনি বরদাস্ত করতেন না। সকলে ভাবত এই মানুষ চাকরি-অন্ত াণ।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রের বাইরে তাঁর ভিতরেই সেই বিপ্লবী অন্ত সেন এই র্ঘকাল ধরে কি মর্মান্তিক ভাবে জীবিত আর ক্ষতবিক্ষত তার আভাস েবল স্ত্রী মমতা সেন একটু-আধটু পান। আর কেউ না। জানেন, শের মানুষের প্রতিদিনের ব্যথা-বেদনার খবর তাঁর মনে দাগ কেটে টে যায়। দিনের বেলা তুখানা খবরের কাগজ পড়ার সময় হয় না, াখ বোলান শুধু। রাতে খুঁটিয়ে পড়েন। আজও মানুষের যন্ত্রণার সঙ্গে কাত্ম না হয়ে পারেন না। তাঁর ব্লাড-প্রেসার চড়ে। সব রাতে ভাল ঘুম য় না।

…এই স্বাধীনতার জন্য আহার-নিদ্রা ছেড়ে, স্বাস্থ্য খুইয়ে, কুকুরের ত তাড়া খেয়ে বছরের পর বছর কেটেছে ; এই স্বাধীনতার জন্য পরদেশী াসনের বুলেটে যে কোনো মুহূর্তে বুক ঝাঁঝরা হবার সম্ভাবনা তুচ্ছ করে রাধীনতার শিকল ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এই স্বাধীনতার জন্য ীবনের একটা সেরা কাল জেলে কাটিয়েছেন, তাদের অত্যাচারে কত র শরীরের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে…এই প্রায় বার্ধক্যে সেই সব খগুলো মনে পড়ে অন্ত সেনের, যাঁদের আঙুলের ইশারায় মৃত্যুপণ করে াপিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা করতেন না তাঁরা।…পুব বাংলার সেই াধিকা মা, নরেন মহারাজ, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি, পুলিনবিহারী দাস, দারেশ্বর সেন, ত্রৈলোক্য মহারাজ, চারু রায়, তুর্গেশ ভট্টাচার্য—এমনি ারো কত মুখ। লাল্লু কোচোয়ান আর ফুলি বিবির মুখ। সকলেরই ঘনিষ্ঠ ন্নিধ্যে এসেছিলেন অন্ত সেন। সেই দিনের যাঁরা দিকদিশারী। দেশের নুষের মন থেকে এঁরা সকলেই কি একেবারে হারিয়ে গেলেন, একে-

বারে মুছে গেলেন! আদর্শ কি এখন শুধু অভিধান আর বক্তৃতার শব হয়ে দাঁড়াল?

মমতা সেন মিথ্যে বলেন না, মিথ্যে ভাবেন না—যে এমন কোনো জায়গা যদি থাকত যেখানে খবরের কাগজ নেই, রেডিও নেই, টেলিভিসন নেই—সেখানে বাস করতে পারলে ঘরের মানুষ হয়তো মনের শান্তি ফিরে পেত।···রাতে কাগজ পড়তে বসেন মোটা একটা নোট বই আর কলম হাতে নিয়ে। এরকম গোটা দুই নোট বই শেষ হয়ে গেছে। সেই সাত চল্লিশ সাল থেকে এই বর্তমান পর্যন্ত এই বাংলায় কত লক্ষ প্রাণ বলি হয়ে গেছে, কতবার দেশ দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়েছে, কতবার সর্বগ্রাসী আগুন জ্বলেছে, শাসক আর প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টির সংঘাতে, এমন কি পার্টির অন্তর্দ্বন্দে কত রক্ত ঝরেছে, নকশাল আন্দোলনের সেই মৃত্যুর তাণ্ডবে মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পেরেছে, আইনশৃঙ্খলা কতভাবে ধূলিসাৎ হয়েছে আর হচ্ছে পার্টিগুলোর ছায়ায় বসে রাজ্যের সর্বত্র সমাজবিরোধীরা কি হারে তাদের কালো হাত রক্তে রাঙিয়ে নিচ্ছে—এই সমস্ত চিত্রই অন্তু সেনের চোখের সামনে।

প্রায়ই তাঁকে বিড় বিড় করে বলতে শোনা যায়।—সমস্ত কিছুর চড়া দাম, আগুন দাম, শস্তা কেবল মানুষের রক্ত মানুষের প্রাণ। চাইলেই মেলে, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়।

তাঁর এই মুখ দেখে মমতা সেনের বুকের তলায় অজানা শঙ্কার ছায়া পড়ে।

হঠাৎই একদিন হিসেব করে অন্তু সেন দেখলেন এই জুনের ঠিক মাঝামাঝি ষাট বছর হয়ে যাচ্ছে। তারপর দু-তিনদিন কিছু ভেবে মন স্থির করলেন, করে স্ত্রীর কাছে ঘোষণা করলেন, সামনের জুনের মাঝামাঝি আমার ষাট বছর পূর্ণ হবে—তার পরেই চাকরি থেকে রিটায়ার করছি।

রিটায়ার করলে আর্থিক অনটনে পড়বেন মমতা সেনের মনে এই চিন্তা নেই। থাকার কারণও নেই। একমাত্র মেয়ের খুব ভাল বিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া নিজের বাড়ি গাড়ি সবই হয়েছে। তারপরেও সম্বল

যা আছে এ জীবনে অন্তত শেষ হবার নয়। তবু শুনে মনে মনে আঁতকেই উঠলেন একটু। রিটায়ার করলে মানুষটা থাকবেন কি নিয়ে!

বললেন, ষাট বছর হয়ে গেলে রিটায়ার করতেই হয়?

—হয় না, আমার রিটায়ারমেণ্টের কথা কেউ ভাবছেও না—আমি নিজে থেকেই রিটায়ার করব—এ দেশে আর থাকবই না।

মমতা সেন বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলেন।

—শোন, পনেরই আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছিল, এই পনেরই আগস্টেই আমি এই দেশ ছেড়ে বরাবরকার মতই চলে যাব। ওই—ওই দিনই আমার কাছে ঠিক দিন।

কালো মুখ রক্তাভ হতে দেখে মমতা সেন ঘাবড়ে গেলেন।—কি বলছ বুঝতে পারছি না···বরাবরকার মত চলে যাবে মানে কি—কোথায় যাবে?

—ভাবিনি। ভাবব।···কিন্তু তুমি এত ঘাবড়ে গেলে কেন—তুমি সব ছেড়েছুড়ে না যেতে চাও না যাবে—মাঝেমধ্যে যাবে, ঘুরে আসবে। আমাকে যেতে হবে, আমি এখানে থেকে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

স্ত্রীর, মেয়ে-জামাইয়ের আশা সত্ত্বেও অন্তু সেনের সংকল্প বদলালো না। পনেরই জুন এল। তিনি রিটায়ার করলেন। অগত্যা স্ত্রীও সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। পনেরই আগস্ট আর কত দূরে।

সাতচল্লিশ সালে জেল থেকে বেরুনোর অনেক আগে থেকেই এই এলাকার প্রধান বাম দলের আর কংগ্রেসের দুই বিশিষ্টজনের সঙ্গেই অন্তু সেনের হৃদ্যতা ছিল। আজ তাঁরাও প্রবীণ আর যে যার দলের মর্যাদা-সম্পন্ন সক্রিয় কর্মী। দলীয় প্রয়োজনে, বিশেষ করে যে কোনো ইলেকশন পর্বের সময় তাঁরা আসেন। দুই তরফই অন্তু সেনকে নিজেদের সমর্থক ভাবেন। শুধু ভোট নয়, তাঁর সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দাবি করেন। চাকরির আমলে কতবার তো তাঁরা তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য ঝোলাঝুলি করেছেন। এখনকার তরুণ কর্মীরা তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের খবর না রাখলেও তাঁরা তো ভালই রাখেন। আর ধারণা না থাকলেও অনেক তরুণ কর্মী এককালের প্রবল বিপ্লবী অন্তু সেনের গল্প এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী

নেতাদের মুখে শুনেছে।

অন্তু সেনের রিটায়ার করার খবর যে করেই হোক এই দু দলের নেতার কানেই গেছে। একে একে দুজনেই তাঁরা তাঁর বাড়িতে এসে হানা দিয়েছেন। দুই তরফেরই উনিশ-বিশ একই আরজি। এই এলাকার সংগঠন জোরদার করা দরকার, আর সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার জন্য তাঁকে দরকার। দুজনেরই প্রায় একই গোছের বিস্ময়, তুমি সেই অন্তু সেন জেল থেকে বেরিয়ে এতগুলো বছর চাকরির গোয়ালে কাটালে কি করে—আশ্চর্য! আর নয়, চলে এস, খাঁটি লোকের বড় দরকার।

অন্তু সেন ভিতরে ভিতরে তেতে উঠেছেন আবার মজাও পেয়েছেন। হেসে দুজনকেই উনিশ-বিশ একই প্রশ্ন করেছেন। বলেছেন, তোমাদের বিবেচনায় আমি খাঁটি লোক বুঝলাম, কিন্তু দলে এলে আমি আমার বিবেচনায় খাঁটি লোক কজন পাব?

দু দলের দুই অন্তরঙ্গ নেতাই হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন।

সস্ত্রীক অন্তু সেনের পাসপোর্ট ভিসা সব রেডি। কয়েকটা দেশ ঘুরে আপাতত কিছুকাল অস্ট্রেলিয়ায় থেকে দেখবেন কেমন লাগে। যেখানে গেলে বুকের তলার এই স্বাধীনতা-উত্তর কালের স্মৃতি সব থেকে বেশি মুছে যাবে বাকি জীবনটা সেখানেই থেকে যাবেন।

তাঁর যাত্রার অর্থাৎ পনেরই আগস্টের মাঝে আর দিনদশেক বাকি। একমাত্র মেয়ে রোজই এসে বাবার চোখের আড়ালে মায়ের কাছে কান্নাকাটি করে। মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মমতা নিজেও ঘনঘন চোখ মোছেন। শ্বশুরকে তাঁর সংকল্প থেকে টলানো যাবে না বুঝে জামাইও চুপ মেরে গেছে।

এরই মধ্যে অন্তু সেনের চোখের ওপরে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

এই দিনের বিচারে এটা এমন কিছু মর্মান্তিক ঘটনা নয়। এক একটা এলাকায় হামেশাই এরকম ঘটছে। প্রতিদিনের কাগজ খুললে কোনো না কোনো এলাকায় এমন একটা দুটো ঘটনা চোখে পড়বেই। পড়ে বলেই

অন্তু সেনের সংকল্প আরো স্থির, আরো অটল। এও সেই দলীয় সংঘর্ষের একটা চিত্র। কোন এলাকায় এখন আর মস্তান নেই। বিভিন্ন পার্টির তারাই মাতব্বর, তারাই শক্তি। তাদের প্রত্যেকের পিছনে উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া তরুণ শক্তি। এদের কেউ বিপাকে পড়লে বা কাউকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেলে পার্টির দাদারা কোমর বেঁধে সাহায্যে এগিয়ে আসে। প্রত্যেক দলেরই কিছু না কিছু জোরের খুঁটি আছেই। আজ এ-দলের কারো একজন খুন হচ্ছে, কাল ও-দলের বদলা নেবার পালা। আজ এ-দল ছোরাছুরি বোমা-বন্দুক নিয়ে অতর্কিতে হানা দিয়ে যাচ্ছে, সুবিধে মতো ও-দল একই রণসাজে এসে তার জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

মানুষের প্রাণ সব থেকে শস্তা। রক্ত সব থেকে সুলভ।

এরকম একটা ঘটনাই অন্তু সেনের চোখের ওপরে ঘটে গেল সেদিন। কাগজে এরকম ঘটনা পড়ার প্রতিক্রিয়া একরকম, চোখের সামনে দেখার মানসিক বিপর্যয় অন্যরকম।

ছেলেটার নাম নয়ন সরকার। বয়েস বড়জোর চব্বিশ পঁচিশ। তার প্রতাপ আর প্রতিপত্তিতে পাড়া তটস্থ। অল্পবয়সী ছেলেরা তাকে মস্ত হিরো ভাবে। তার নেকনজরে পড়ার জন্য ছটফট করে। তার শাগরেদরা কোনো বাড়িতে যদি বলে, এটা চাই বা এজন্য এত টাকা চাই—নয়নদা বলে দিয়েছে, কারো ঘাড়ে এমন মাথা নেই যে দেবে না বা আপত্তি করবে। দুর্গা পুজো, কালী পুজো বা সরস্বতী পুজোর সময়ে কোন দোকানদার বা ব্যবসাদারকে কত টাকা চাঁদা দিতে হবে—চাঁদার খাতায় সেই অঙ্ক আগেই লিখে দেয়। দিতে হবে মানে দিতেই হবে, অসুবিধের কথা বলা বা আপত্তি করা ধৃষ্টতা। পারতে কেউ করে না। নয়ন সরকার বা তার লোক বাজারে গেলে জিনিসের দাম অন্যরকম। দিনে দিনে তার দল যেমন পুষ্ট হচ্ছে, দাপটও তত বেড়ে চলেছে। সে এ পাড়ার পার্টি-সংশ্লিষ্ট দু-দুজন দাদার ডান হাত—দরকার পড়লে তাদের মারফত পার্টির একাধিক নেতাও তার নাগালের মধ্যে।

মনে মনে নয়ন সরকারকে অন্তু সেন ভদ্র পাড়ার মধ্যে ক্যানসার গাছের একটা বিষাক্ত ছেলে ভাবতেন। সেই ছেলে বছরখানেক আগে

একবারই তাঁর মুখোমুখি হয়েছিল। কোনো উপলক্ষ নেই, হঠাৎই ওই ছেলের খেয়াল হয়েছে পাড়ায় ঘটা করে কাঙালিভোজন করাবে। কম করে তিন হাজার কাঙালিকে খাওয়ানোর প্রোগ্রাম। নয়ন সরকারের শাগরেদরা কোমর বেঁধে ব্যবস্থায় লেগে গেছে। ব্যবস্থা মানে চাঁদা। এবারের চাঁদা আদায় হবে শুধু পাড়ার ভদ্রলোকদের বাড়ি বাড়ি থেকে।

পাড়ার বিশিষ্ট জন হিসেবে অন্তু সেনের বাড়িতে জনা পাঁচেক শাগরেদসহ নয়ন সরকার নিজেই এসেছিল চাঁদা নিতে। এসে বিনীত নমস্কার করেছে, বিনীত ভাবেই আসার উদ্দেশ্য বলেছে।

অন্তু সেনও তেমনি ঠাণ্ডা মুখে জিগ্যেস করেছেন, কাঙালিরা কি তোমার কাছে খেতে চেয়েছে?

—আজ্ঞে না, আমরাই ঠিক করেছি।

—তা তোমার নিজের যখন খাওয়াবার পুঁজি নেই, আমাদের ওপরেই নির্ভর—তখন ঠিক করার আগে আমাদের মতামত নিলে না কেন?

নয়ন সরকার ভিতরে ভিতরে তেতে উঠল, এরকম শুনতে অভ্যস্ত নয়। জবাব দিল, তার দরকার হয় না, আমরা যা ঠিক করি তাই হয়ে থাকে।

—ও···তা আমাকে কি করতে হবে?

—তিন হাজার লোক খাবে, আপনি চালের দায়িত্ব যতটা সম্ভব নিন।

—কি করে নেব, আমি চালের কারবার করি?

কঠিন দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে নয়ন সরকার জবাব দিয়েছে, টাকা দিয়েও দায়িত্ব নেওয়া যায়, চালের জন্য আপনি শ'তিনেক টাকা দিন—

টাকার অঙ্ক নির্ধারিত করে এভাবে কথা বলার ফল বুঝিয়ে দেবার মতো চোখের চাউনি।

—তিন পয়সাও দেব না! অন্তু সেনের গলা আরো ঠাণ্ডা।

—দেবেন না?

—তুমি কানে কম শোনো?

ছেলেটার চাউনি এবারে ছুরির ফলার মতো তাঁর মুখের ওপর স্থির কয়েক পলক।—আপনি বোধ হয় জানেন না আপনার কাছে কে এসেছে, জেনে নেবেন···আমার এই বন্ধুরা কাল আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে আসবে—দিয়ে দেবেন।

—না দিলে ?

—না দিলে তিনদিনের মধ্যে আপনি বুঝতে পারবেন কাজটা ভাল করলেন না।

অন্ত সেনের গলা এর পরেও এতটুকু চড়েনি। তেমনি অমায়িক গোছের ঠাণ্ডা।—ভাল কথা। কিন্তু তার আগে তুমি এ এলাকায় পার্টির যে নেতাকে বাবা ভাব, তার কাছ থেকে জেনে নাও তুমি কার কাছে এসেছ—জান না বলেই তোমার মুখের ও-কথার পরেও আমি তোমাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিইনি—সেরকম অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছে থাকলে বন্ধুদের না পাঠিয়ে কাল নিজেই টাকা নিতে এস।

পাড়ার এত বড় মস্তান, এত বড় হিরো এ-কথা শুনে সত্যিই থমকে-ছিল একটু। নিজেব চোখ আর কান দুটোকে কি অবিশ্বাস করবে ? তার শাগরেদদেরও মুখের অবস্থা তথৈবচ। ঝড়ের মতই বেরিয়ে গেছে তারপর।

অন্ত সেন এ-সব ছেলের চরিত্র খুব ভাল করে জানেন। মাথায় আগুন জ্বললেও কিছু করে বসার আগে থমকাবে, ভাববে সব জেনেশুনেও এমন দুঃসাহসের কথা যে বলতে পারে তার জোরের উৎসটা কোথায়। দলের নেতা বা নেতৃস্থানীয় কেউ অথবা পুলিসের খোদ কর্তা কেউ হাতের মুঠোয় না থাকলে পাড়ায় নয়ন সরকারকে এমন কথা কেউ বলে কি করে ?

তাই হয়েছে। পরদিনই নয়ন সরকার আবার এসেছে। সঙ্গে পার্টির পাড়ার দুই দাদা আর সঙ্গে প্রাক্-স্বাধীনতার কাল থেকে সুপরিচিত সেই নেতাটি যিনি বিপ্লবী অন্ত সেনকে দলে টেনে নিতে পারার আশা আজও ছাড়েননি।

মুখ কাঁচুমাচু করে নয়ন সরকার অন্ত সেনের পা ছুঁয়ে ঝট করে প্রণাম ঠুকে ফেলল। বলল, খুব অন্যায় হয়ে গেছে···আমাকে ক্ষমা করুন।

তাদের নেতাটি হা-হা করে হেসে বলেছেন, ওরা তোমার সেই মূর্তি জানবে কি করে বল, আমার মুখেই শুনেছে যে এখনো তোমাকে দলে পেলে পার্টির সব মুরুব্বিই তোমাকে মাথায় করে নেবে।

জবাবে অন্ত সেন বিরস মুখে হেসেছিলেন একটু, বলেছিলেন, আমাকে পাবে কি করে, আমি তো তোমাদের মত এদের কাঁচা মাথাগুলো চিবিয়ে খেতে পারব না।

সেই কাঙালিভোজন অবশ্য ঘটা করেই হয়েছে। না হলে পাড়ার এত বড় হিরোর মান থাকে কি করে। কিন্তু অন্ত সেনের কাছে কেউ আর চালের টাকা চাইতে আসেনি।

ছেলেবেলার অভ্যেস—অন্ত সেন এখনো প্রায় রাত থাকতে শয্যা ছেড়ে ওঠেন। মুখ-হাত ধুয়ে সামনের রাস্তার দিকের বারান্দায় পায়চারি করেন।

সেদিনও তাই করছিলেন। তখনো ভোরের আলো সে-রকম স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। দু-চারটে কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। কিছু একটা কানে আসতে অন্ত সেন রেলিং-এ ঠেস দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন। তিনটে লোক কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে, হাঁটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মদ গিলেছে। অস্পষ্ট আলোয় মুখ ঠাওর হল না, কাছে আসতে মনে হল অল্পবয়সী ছোকরা তিনটে।

ঠিক বাড়ির সামনে আসতেই হঠাৎ তাদের মধ্যে দুটো ছেলে আচমকা কোনো বিপদের গন্ধ পেয়ে তীরের মত ছুটল। এই ছোটার ধরন জানেন অন্ত সেন। কিন্তু কিছু ভাবার অবকাশ পেলেন না। তার মধ্যেই দেখলেন ছ-সাতটা ছেলে কোথা থেকে নিঃশব্দে ঝড়ের মত এসে তৃতীয়জনকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছোরা। চাপা হুঙ্কার, মার···মার শালাকে···একেবারে খতম করে দে···

তাদের হাতের ছোরাগুলো উঠছে, নামছে।

—মেরে ফেলল—মেরে ফেলল—বাঁচান—বাঁচান···! ভোরের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করা আর্তনাদ—

—তোর বাপ-ঠাকুরদা এলেও আর তোকে বাঁচাতে পারবে না।

ছোরাগুলো উঠছে। নামছে।

এক-দেড় মিনিটও নয়, কাজ শেষ করে আততায়ীরা শাঁ করে ছুটে চলে গেল।

দু চোখ টান করে রেলিং-এ ঝুঁকে দেখছেন অন্তু সেন। ভোরের আলো খানিকটা জেগেছে। রাস্তার মাঝখানে স্তূপের মত একটা দেহের আকার পড়ে আছে।

অন্তু সেনের সংবিৎ ফিরল। ছুটে শোবার ঘরে চলে এলেন। এই ঘরেই টেলিফোন।

কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিট ধরে চেষ্টা করেও এলাকার থানা ধরতে পারলেন না।

হঠাৎ আবার একটা হৈ-হৈ মার-মার শব্দ। বোমার আওয়াজ।

ফোন রেখে অন্তু সেন আবার বারান্দায় ছুটে এলেন। বোমা আর ছোরাছুরি নিয়ে ছুটে আসছে পঞ্চাশ-ষাট জন ছেলে। কিন্তু এদের জনা-কতক মৃতদেহের কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উল্টো দিক থেকে আবার বোমা ফাটানো হৈ-হৈ ব্যাপার। সেদিক থেকে পাল্টা আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে আর এক সশস্ত্র দঙ্গল।

এদিক থেকে যারা এসেছিল তারা নিমেষে একশ-দেড়শ গজ পিছনে ছুটেছে।

আক্রমণকারীরা মৃতদেহের কাছাকাছি হতেই আবার এ-দিকের দলের বোমা ফাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ। বিপক্ষ দল পিছু হটল।

এরপর এই-ই চলল। একদল নিহত শবের দিকে এগোয়। অন্য দল তখন বোমা ফাটাতে ফাটাতে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে আসে। দশ-বিশ মিনিট বাদে হত্যাকারীর দল এগিয়ে আসে শব দখল করতে, তখন এ-দল বোমা ছোরা তরোয়াল নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে তাদের বাধা দেয়। তারা আক্রমণের জবাব দিতে দিতে পিছু হটে।

ততক্ষণে ভোরের আলোয় সব স্পষ্ট। সমস্ত বাড়ির রেলিং-এ মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে গেছে। যেই একদল শবের কাছে আসে দখল নিতে আর অন্য দল আক্রমণ করতে তেড়ে আসে—সমস্ত বাড়ির দোতলা তিনতলার

দর্শকরা তখন সভয়ে ঘরের কাছে চলে যায়—কখন বোমা ছিটকে এসে লাগে সেই ভয়।

রেলিং-এ ভর দিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে দেখছেন কেবল অন্তু সেন।

…ওই মৃতদেহ কার অন্তু সেনের চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। নয়ন সরকারের। তার চারদিকে থকথকে রক্ত। দেহ নিস্পন্দ কাঠ। মুখ কিছুটা হাঁ-করা। দু চোখ আকাশের দিকে চাওয়া।

অন্তু সেন নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে দেখছেন।

প্রায় দু ঘণ্টা ধরে দুই দলের মধ্যে এই একটি শবদেহের ওপর দখল নিয়ে কাড়াকাড়ি হানাহানি চলল। আশ্চর্য, থানা বেশি দূরে নয়। এত সময়ের মধ্যে একটা পুলিসের গাড়িও এল না। সশস্ত্র দুই দল দু দিকে প্রস্তুত। মাঝখানটা ফাঁকা, রণক্ষেত্র। সেখানে হাঁ-করা মুখে আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে এ-পাড়ার সব থেকে দাপটের হিরো নয়ন সরকার।

বোমাবাজী চলছেই। এত বড় রাস্তা দিয়ে একটা মানুষেরও হাঁটাচলা করার সাহস নেই। কোনো গাড়িও আসছে না বা যাচ্ছে না। দূর থেকে বিপদের গন্ধ পেয়ে ব্যাক করে চলে যাচ্ছে নিশ্চয়। পুলিস আসছে না কেন অন্তু সেনের কাছে দুর্বোধ্য। একদল দেহটা নেবার জন্য বীরবিক্রমে এক-একবার ছুটে আসছে, অন্য দল বাধা দিচ্ছে। দু দলেরই মতলব স্পষ্ট। যে-দল খুন করেছে সে-দল মৃতদেহ গায়েব করতে চায়। হিরোর দল উদ্ধার করতে চায়। কারণ, পরে পুলিস এবং হাসপাতালের হেপাজত থেকে বডি নিয়ে মস্ত প্রোসেশন করে না বেরুতে পারলে এই মৃত্যুর কোনো দাম থাকে না। আর খুন যারা করেছে তারা এই বডি গায়েব করে তার অস্তিত্ব মুছে দিয়ে প্রতিপক্ষের এই সাধও চূর্ণ করতে চায়।

দিনমানে শহর কলকাতার বুকের ওপর এই কাণ্ড। দু ঘণ্টা পরে পুলিস এসেছে। মৃতদেহ তুলেছে। সে পরের কথা। অন্তু সেন তখন আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু তার আগে ঠায় ঘণ্টাখানেকের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। শব দেখছিলেন। দুই রক্তপিপাসু দলের শব কাড়ার চেষ্টা দেখছিলেন না, কেবল ওই শবই দেখছিলেন। এই দেহ মৃত।…

কি ভয়ঙ্কর রকমের মৃত !

এই নিষ্প্রাণ দেহের দিকে চেয়ে আর একটা দেহ অন্ত সেনের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ছুরিতে নয়, বন্দুকের গুলিতে তার বুক ঝাঁঝরা। সেও মৃত নিস্পন্দ। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর রকমের ব্যর্থ মৃত মুখ নয় তার। অন্ত সেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন সেই ইংলিশ রোডের এক-তলার ছাদের ওপর জাতীয় পতাকা হাতে পড়ে আছে সেই দেহ—প্রশান্ত চিরনিদ্রায় শয়ান, মৃত্যুর গৌরবে উত্তীর্ণ !

—বিপুল বসাক ! কোথায়—আজ কোথায় রে তুই বিপুল ? তুইও কি এই বীভৎস ব্যর্থ মৃত্যু কোথাও থেকে দেখছিস ? দেখে চল্লিশ বছর আগে সেই গৌরবের মৃত্যু তোর চোখেও কি আজ অর্থশূন্য হয়ে গেল ! সেদিন রক্তলোলুপ মিলিটারির কবল থেকে তোর দেহও আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম, ফুলের সাজে তোকে মনেব সাধে সাজাতে পেরেছিলাম, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে হাজার হাজার মানুষ নিযে তোব জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটাতে পেবেছিলাম—সে কি চল্লিশ বছর বাদে আজ তোকে এই মৃত্যু আর শব নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখাব বলে ? ওবে বিপুল আজ তুই কোথায় ? বিপুল বসাক তুই কোথায় ?

চল্লিশ বছর আগে। পটভূমি পদ্মাপারের বাংলা। ঢাকা শহরেব এই এলাকার নাম উয়াড়ি। বাস্তার নাম নবাব স্ট্রীট। প্রশস্ত রাস্তাব ওপরেই সেই বিশাল বাড়ি। চারদিকে দেয়াল-ঘেরা কম্পাউণ্ড, মাঝখানে প্রাসাদের মত দোতলা বাড়ি। কম্পাউণ্ডে ফুলের বাগান, আম কাঁঠাল নারকেল জাম জামরুল আতা পেয়ারা ইত্যাদি হরেক রকমের গাছ। একতলা দোতলায় মস্ত মস্ত ঘর, ঠাকুরদালান দুর্গামণ্ডপ। কম্পাউণ্ডের একদিকে ঘোড়ার আস্তাবল। সেখানে তিনখানা তকতকে ঘোড়ার গাড়ি আর আস্তাবলে তিনজোড়া তেজী ঘোড়া।

বিক্রমপুরের জমিদার সেনেদের বাড়ি এটা। বাড়ির মালিকদের এক নামে এক ডাকে তামাম ঢাকা শহরের লোকে চেনে বোধ হয়। অনেকে

আবার বলে রায়বাহাদুরের বাড়ি। বুড়ো কর্তা অর্থাৎ বর্তমান মালিকদের আগের পুরুষ বিরাট পদস্থ সরকারী কর্মী হিসেবে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন। তিনি অনেক দিন গত। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালের সম্মানের খেতাব রায়বাহাদুর এখনো মুছে যায়নি। বর্তমানে বিক্রমপুরের জমিদারি আর বাড়ির মালিক চার কৃতী ভাই। কিন্তু কৃতী হলেও বড় ভাই সকলের হয়ে জমিদারি দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছেন। অন্য ভাইয়েরা কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা সেই পর্যায়ের পদস্থ রাজ-কর্মচারী।

চার ভাই-ই সপরিবারে ঢাকার এই বাড়িতে থাকেন। এক-কথায় সেই আমলের আদর্শ জয়েন্ট ফ্যামিলি। কেবল বড় ভাইই জমিদারি তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনে ঢাকা বিক্রমপুর যাতায়াত করেন। বছর গেলে জমিদারির মোটা আয়। এই আয় থেকেই এখানকার একান্নবর্তী পরিবারের যাবতীয় খরচ চলে। এমন কী এক এক ভাইয়ের ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন, মেয়ের বিয়ে ঘটার উৎসবও জমিদারির আয় থেকেই সম্পন্ন হয়। অন্য ভাইদের বড় চাকরির রোজগারের টাকা যার যার নিজস্ব। এই টাকা থেকে যৌথ পরিবারের জন্য খরচ করার দায় কারো নেই। কিন্তু উৎসব আনন্দ পূজা-পার্বণে চাকুরে ভাইয়েরা দরাজ হাতেই খরচ করে থাকেন। বড় ভাই আদর্শ বড় ভাই। চাকরি না করে জমিদারি দেখাশুনা বা দায়-দায়িত্ব বহনের বাবদ নির্দিষ্টভাবে কোনরকম মাসোহারা নেন না—নিজের বা পরিবারের খরচের বাবদ প্রয়োজনীয় টাকাই শুধু নেন এবং তার হিসেব রাখেন। জমিদারির সমস্ত আয়ই যৌথ তহবিলে জমা পড়ে। অবশ্য চার ভাইয়ের সংসারের সমস্ত খরচাপাতিও তাঁর হাত দিয়েই হয়। ভাইয়েরা যে যত বড় চাকরিই করুন, বাড়ির কর্তা বলতে এই বড় ভাই। অন্য ভাইয়েরা তাঁদের এই গম্ভীর রাশভারী দাদাটির যথার্থ অনুগত।

বলা বাহুল্য জমিদার-বাড়ি বা রায়বাহাদুরের বাড়িতে রাজনীতির বাতাস কখনো ঢোকেনি। সেই বুড়ো কর্তা ছিলেন ইংরেজ শাসনের অনুগত রাজপুরুষ। তাঁর আমলের বড় বড় অয়েলপেন্টিং—রানী ভিক্টোরিয়া, এডোয়ার্ড সেভেন, জর্জ দি সিক্সথ-এর প্রমাণ আকারের ছবি এখনো মস্ত

বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙানো। তাঁর বংশধর এই চার ছেলেও ইংরেজের ভক্ত, মহামান্য সরকারের অনুগত। এঁদের ছেলেমেয়েরা এখনো ভিক্টো-রিয়ার রঙিন আলেখ্যটিকে ভারতমাতা রানী ভিক্টোরিয়া জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এও কর্তাদের শিক্ষার গুণ।

বর্তমানে বড় কর্তার ছয় ছেলে আর···মেয়ে। সকলের ছোট ছেলের নাম অনুতোষ—সক্কলের আদরের খোকা। সকলেরই আদরের কারণ শৈশব থেকেই তার মা নেই। মা বিগত। মা কেমন খোকার মনেও পড়ে না। এই মাতৃহীন শিশুর সকলের কাছ থেকেই একটু বেশি আদর পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মা না থাকার দরুন হোক বা সহজাত স্বভাবেই হোক, ছোটবেলা থেকেই এই ছেলে আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা। বেশ চালাক-চতুর। বাড়ির দাদাদের বা খুড়তুতো দাদা, ভাইবোনদের হৈ-হুল্লোড় দেখে, তাদের নানা কাণ্ড দেখে মজা পায় আর মিটিমিটি হাসে। টেনে না নিলে চট করে নিজে থেকে কোনো কিছুতে এগিয়ে যায় না। কিন্তু কোনো কারণে রাগ হয়ে গেলে বা কোনো কারণে মেজাজ বিগড়োলে তখন আর ছোট বড় জ্ঞান থাকে না। তখন এই বাচ্চা ছেলেই দামাল দজ্জাল। সে রকম রেগে গেছে দেখলে যারা ওর থেকে কিছু বড় আর গায়ের জোরও হয়তো বেশি ---তারাও তখন এই ছেলের হাতে বেপরোয়াভাবে আক্রান্ত হয়ে পিছু হটে। স্কুলেও তাই। এমনিতে চুপচাপ থাকে। কিন্তু ছেলেরা খেলা হৈ-হুল্লোড় বা দস্যিপনার মধ্যে টেনে নামালে এর তখন সকলের ওপর দিয়ে যাবার রোখ।

বছর বারো-তেরো হবে বয়েস। বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতে স্কুলে যায় আসে। লাল্লু কোচোয়ানের গাড়িই তার সব থেকে পছন্দ। কখনো যদি লাল্লুর বদলে অন্য কোচোয়ানের গাড়িতে যেতে হয়, তার মেজাজটাই বিগড়ে যায়। লাল্লুকে না পেয়ে একদিন স্কুলে গেল না তো গেলই না। বাবার হাতে থাপ্পড় খেয়েও গোঁ ধরে বসে রইল। এর পর থেকে স্কুলের সময় অন্তত লাল্লুর গাড়ি নিয়ে বাড়ির আর কেউ বেরোয় না বড় একটা। লাল্লুর বয়েস ওর ডবলেরও বেশি। কিন্তু দু'জনের সমবয়সীর মত ভাব। ওর মুখ থেকে ঘোড়াদের হাবভাব চরিত্র শুনতে খুব ভাল লাগে। স্কুল

থেকে ফেরার সময় নিজের টিফিন থেকে লাল্লুর জন্য কিছু খাবার সরিয়ে রাখবেই। আ-হা, ও বেচারার ভাল খাবার তো কিছু জোটে না। লাল্লু গোড়ায় অনেক আপত্তি করেছে, একদিন কিছুতেই খেল না বলে পরদিন ফেরার সময় খাবার ভরতি টিফিন বাক্সটা খুলে তাকে দেখিয়েছে। আগের দিন লাল্লু খায়নি বলে এই দিন ছেলে রাগ করে কিছুই খায়নি। সেই থেকে লাল্লু আর তার টিফিনের ভাগ নিতে আপত্তি করে না। স্কুল ভাল লাগে না কিন্তু লাল্লুব গাড়িতে ফেরাটাই খোকার স্কুলে যাওয়ার বড় আকর্ষণ। ফেরার সময় সে আর গাড়ির ভিতরে নয়, ছাতে উঠে লাল্লুর পাশে গিয়ে বসে। একটু ফাঁকা জায়গায় এসেই লাল্লু ঘোড়ার লাগাম ওর হাতে ছেড়ে দেয়। তেজী ঘোড়া হাতের তফাত কি করে যেন বুঝতে পারে। লাল্লু মুখ দিয়ে হরেক রকম শব্দ বার করে ও দুটোকে ঠিকমত চালাতে চেষ্টা করে, এক এক সময় বেশ মজার ধমক-ধামকও করে ওদের। সেদিন ঘোড়া দুটো বেতালা পা ফেলতেই লাল্লু ওদের ধমকে উঠেছিল, হালারা খোকা মুনিব দেইখ্যা এখন নছল্লা করতাসস—এই মুনিবের জুয়ান কালেই গতর খোয়াইয়া তরা বুড়া ওবি তখন দানাপানি পাইতে চাস তো অখন থেইকাই খাতির কর।

খোকা মনিব হেসে বাঁচে না। বাড়ির কাছাকাছি হলেই ছাত থেকে নেমে লক্ষ্মী ছেলের মত গাড়ির ভিতরে এসে বসতে হয়। বাড়ির কারো চোখ পড়লে ও ধমক খাবে, কিন্তু লাল্লু বেচারার বোধ হয় চাকরিই যাবে। চাকরি যাক বা না যাক, ধরা পড়লে ওর এই গোপন আনন্দটাই মাটি। রবিবারে বা ছুটির দিনে লাল্লু যখন ঘোড়া দলাই-মলাই করে, খোকা মনিব তার অবধারিত সঙ্গী। ঠিক ফাঁকমত এসে আস্তাবলে ঢুকে পড়ে। একবার ঢুকে পড়তে পারলে এত বড় বাড়িতে কে আর তার টিকির নাগাল পাবে। ছুটির দিনেও নিজের সকালের জলখাবারের ভাগ লাল্লুকে এনে দেয়। লাল্লু প্রায়ই হেসে হেসে বলে, খোকা মুনিব, তোমার মতন দিল যদি হক্কলের ওইতো তাইলে দ্যাশে আর দুঃখী কেউ থাকত না।

খাবারের একটু ভাগ দেওয়াটা কি এমন বড় দিলের ব্যাপার খোকা মনিব ভেবে পায় না। মহা আনন্দে সেও লাল্লুর সঙ্গে ঘোড়া দলাই-

মলাইয়ে হাত লাগায়। লাল্লু তাকে ঘোড়ার পিছনদিকে যেতে দেয় না: কিন্তু খোকার ধারণা এই ঘোড়া দুটোর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে—লাল্লু কোচোয়ান মিথ্যেই ভয় পায়।

বাড়ির এত লোকজনের মধ্যেও কিছুটা নিঃসঙ্গ খোকা ইদানীং সময় কাটানোর মত আরো একটা চমৎকার জায়গা পেয়েছে। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। বাড়ি থেকে বিশেষ দূরে নয়, কাছেই। একটা বিশেষ বাসনা নিয়েই সাহস করে একদিন তেরো বছরের ছেলে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। বাড়ির মাস্টারমশাইয়ের মুখে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের গল্প শুনে মুগ্ধ। ওদের বাংলা পাঠ্য বইয়ে নেপোলিয়ন সম্পর্কে ছোট্ট একটা প্রবন্ধ ছিল। সেটা পড়াতে গিয়েই মাস্টারমশাইয়ের এই গল্প। ওটুকু শুনেই ওই বীরের সম্পর্কে খোকার আরো কত জানতে ইচ্ছে করল ঠিক নেই। ছাত্রের আগ্রহ দেখে মাস্টারমশাই বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে নেপোলিয়নের জীবনের বড় একখানা বাংলা অনুবাদ বই আছে – তাতে নাকি ওই বীরপুরুষের জীবনের সমস্ত কথা আছে। সে বই বাড়িতে আনা যাবে না, পড়তে হলে সেখানে গিয়ে পড়তে হবে—

অনুতোষ উদ্‌গ্রীব, আমি গেলে আমাকে পড়তে দেবে—পয়সা লাগবে না?

—কিচ্ছু লাগবে না, পড়ার জন্যেই ওই লাইব্রেরি, যে কোনদিন বিকেলে গেলে দেখবে কত ছেলে সেখানে বসে পড়ছে।

সাহসে ভর করে একদিন গিয়ে হাজির। আঙিনার ভিতরে পা দিয়েই ভারী ভাল লাগল। কি সুন্দর বাগান, কত রকমের ফুল ফুটে আছে। চারদিকে কত রকমের গাছ। বাড়িটাই বা কি তকতকে সুন্দর। কত লোক আসছে যাচ্ছে বেড়াচ্ছে। গেরুয়া ধুতি গেরুয়া পাঞ্জাবি বা ফতুয়া আর গেরুয়া চাদর পরা কিছু সাধুরও আনাগোনা দেখল। আবার ধপধপে সাদা জামা আর সাদা চাদর পরা অল্পবয়সী লোকও চোখে পড়ল। পরে জেনেছে, গেরুয়ারা সন্ন্যাসী আর সাদারা ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীরাই কালে-দিনে সন্ন্যাসী হয়।

অনুতোষ প্রথমে ঘুরে ঘুরে দেখল খানিক। এখানে যেন সবই সুন্দর

আর পবিত্র। বাড়ির পিছনদিকে বড়সড় পুকুর একটা। স্ফটিকের মত জল। কয়েকটা পদ্মফুল ফুটে আছে। দুদিকে চমৎকার বাঁধানো ঘাট। পুকুর ওদের বাড়িতেও আছে, কিন্তু এত সুন্দর নয়।

পায়ে পায়ে বাড়ির দাওয়ায় উঠে এল। মেঝে এমন তকতকে, নিচের দিকে তাকালে মুখ দেখা যায়। একজনকে জিগ্যেস করে জেনে নিল লাইব্রেরি কোনদিকে। চলল।

এতবড় হলঘরে একটা পিন পড়লে শোনা যাবে বুঝি এমনি নিঃশব্দ পরিবেশ। ছোট বড় টেবিলে বসে অনেকে পড়াশুনা করছে। তাদের মধ্যে তার মতো ছোট ছেলে আর একজনও নেই। অদূরে একটা আলাদা টেবিলের ও-ধারের চেয়ারে সাদা থান জড়ানো আর সাদা পাঞ্জাবি আর চাদর জড়ানো একটি লোক বসে। আগেও লক্ষ্য করেছে সাদা পোশাক পরা সব কজনেরই মাথা কামানো। এরও তাই। এক-একজন আসছে বা উঠে তার কাছে যাচ্ছে, বই রাখছে বা স্লিপ দিচ্ছে। অনুতোষের মনে হল এই লোকটিই লাইব্রেরিয়ান। তার কাছেই যাবে কি যাবে না ভেবে ইতস্তত করছিল।

—খোকা, তোমার কি চাই ?

এখানে জোরে কথা বলা চলে না বোধহয়, তাই খুব নরম আর চাপা গলার প্রশ্ন। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে পাশে গেরুয়া-পরা একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে, বয়েস কত হবে ঠাওর করতে পারল না। বেশ লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্য। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, তার মধ্যে ছোট খড়কের মত কয়েকটা করে পাকা চুল। গায়ের রঙ ওর মত অতো না হলেও কালোই। বেশ যেন হাসি-হাসি মিষ্টি মুখ। কিন্তু চাউনি অদ্ভুত ঝকঝকে।

—একটা বই···

—কি বই ?

—নেপোলিওনের জীবনী···

কৌতুক-ছোঁয়া দু চোখ কয়েক পলক মুখের ওপর আটকে রইল।
—এখানে বসে পড়বে ?

মাথা নাড়ল। তাই।

—এস আমার সঙ্গে।

তিনি সেই সাদা জামাকাপড় পরা লোকের দিকে এগোলেন। অনুতোষ পিছনে চলল।

—ওহে ব্রহ্মচারী, তোমার এখানে নেপোলিওনের জীবনী আছে?

সেই লোকটি সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—বাংলা না ইংরেজি?

এবারে যার চাহিদা সেই জবাব দিল, বাংলায় একটা অনুবাদ বই আছে শুনেছিলাম···

লোকটি চেয়ার ছেড়ে নিজেই ও-ধারের আলমারিগুলোর দিকে চলে গেল। একটু বাদে বই এনে সন্ন্যাসীর হাতে দিল। ঢাউস বই।

মলাট উল্টে একবার বইটা দেখে তার হাতে দিলেন। গলায় কৌতুকের ছোঁয়া।—এই ছোট্ট বইখানা তুমি পড়বে?

সত্যিই বইটা এত বড় হবে অনুতোষও ভাবেনি। আমতা আমতা করে বলল, রোজ এখানে এসে এসে খানিকটা করে পড়ে যাওয়া যাবে না?

—নিশ্চয় যাবে। ওর জন্যে এই বইখানা আলাদা করে রেখো ব্রহ্মচারী।

—যে আজ্ঞে মহারাজ।

অনুতোষ ভেবে পেল না সন্ন্যাসী আবার মহারাজ হয় কি করে। লঘু পায়ে রবারের চপ্পল পরা মহারাজ চলে গেলেন। ব্রহ্মচারী বইটা তার নামে ইস্যু করে হাতে দিল।

বইটা পেয়ে বেশ একটু রোমাঞ্চ অনুভব করল অনুতোষ। সে যেন একটা কাজের কাজ করে ফেলেছে। কেউ নেই এমনি একটা টেবিলে গিয়ে বসল। এই কিছুক্ষণের মধ্যে বয়েসটা তেরো ছাড়িয়ে যেন অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

দশ-বারো পাতার বেশি পড়া হল না সেদিন। বিকেলের আলোয় টান ধরতে উঠে পড়তেই হল। বই ফেরত দিয়ে বলে গেল আবার কাল আসবে।

শুধু কাল নয়, মিশনে এসে এই বই পড়া নেশা হয়ে দাঁড়াল। স্কুল

ছুটির পর বাড়িতে পা দিয়েই কতক্ষণে এখানে আসবে, নেপোলিওন নিয়ে বসবে ভিতরে সেই তাগিদ। বেশি তো আর পড়া হয় না, কয়েক পাতা পড়তে না পড়তে বিকেল গড়িয়ে যায়। বাড়ির সকলে ভাবে সামনের মাঠে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতে যায়। বিকেলে যাওয়া-আসা নিয়ে খেলার জন্য ঘড়ি ধরে দেড় ঘণ্টা বরাদ্দ। খেলার মাঠের বদলে সে কোথায় যায় এ একমাত্র কোচোয়ান লাল্লু মিঞা জানে। কাউকেই না বললে ভাল লাগবে কেন ? দুদিন যাতায়াত করার পরেই স্কুল ছুটির পর গাড়ির ছাতে কোচোয়ানের বাক্সের পাশে বসে কেবল তাকেই বলেছিল। শুনে লাল্লু ভীষণ অবাক।

—কও কি খোকা মুনিব (খোকা বাড়ির ডাকনাম, তাই লাল্লুর সে খোকা মনিব), একরত্তি পোলা, অখন থিকাই রামকৃষ্ণ মিশনে দম্ম কত্তে যাও !

—দূর বোকা, দম্ম করতে যামু ক্যান, বই পড়তে যাই।

—ওই একোই কথা, দম্ম করন আর দম্মের বই পত্তে যাওন একোই ওইলো—

—আরে না, আমি এক মস্ত বীরপুরুষের জীবনী পড়তে যাই, তার নাম নেপোলিওন—অ্যামন বীর আর পৃথিবীতে জন্মায় নাই—বুজলা ?

শুনে লাল্লু মিঞারও খুব আগ্রহ।—ওই নেপোলিওন বুঝি আশ্রমে থাকে—আমারে একদিন ছ্যাখাইবা ?

তার খুদে সঙ্গী হেসে বাঁচে না।

পনের-বিশ দিনের মধ্যে আশ্রম আসাটা একেবারে নিঃসংকোচ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এইটুকু ছেলে রোজ মিশনের লাইব্রেরিতে এসে একখানা ঢাউস বই নিয়ে বসে যায় এ অনেকেরই চোখে পড়েছে। কিছু সন্ন্যাসী আর ব্রহ্মচারীরও। এক-একজনকে আবার বই নিয়ে বাগানে বসে পড়তে দেখে অনুতোষ। একদিন সেও লাইব্রেরি ঘরের ব্রহ্মচারীর কাছে বইটা বাইরে কোথাও বসে পড়ার অনুমতি চাইল। এই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে এর মধ্যে তার বেশ খাতির হয়ে গেছে। অনুমতি এল।

এরপর প্রায়ই নেপোলিওন নিয়ে সে পিছনের ঘাটের সিঁড়িতে এসে বসে। এই নিরিবিলিতে বসে নেপোলিওন পড়তে দারুণ লাগে। ওই বীর পুরুষকে যেন চোখের নাগালের মধ্যে দেখতে পায়। এত তন্ময় হয়ে যায় যে আলো কমে আসার আগে কতক্ষণ কেটে গেল টেরই পায় না।

এই নিবিষ্ট মনে পড়াটা আরো একজন যে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেন সে আর জানবে কি করে। প্রথম দিনের সেই মহারাজ। একদিন কাছে এসে পাশে বসতে সচকিত।

সুন্দর হাসি মুখ।—নেপোলিওন কতটা পড়া হল ?

জবাব না দিয়ে বইটা দেখাল।

—বাঃ, অনেকটাই তো হয়েছে দেখি···। তোর নাম কি ?

বয়সে তিন ডবলেরও বেশি হবে, তবু জমিদারের ছেলেকে হুট করে বাইরের কেউ 'তুই' বলে না। কিন্তু সন্ন্যাসীর মুখের এই অন্তরঙ্গ কথা একটুও খারাপ লাগল না। বরং ভালই লাগল। নাম বলল।

—কোন্ ক্লাসে পড়িস ?

বলল।

—বাড়ি কোথায় ?

বলতেই অবাক যেন একটু।—বলিস কি রে, জমিদার সেনেদের বাড়ির ছেলে তুই, এখানে এসে নেপোলিওন পড়িস ? তা তুই কোন্ কর্তার ছেলে ?

—বড়।

—আচ্ছা···! তা তোদের বাড়িতে তো এখনো 'গড সেভ দি কিং' গান হয় শুনেছি—তুইও করিস না ?

হাসি মুখের কথাগুলো রসিকতার মত মনে হল। কিন্তু তাৎপর্য বোধগম্য হল না। মাথা নাড়ল, করে না।

—এত কম আলোয় আর পড়ে না, আয় আমার সঙ্গে।

বাগানের দিক ধরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, বড় হয়ে তোর কি

হতে ইচ্ছে করে?

সলজ্জ জবাব, নেপোলিওন··· ।

—বেড়ে বলেছিস। তা তোরও কি নেপোলিওনের মত রাজ্য জয় করার লোভ নাকি?

ছেলে এমনিতে সপ্রতিভ কম নয়। জবাব দিল, তার মত বীরপুরুষ হতে ইচ্ছে করে···আর মাঝে মাঝে শিবাজীর মতও হতে ইচ্ছে করে।

ওমনি চকচকে দু চোখ ওর দিকে ঘুরল।—শিবাজীর মত হতে ইচ্ছে করে কেন?

—মা-কে দারুণ ভালবাসত···নেপোলিওনও অবশ্য বাসত, কিন্তু শিবাজীর মা-ই ধ্যান-জ্ঞান···তাছাড়া নিজের দেশকে উদ্ধার করার জন্য শিবাজীকে কি সাংঘাতিকভাবে যুঝে যেতে হয়েছে, কত কষ্ট পেতে হয়েছে··· ।

মহারাজের মিষ্টি মুখখানা হঠাৎ এমন থমথমে কেন অনুতোষ ভেবে পেল না। সামনে একজন সাধুকে দেখে ওর হাত থেকে বইটা নিয়ে তাকে দিয়ে বললেন, লাইব্রেরিতে দিয়ে দিও—

মহারাজ একতলায় নিজের ঘরে নিয়ে এলেন ওকে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। এক কোণে ছোট্ট একটা কালীমূর্তি। সামনে আসন পাতা। ঘরে কোনো আসবাবপত্র বা খাট-চৌকি নেই। তাকে শতরঞ্জিতে মোড়া একটা পুঁটুলির মত। সেটাই বোধ হয় মহারাজের বিছানা।

কালীমূর্তি দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন, ও-বেটি কে চিনিস?

—মা কালী··· ।

—চিনিস তাহলে। হাসলেন একটু। কিন্তু ছেলেটার মনে হল, খুব রাগ চেপে মানুষ হঠাৎ হঠাৎ যেমন হাসে—এই হাসিও অনেকটা তেমনি।

—নে প্রসাদ খা।

সামনের রেকাবিতে ফল আর একটা সন্দেশ তুলে হাতে দিলেন। এক গেলাস জল দিলেন। খাওয়া হতে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, বাড়িতে তোর মা আছে তো?

—না তো···

—কতদিন নেই ?

—খুব ছোটবেলা থেকে, আমার মনে পড়ে না।

—ও···সেই জন্যেই বুঝি মাকে যারা ভালবাসে তাদের খুব ভাল লাগে ?

জবাব দিতে পারল না। ঠিক জানে না।

—আচ্ছা, হঠাৎ যদি তুই দারুণ ভাল মা পেয়ে যাস একজন ? সেই মা আরো অনেকের মা···তাহলে কেমন হয় ?

এবারেও চুপ করে থাকল। এ আবার কিরকম প্রস্তাব বুঝে উঠল না। মা আবার কেউ পায় কি করে !

—আয় আমার সঙ্গে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়িতে ফিরতে হবে তাও মনে থাকল না। কি এক অজানা আকর্ষণে চলল। কাছাকাছির একটা ছোট্ট বাড়িতে ওকে নিয়ে ঢুকে সন্ন্যাসী হাঁক পাড়লেন, কই গো সাধিকা মা, তোমার আর একটা ছেলে এসেছে—দেখে যাও।

যিনি এলেন তাঁকে দেখে অনুতোষের ভিতরটা সত্যিই কিরকম করে উঠল। কাকিমারা তাকে বেশ আদর-টাদর করে—কিন্তু তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে আছে বলেই হয়তো নিজের মা বলে মনে হয় না। কিন্তু এই হাসি-হাসি মুখখানা দেখামাত্র বুকের তলায় কেমন একটা আনন্দের মোচড় পড়তে লাগল। মনে হল এইজন তার সত্যিকারের মা হলে বেশ হত।···পরনে লালচে থান, এক পিঠ চুল, গায়ের রঙ তেমন ফর্সা নয়, চোখ দুটো এমন যে দেখেই মনে হল ভালবাসা উথলে পড়ছে।

ওকে চেয়ে চেয়ে সাধিকা মা দেখলেন খানিক। জিজ্ঞেস করলেন, এই কচি ছেলেটার ওপর আপনার আবার টান কেন মহারাজ—এ কাদের ছেলে ?

—রায়বাহাদুরের বাড়ির ছেলে ?

মনে হল না-বুঝে সাধিকা মা চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। মহারাজ হাসলেন, বুঝলে না ?···ওই বিক্রমপুরের জমিদার সেনেদের বাড়ির ছেলে···আশ্রমের লাইব্রেরিতে রোজ নেপোলিওন পড়তে আসে—

নেপোলিওন আর শিবাজীর মত হতে ইচ্ছে করে ওর—তাঁরা তাঁদের দেশকে ভালবাসতেন আর মা-কে ভালবাসতেন···ওরও মা নেই, মা-কে মনেও পড়ে না।

—আ-হা। সাধিকা মা তাড়াতাড়ি এসে ওকে বুকেই টেনে নিলেন। তেরো বছর বয়স, নিজের ধারণা অনেক বড় হয়ে গেছে। তাই লজ্জা করতে লাগল, আবার অদ্ভুত ভালও লাগল।

হাসি হাসি মুখে মহারাজ মা-কে বললেন, খুব ভাল জমিন···

যার উদ্দেশ্যে বলা তার মাথায় কিছুই ঢুকল না। কিন্তু লক্ষ্য করল, সাধিকা মা বড় বড় চোখ করে মহারাজের দিকে চেয়ে আছেন।

বাড়ি ফিরতে সেদিন রাতই হয়ে গেল। পড়ুয়া ছেলেদের সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরাটা কড়া নিয়মের মধ্যে পড়ে। দেরি হওয়ার একটা যুতসই কৈফিয়ত ভাবতে ভাবতে অনুতোষ বাড়ি ফিরল। রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো আরতি দেখতে দেখতে দেরি হয়ে গেল বলবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু কিছু বলারই দরকার হল না। কেউ খেয়ালই করেনি যে ও বাড়ি ফেরেনি। ভাগ্য আরো ভাল যে সেদিন মাস্টারমশাইয়ের আসার দিন নয়। এই ধরা না-পড়াটাও নতুন পাওয়া মায়ের আশীর্বাদ ভাবল!

দু দিন না যেতে কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে আবার বিকেলে সাধিকা-মায়ের বাড়িতে একলাই গিয়ে উপস্থিত। মা অবশ্য যখন ইচ্ছে হবে আসতে বলে দিয়েছিলেন। সেই বিকেলে আশ্রমে নেপোলিওন পড়তে যাওয়া হল না, কেউ যেন ঠেলে তাকে মায়ের বাড়িতে নিয়ে এল।

এমনি দিনতিনেক আসা-যাওয়ার পরেই মায়ের মুখে সেই অন্তু ডাক। মায়ের কাছে সেদিন অপরিচিত আরো কারা এসেছিল। সে অন্য একটা ঘরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তু ডাক কানে গেছে, কিন্তু ওই নামে মা তাকেই ডাকছেন বুঝবে কি করে?

সেই সন্ধ্যায় সে অনুতোষ থেকে অন্তু হয়ে ঘরে ফিরেছে। এই নাম যেন বড় গর্বেরও। এই কটা দিনের মধ্যে আশ্রমেও মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেখানেও মায়ের খাতির, কদর লক্ষ্য করেছে। সাধুরা সকলেই তাঁকে চেনেন, খাতির করেন! মহারাজের ঘরেও একদিন এই মা-কে

দেখেছে। সেদিন মহারাজের পুজোর থালা থেকে মা-ই ওকে প্রসাদ তুলে দিয়েছিলেন। এহেন মায়ের দেওয়া আদরের নাম মাথায় করে রাখার মত মনে হয়েছে। এরপর থেকে নিজের কাছেও সে মনেপ্রাণে অন্ত। স্কুলের সহপাঠীরা একে অপরের বাড়ির ডাকনাম জানতে চেষ্টা করে, এই বয়সের ছেলেদের এটা সহজাত মজার ব্যাপার। বাড়ির খোকা নাম সে এতদিন বেশ চেষ্টা করে সকলের কানের আড়ালে রেখেছিল। যে বিচ্ছিরি ডাকনাম ওর, জানতে পারলে ত্যাঁদড় ছেলেগুলো খোকা-খোকা করে উত্ত্যক্ত করে মারবে। কিন্তু এবারে অন্ত নামটা ইচ্ছে করে নিজেই ফাঁস করে দিল। তার ডাকনাম অন্ত। কেউ তেমন অবাক হল না। অনুতোষের ডাকনাম অন্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। এরপর থেকে শুধু বাড়িতেই সে খোকা, আর সর্বত্র অন্ত। এমন কি নতুন কেউ জিগ্যেস করলে ভাল নাম বলেই না। বলে তার নাম অন্ত সেন।

নেপোলিওন পড়া শেষ হয়ে গেল। বড় আকারের শিবাজী পড়াও শেষ। এরপর মহারাজের নির্দেশে লাইব্রেরির ব্রহ্মচারী তাকে বিবেকানন্দর দেশের আর বিদেশের সব বক্তৃতার অনুবাদ পড়ার ব্যবস্থা করলেন। অন্তর বয়েস তখন চৌদ্দ। মহারাজ তখন একটু একটু করে আর খুব মন দিয়ে স্বামীজির কর্মযোগ পড়তে বলেছেন। অন্ত তাই পড়ছে। মহারাজ প্রায়ই ওকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে মা-কালীর প্রসাদ দেন, তারপর ভারী সুন্দর আর সোজা করে কর্মযোগ আলোচনা করেন।

একদিন হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, তোর বয়েস কত রে ?

—এবারে চৌদ্দ পার হবে। অন্তর কেন যেন পনের বলতে পারলে ভাল লাগত। ওর এখন তড়িঘড়ি বড় হবার ইচ্ছে।

—তুই রোজ এখানে আসিস বাড়িতে জানে ?

—আগে জানত না, ইদানীং জেনেছে।

—বাড়িতে কিছু বলে না ?

—বলবে কেন, ঠাকুরের জায়গা, সকলেই জানে ভাল জায়গা।

—রোজ তুই এখানে আসিস, খেলাধুলো করিস কখন ?

—আমার এখানে আসতেই বেশি ভাল লাগে।

—তাহলেও শরীর-মন আগে, খেলাধুলো না করলে ভাল থাকবে কেন?

—রোজ খুব ভোরে উঠে এক্সারসাইজ করি।

মহারাজের খুশি মুখ। অন্তর এই চৌদ্দ বছরের জীবনে দুটি মুখ এখন সব থেকে প্রিয়। এক এই মহারাজের মুখ। আর সাধিকা-মায়ের মুখ। সকলের মত অন্তও শুধু মা-ই বলে। সেই মা-ও কিন্তু এই মহারাজকে দারুণ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। বলেন, নরেন মহারাজের মত মানুষ হয় না, আর একটু বড় হলে তুই ওই মহারাজকে আরো ভাল করে বুঝবি—তাঁর ভালবাসা পাওয়া ভাগ্যের কথা মনে রাখিস।

মহারাজের নাম নরেন মহারাজ—এটা মায়ের মুখেই প্রথম শোনা। কিন্তু মায়ের ও-কথার খুব একটা তাৎপর্য খুঁজে পায়নি। অন্ত দেখেছে, মহারাজ সকলকেই ভালবাসেন, সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলেন, সকলের প্রতিই তাঁর বেশ স্নেহ।

···কিন্তু সেদিন মায়ের ওই কথায় একটু বাড়তি অর্থের হদিস পেল। মহারাজ ঘরের দরজাদুটো ভেজিয়ে দিয়ে তাঁর ছোট মা-কালীর মূর্তির সামনে বসলেন। ডাকলেন, আয়, এখানে এসে বোস।

অন্ত তক্ষুনি তাঁর পাশে তকতকে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

মহারাজ একটু ঝুঁকে মেঝে থেকে মায়ের মূর্তি তুলে ধরলেন। অন্ত অবাক হয়ে দেখল তার নিচে ছোট চৌকো মতো খাঁজ কাটা। সেখানে একটা চটি বইয়ের মতো কি।

—ওটা তুলে নে।

বিমূঢ় অন্ত হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। চটি বই-ই একটা। বইয়ের ওপর বড় বড় হরফে লেখা, 'মা-গো, জবার বদলে মুণ্ডমালা'। ওপরে ভারতমাতার ছবি, তার গলায় শহীদদের মুণ্ডমালা।

অন্তর বুকের তলায় এক অদ্ভুত অনুভূতি, স্নায়ুতে স্নায়ুতে অজানা রোমাঞ্চ। কালীমূর্তি আবার জায়গায় রেখে নরেন মহারাজ চেয়ে আছেন তার দিকে। ঠোঁটে হাসির আভাস। চোখদুটো ভাবালু। কিন্তু অন্তর মনে হল ওই চোখে নীলচে জ্যোতি ঝিকঝিক করছে।

—খুলে দ্যাখ। গলার স্বর আরো মৃদু।

দেখল ছাপার অক্ষরে পনের-বিশ পাতা করে এক-একজনের জীবনী, সঙ্গে ফটো। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল দত্ত এমনি আরো জনাকতক শহীদের। অন্তুর নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। এই নামগুলো জানে। বাড়িতে এ নাম কেউ উচ্চারণও করে না। কিন্তু ঢাকার ছেলে, স্কুলে পড়ে, কত রক্ত দেওয়া হয়ে গেল, কতজনকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হল—আগ্রহ থাক বা না থাক এসব জানবে না কেন? কিন্তু এ বই এখানে কেন, এদের জীবনী মায়ের আসনের নিচে লুকনো কেন? বাড়ির যে হাওয়ায় মানুষ, অন্তু জানে এরা সব স্বদেশী ডাকাত, ইংরেজ মেরে নিজেদের সর্বনাশ করছে, দেশের সর্বনাশ করছে।

নরেন মহারাজের ঝিমুনো গলা, এই বইটা খুব মন দিয়ে পড়, হড়বড় করে পড়ার জিনিস নয়, খুব একটু একটু করে ধরে ধরে পড়বি। পড়তে পড়তে লোকগুলোকে কাছে দেখতে পারছিস, তাদের কথা শুনতে পারছিস, তাদের ইচ্ছে বুঝতে পারছিস—এরকম মনে হওয়া চাই। আমি ঘরে না থাকলেও এখানে এসে এসে পড়বি—তার আগে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিবি। পড়া হলে যেখানকার বই সেখানে রেখে দিবি। …কেউ যদি দেখেও ফেলে তো জানবে, আমি তোকে কিছু যোগব্যায়াম শিখিয়েছি—তুই দরজা বন্ধ করে তাই করিস। এ কারো জানার বা গল্প করার জিনিস নয়…আমার কথা বুঝতে পারছিস?

সেই রাতটা ভাল ঘুম হল না অন্তুর। চোখের সামনে চটি বইয়ের ফটোগুলো ভাসছে। তাদের গলায় ফাঁসির দড়ি দেখতে পাচ্ছে। কানের ভিতর দিয়ে মগজের মধ্যে কতগুলো শব্দ তোলপাড় করছে—মা-গো, জবার বদলে মুণ্ডমালা—জবার বদলে মুণ্ডমালা—জবার বদলে মুণ্ডমালা।

ভোর হল। তখন থেকেই বিকেলের প্রতীক্ষা।



অন্তুর আঠারো বছর বয়স এখন। ভিতরের বয়স কত, কালো মিষ্টি মুখের নরম হাসি দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। এই ক'বছরে অনেক জেনেছে, অনেক বুঝেছে। মায়ের কাছে কারা অনুগত শিষ্যের মতো আসে

যায়, দরকার পড়লে ছ'পাঁচদিন আশ্রয় নেয়—জানতে বাকি নেই। কে নরেন মহারাজ তা তো জানেই। তিনিই তাঁর গুরু, তাঁর প্রেরণা। বিখ্যাত বিপ্লবী নরেন্দ্রমোহন সেন, যিনি পুলিনবিহারী দাস প্রমুখের সঙ্গে অনুশীলন পার্টি গড়ার নিয়ামক। যাঁর দুহাতেই নির্ভুল নিশানায় গুলি চলত। আজ তিনি সন্ন্যাসী নরেন মহারাজ, কিন্তু ধমনীতে বিপ্লবের আগুন অনির্বাণ জ্বলছে। তাঁরই মারফত অন্তুর ওই পার্টির সঙ্গে যোগ। পার্টির বোধ হয় কনিষ্ঠতম সভ্য, কিন্তু সকলের বিশ্বাসের প্রথম সারিতে তার জায়গা। যাঁর হাত ধরে তার আসা আর যাঁর হাতে তার শিক্ষা, অন্তুকে হেলাফেলা করবে কে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই বাড়িতে বাবার কাছে, কাকাদের কাছে পুলিসের ওয়ার্নিং এসেছে। এ-বাড়ির ছেলের সঙ্গে স্বদেশীঅলাদের যোগ আর চালচলনে পুলিস সন্দিগ্ধ—এ কি বিশ্বাস হবার মতো কথা! বাবা-কাকারা পুলিসের ওপরঅলাকে এ-বাড়ির ঐতিহ্য দেখিয়েছেন, ঘরের দেওয়ালে এখনো ভারতেশ্বরী রানী ভিক্টোরিয়ার অয়েল পেইন্টিং, পরের রাজাদের আলেখ্য। রায়বাহাদুরের বাড়ি—এ-বাড়িতে স্বদেশীর বাতাস! তা কি হয় কখনো?

কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার কিছুদিনের মধ্যেই অন্তুকে বাড়ি থেকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল। বাবা আর কাকারা বজ্রাহত। তাঁদের চেষ্টায় দিনকতকের মধ্যে ছাড়া পেল অবশ্য। বাবার সুনাম, কাকাদের বড় চাকরি—ভবিষ্যতের গুরুদায়িত্ব নিয়েই তাঁরা তাকে ছাড়িয়ে আনতে পারলেন। তাঁরা কথা দিলেন ছেলেকে আর এখানে রাখাই হবে না। অন্যত্র পড়তে পাঠানো হবে। বাবা-কাকাদের খাতিরেই পুলিস তখনো তার গায়ে হাত তোলেনি। কিন্তু গায়ে হাত পড়ল বাড়িতে এসে। পায়ের চটি খুলে বাবা আগাপাছতলা পিটলেন। পিটুনির ধকলে তিনি ক্লান্ত, কিন্তু ছেলে নির্বাক। এত মার সত্ত্বেও মুখে একটু কাতর উক্তি শুনল না কেউ।

বাবা-কাকারা তাকে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তার আগেই অন্তু বাড়ি থেকে ফেরার। রাতের অন্ধকারে রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছে। সকলের অলক্ষ্যে নরেন মহারাজের ঘরে। মহারাজের হৃষ্টবদন।

সই সঙ্গে মন্তব্য, এই শুরু—

মায়ের কাছে থাকা চলে কিনা অন্তু সেই পরামর্শ চেয়েছিল। মহারাজ মাথা নেড়েছেন, ওখানে আদৌ না। ওই বাড়িটাকে পুলিস সাধিকা মায়ের খুদে আশ্রম বলে জানে। ওটা পার্টির মানুষদের বিপদের সাময়িক আশ্রয়। মাকে সন্দেহ না করলেও ও-বাড়িতে বাচ্চা বয়েস থেকে তোর যাতায়াত আছে—মা তোকে ছেলের মতো ভালবাসে, পুলিসের তো জানাই স্বাভাবিক। ও-বাড়ির দিকে তারা চোখ রাখবে, মাঝখান থেকে অন্যেরা বিপদে পড়বে। ওই এক জায়গায় যদি কখনো যাস খুব সাবধানে যাবি—না যাওয়াই ভাল।

পার্টি সহায়, বাড়ি থেকে নিখোঁজ হবার পরে থাকার জায়গার খুব অভাব হল না। এই আঠারো বছরের মধ্যে অন্তু একটা কাজ করেছিল যার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তারই। পার্টির দাদারাও তার এই কৃতিত্বের তারিফ করেছেন। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ওই দিনে ওরকম একটা সংগঠন জোরদার করে তোলা কম কথা নয়। বনগ্রামে একজনের মস্ত দেওয়াল ঘেরা আঙিনার পিছনদিকে বাছাই ছাত্রদের নিয়ে একটা ব্যায়াম সমিতি গড়েছে। সেই সঙ্গে একটা লাইব্রেরিও। ওটা ঢাকার এক বসাক-বাড়ি। বাড়ির মালিক বংশগত দৌলতে বিশাল বিত্তের মানুষ। নিজেরও চালাও ব্যবসা। টাকার লেখাজোখা নেই। ভদ্রলোক অতি অমায়িক, ভদ্র, সজ্জন। তাঁর একটাই দুঃখ, নিঃসন্তান। বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করার কেউ নেই। ছেলেরা তাঁর চোখে নারায়ণ, যে নারায়ণ অনুগ্রহ করে তাঁর ঘরে ঠাঁই নিল না। মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি। সেই সুবাদে অন্তুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। এই বয়সের ছেলের ধর্মে মতি দেখে তিনি মুগ্ধ। আর সাধিকা মা তো তাঁর চোখে মূর্তিমতী দেবী। এই মায়ের মারফতই অন্তু সুপারিশটা করেছিল আর তাতে কাজও হয়েছিল। মা তাঁকে বলেছিলেন, কত অনাথ গরিব পোলা খাইতে পরতে পায় না, মাইনা দিয়া স্কুল-কলেজে পড়তেও পায় না। এইরকম কিছু কিছু ছেলে আপনার বাড়িতে রাখেন, তাগো খাওয়া-পরার ভার নেন, পড়াশুনার খরচ চালায়েন—এর থিকা বড় পুণ্যির কাজ

আর আছে নাকি ? নিজের সন্তান নাই তাতে কি ওইলো, এই ছেলেরাই দেইখেন আপনের সন্তান ওইয়া খাড়ইছে।

বসাকমশাই আনন্দে বিগলিত। সম্প্রতি দূরসম্পর্কের এক ভাইয়ের ছেলেকে অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে পোষ্যপুত্র করে বুকে টেনে নিয়েছেন সেই ছেলে এখন তাঁর আর গৃহিণীর চোখের মণি। কিন্তু সন্তানের ক্ষুধা কি তাতে সম্পূর্ণ মেটে ? মায়ের আশীর্বাদে একের জায়গায় অনেক ছেলে সত্যিই তাঁর সন্তানতুল্য হয়ে দাঁড়ায়, তার থেকে আনন্দের আর কি আছে। এর ওপর দেখেশুনে ছেলে পাঠানোর দায়িত্বও যখন এই মা-ই নিলেন, ভদ্রলোকের বুকের ছাতি বড় হয়ে গেল, বল-ভরসাও বাড়ল।

দেখেশুনে ছেলে পাঠানোর দায়িত্ব আসলে মা নিলেন না। অন্তু নিল।

একে একে জনা পনের ছাত্র সেখানে আশ্রয় পেল। সত্যিই এরা গরিব, বিনয়ী, নম্র, ভদ্র। ছাত্রও মোটামুটি ভাল। গোড়ায় গোড়ায় অন্তু একেবারে নেপথ্যেই থাকল। তার পরামর্শে ছাত্র-বন্ধুরা কর্তাকে বলে পিছনের আঙিনায় স্বাস্থ্য-চর্চার ব্যবস্থা করল। ব্যায়াম সমিতির পত্তন হল। সঙ্গে ভিতরে মস্ত হলঘরে ছোট গোছের একটা লাইব্রেরিও। বসাকমশাই সানন্দে সবকিছুর টাকা দিলেন। লাইব্রেরি ভালভাবে চললে আরো দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বংশ বংশ ধরে লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছেন, বাগ-বাদিনী উপেক্ষিতা। দিনকালের যা গতি, উপেক্ষা এখন দুর্বলতার আকার নিচ্ছে, মনের তলায় হীনম্মন্যতা-বোধ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ঘাটতি পূরণের জন্য পোষ্যপুত্রটির পিছনে তিন-তিনটি মোটা মাইনের মাস্টার রেখে দিয়েছেন। এখন লাইব্রেরির কল্যাণে বাড়িটা যদি মা সরস্বতীর শ্রীক্ষেত্র হয়ে ওঠে—সে তো এক আশাতীত আনন্দ আর রোমাঞ্চের ব্যাপার।

অন্তু সন্ধ্যার পরে সদর দরজা দিয়েই মাঝে মাঝে আসে। তখন স্বয়ং কর্তার সঙ্গে আগে সাক্ষাৎ করে। মা একবার দেখেশুনে যেতে পাঠালেন।

অন্তুর সেখানে তখন জামাই-আদর। বাড়ির কর্তা তাকে আগে থেকেই চেনেন। সন্ন্যাসীরা খাতির করেন, মা ভালবাসেন, এই দিনে এমন

ধার্মিক সোনার ছেলে আর কজন হয়।

পালক বাবার দেখাদেখি তাঁর পোষ্যপুত্রটিরও এই একজনের প্রতি দারুণ ভক্তিশ্রদ্ধা। বাবার সঙ্গে সে-ও মিশনে আসে। অন্তুদাকে ভাল করেই লক্ষ্য করেছে। আর পালক বাবার মুখেও তার কথা শুনেছে। নাম বিপুল বসাক। অন্তুর থেকে বছর দেড়েকের ছোট। কিন্তু ভক্তি ভালবাসার আতিশয্যে তার আচরণ অনেক ছোটর মত। কি করে যেন বুঝে নিয়েছে এ-বাড়িতে যারা থাকে, যারা ব্যায়াম-টেয়াম করতে আসে, এমন কি লাইব্রেরিতে যারা মেম্বার—অন্তু সেন তাদের বেশির ভাগেরই মুরুব্বির মত। ফর্সা টুকটুকে ছেলে। সর্বদা সিল্ক বা মটকার পাঞ্জাবি পরে। গায়ের রঙে জামার রঙে মিশে যায়। গলায় পাঁচ-ছ ভরির একছড়া সোনার হার, দু আঙুলে দুটো জ্বলজ্বলে পাথরের আংটি। এক কথায় ননীর পুতুল। অন্তুর সঙ্গী-সাথীরা আড়ালে ওকে বলে রাঙা-মুলো। ছেলেটা এত নরম স্বভাবের বলেই কেউ তাকে পাত্তা দিতে চায় না। তারই বাড়িতে থেকে খেয়ে পরে তারই ওপর হম্বিতম্বি করে। এক্সারসাইজ করার জন্য এই এই জিনিস আরো চাই—এই বিপুল, টাকার ব্যবস্থা কর তো। লাইব্রেরির জন্য বেশ কিছু বই না কিনলে নয়—এই বিপুল, টাকার যোগাড় দ্যাখ।

বিপুল বসাক টাকার যোগান দিতে পেরে কৃতার্থ।

সে এখানকার ছেলেদের কৃপার পাত্র আর টাকা দোহনের পাত্র।

লাইব্রেরি আর ব্যায়াম সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। এখানে যারা থাকে তারা ছাড়া বহু ছেলে ব্যায়াম করতে আসে। সকলেই যে ব্যায়াম করতে আসে তাই নয়, শুধু লাইব্রেরির মেম্বারও অনেক। এদের প্রায় সকলের সঙ্গেই অন্তুর প্রত্যক্ষ যোগ। কিন্তু প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে সেটা। এখানেই অন্তুর সংগঠনের বাহাদুরি। বেশির ভাগ ছেলেদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বাইরে। এখানে আসে রাতের অন্ধকারে, পিছনের খিড়কির দরজা দিয়ে। ছেলেদের জানা থাকে। গোপনে আসা-যাওয়ার তারাই সহায়। কিন্তু এক-একদিন বিপুল এসে হাজির হয়। ব্যায়াম সমিতিতে, লাইব্রেরিতে বা নিচের বাসিন্দাদের কাছে আসতে ইচ্ছে হলে

তাকে বাধা দেবে কি করে। সে এলে কোনো কোনো ছেলের মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া পড়ে, কারো বা চাউনি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। এ ছেলে কখন কার কাছে তাদের লিডারের এই আসা-যাওয়ার কথা ফাঁস করে দেয় কে জানে। টিকটিকিতে তো শহর ছেয়ে আছে।

কিন্তু অন্তুর যখন বছর একুশ-বাইশ বয়েস, বসাক-বাড়ির লাইব্রেরি আর ব্যায়াম সমিতি আগের থেকে তিনগুণ পরিপুষ্ট, তখনো পুলিসের বা গুপ্তচরের শ্যেনদৃষ্টি এ-দিকে পড়েনি। তার সব থেকে বড় কারণ, কমলার বরপুত্র এই বনগ্রামের বসাক-বাড়ির সঙ্গে স্বদেশী মানুষ ছেড়ে স্বাধীনভাবাপন্ন কোনো কুকুর-বেড়ালেরও যোগাযোগ থাকতে পারে এটা পুলিসেরও কল্পনার বাইরে। লেখাপড়া না জানা অঢেল বিত্তের মানুষ একটা শখের লাইব্রেরি করেছে, তাতে টাকা ঢালছে, নানা বয়সের অকর্মা লোক এখানে এসে গল্প উপন্যাস নিয়ে যাচ্ছে, ফেরত দিতে আসছে—এদের নিয়ে পুলিসের কি মাথাব্যথা! প্রেমের গল্প উপন্যাস পড়া ছেলে-ছোকরাদের আবার মেরুদণ্ড বলে কিছু আছে নাকি যে তারা স্বদেশী করবে! আর বাড়ির পিছনের দিকে দেওয়ালঘেরা ব্যায়ামের আখড়া কারো নজরে পড়ার কথা নয়, পড়েও না।

পুলিসের সন্দিগ্ধ হবার আরো কারণ নেই তার হেতু অন্তু পারতপক্ষে আর এখানে আসে না। সে যে চেন-সিস্টেম করে দিয়েছে তাইতেই যোগাযোগ রক্ষা হয়, খুব সহজে সংবাদ আদানপ্রদান চলে। একুশ-বাইশ বছর বয়সে অন্তু সেন ঢাকার শহরে একটা নাম হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে সে বারকয়েক ধরা পড়েছে, বারকয়েক জেল খেটেছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত খুব বড় অভিযোগ পুলিস তার বিরুদ্ধে চেষ্টা করেও পায়নি। বাড়ির সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই বটে, দ্বিতীয়বার জেল খেটে বেরিয়ে বড়দির টানে বাধ্য হয়ে তাকে বাড়িতেই আসতে হয়েছিল। সেই ছেলে-বেলায় মা-কে হারানোর ফলে শুধু বড়দির কাছেই যেটুকু মায়ের স্নেহ পেয়েছিল। বড়দি বাবাকে গোপন করে কাকাদের ধরে জেলে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছিল, প্রচুর কান্নাকাটি করেছিল। বড়দি বলেছিল, ভাই জেল থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি যাবে না, বাড়িতেই থাকবে।

অন্তু কথা দিয়েছিল, জেল থেকে ছাড়া পেলে বাড়ি যাবে। দিদির কাছে দিনকতক থাকবে।

··ছাড়া পেয়েছিল। তখনো অনেকটাই সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। পুলিস প্রহারে প্রহারে তাকে জর্জরিত করেছে। হাড় দুমড়ে দিয়েছে, চামড়া টেনে ছিঁড়েছে। কিন্তু কোনো কথা বার করতে পারেনি। ওই নিরীহ মুখ দেখে পুলিসেরও সংশয়, বড়লোক জমিদারবাড়ির ছেলে, শখ করে হয়তো স্বদেশী দলের সঙ্গে ভিড়তে চেষ্টা করেছিল—স্বদেশীঅলারা কি এত বোকা যে এ ছেলেকে কোনো বড় ব্যাপারে টানবে? তাই এবারের ওকে ছেড়ে দেওয়াটা অনেকটা টোপ ফেলার মত। ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক কি করে, পুলিসের চোখে কদিন আর ধুলো দিয়ে থাকবে।

কিন্তু ছাড়া পাবার পরে বাড়িতে এক রাতের জন্যও ঠাঁই হল না অন্তুর। দিদি চোখের জলে ভাসল তবু বাবা নির্মম। কারণও আছে। তাঁর ভাইয়েরা পদস্থ সরকারী কর্মচারী। তাঁদের চাকরির গায়ে অশুভ বাতাস লাগছে। তাছাড়া তাঁদের তো ছেলেদের ভবিষ্যৎ আছে। এই ছেলের সংস্রবে থাকলে তাদের আর ভবিষ্যৎ কি? মুখে স্পষ্ট করে না বললেও হাবেভাবে সমস্যাটা তাঁরা গোপন করেননি। ফলে বাবার খুব স্পষ্ট ঘোষণা, এ-বাড়িতে আর তার জায়গা হবে না—তাঁর চোখে এই ছেলে আর জীবিত নেই।

অন্তু এবারে বরাবরকার মতই বাড়ি ছেড়েছে।

এর বছরখানেকের মধ্যে পরপর এমন কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে পুলিসের চোখে নিখোঁজ অন্তু সেন ছাপমারা অপরাধী। চারদিকে জাল ফেলে তাকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক স্বদেশী ডাকাতি আর মার্ডারের অভিযোগ। কাগজে তার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে, ছবি বেরিয়েছে। ধরে দিতে পারলে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু কোথায় অন্তু সেন? সে যেন হাওয়ায় মিশে আছে।

বসাক-বাড়ির কর্তার চোখেমুখে এবারে আতঙ্ক। অমন মিষ্টি স্বভাবের

ধার্মিক ছেলেটার শেষে কিনা এই মতি হল? ব্যায়াম সমিতির আর লাইব্রেরির পাণ্ডা ছেলেদের তিনি বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন। ওই ছেলে আর যেন এ বাড়ির ছায়া না মাড়ায়, কেউ যেন তার সঙ্গে কোনরকম সংস্রব না রাখে। যে-কথা মুখ ফুটে সাহস করে বলতে পারেন নি তা হল, এমন ছেলেকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।

ছেলেরা তাঁকে বোঝাল, ওই ছেলে এত বোকা নয় যে এরপরেও এই এলাকায় পা বাড়াবে। বসাকমশাইয়ের দিক থেকে মুখ একেবারে সেলাই করে থাকাই সব থেকে নিরাপদ। দৈবাৎ যদি পুলিস এখানে এসে খোঁজ-খবর নেয় তাহলে জানাতে হবে অন্তু সেন নামের অস্তিত্ব এখানে কারো জানা নেই। অন্যথায় এখানকার সকলের বিপদ—বসাকমশাইয়ের পোষ্য-পুত্রটির পর্যন্ত।

ভয়ে আর আতঙ্কে ভদ্রলোক মুখ সেলাই করেই থাকলেন।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল ওই পোষ্যপুত্রটিকে নিয়েই। এখন ছেলেদের মনে হচ্ছে বিপুল বসাককে যতই সাদামাটা আর নিরীহ মনে হত তা যেন নয়। যখন-তখন দোতলা থেকে নেমে ব্যায়ামের আখড়ায় আসে, লাইব্রেরিতে আসে। সেটা হয়তো ব্যায়ামের সময় নয়, আর অত রাতে লাইব্রেরিও বন্ধ। বাছাই ছেলেরা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছে বা পার্টির আদেশ-নির্দেশ নিয়ে আলোচনা করছে—বিপুল এসে হাজির। সেই ছেলেদের মুখ তখন ঘোরালো, ধারালো হয়ে ওঠে। এই ছেলে যে তাদের আর কেবল ব্যায়াম সমিতির মেম্বার আর লাইব্রেরির উদ্যোগী কর্মী ভাবে না, সেটা খুব স্পষ্ট।

একদিন একজন তাকে খোলাখুলিই জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার কও তো, সাড়াশব্দ না দিয়া তুমি অ্যামন যখন তখন আইয়া হাজির অও ক্যান?

বেশ থতমত খেয়ে আর ঘাবড়ে গিয়ে বিপুল বলল, ক'দিন দইরাই একটা কথা তোমাগো কমু কমু বাবতাছিলাম—

—কি কথা?

—অন্তুদারে রক্ষা করনের লেইগা আমাগো তো কিছু করা উচিত—তার হয়তো টাকা-পয়সা দরকার—

ওদের মুখ আরো কঠিন আরো নির্মম।—অন্তদার লগে আর আমাগো কি সম্পর্ক—সে শুনছি স্বদেশী ডাকাইতি কইরা বেড়াইতাছে, পারলে তো আমরা তারে দরাইয়া দিমু—

বিপুল জবাব দেয়নি। তার ফর্সা লাল মুখ একটু বিবর্ণ হতে দেখা গেছে। কিন্তু তাদের কথা যে বিশ্বাস করেনি এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট।

খবরটা অন্তুর কানে চলে গেছে। ওরা জানতে চায় নিঃশব্দে ওই ছেলেকে খতম করে দেবে কি না।

প্রস্তাব শুনে অন্তু রেগেই গেল। তরা ক্ষেইপা গেলি নাকি? তোগো সন্দ সত্যি ওইলেও ওই পোলা খতম ওইলে বা নিপাত্তা ওইলে একটা তোলপাড় কাণ্ড ওইয়া যাইবো না—তখন আর পুলিসের চোখে ধুলা দিতে পারবি?···তাছাড়া আমার মানুষ চিনতে এত বুল অয় না, তরা যা ভাবতাসস তা আমার মনে অয় না—ও হয়তো আমার বালই চায়—

অন্তুর অনেকটা বদ্ধ বিশ্বাস ছেলেটা ভাল। কিন্তু ও-বাড়ির দলের ছেলেরা খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তার কথামত তারা ওকে যাচাই করে দেখছে। বিপুলের সামনেই অন্তু সেনের সম্পর্কে কিছুটা নিস্পৃহ আলোচনা করে। যেমন, কার সঙ্গে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় দেখা হয়ে গেছল, অন্তুর শরীর বিচ্ছিরি খারাপ হয়ে গেছে (এটা সত্যি কথা), হয়তো খেতেও পায় না, এভাবে পালিয়ে আর কতদিন বাঁচবে, এবারে ধরা পড়লে ফাঁসি হবে জানা কথাই, ইত্যাদি।

কথার ফাঁকে সকলেই বিপুল বসাকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছে। অবশ্য বেদনার্ত মুখই দেখেছে সকলে। বলেওছে, যেভাবে সম্ভব তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত।

অন্তু সেনের জীবনে সেটাই চরম পরীক্ষার সময়। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। শরীর ভেঙে পড়েছে। গলা দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত ওঠে। কোনো এক জায়গায় থাকতে পারে না, কিন্তু অত পালানোর জায়গাই বা কোথায়? খাওয়ার জায়গা নেই, ঘুমনোর জায়গা নেই। মাঝে মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে রাতে প্রসাদ পেতে যেত। সেখানে সময়ে গেলে ক্ষুধার্তের অন্ন মেলে। যেদিন যেত, এত খেত যাতে পরদিন দুপুর

পর্যন্ত আর খাওয়া না জুটলেও কষ্ট কম হয়।

রাজনীতির পরিস্থিতি তখন সব থেকে জটিল। ধরা পড়লে সর্বনাশ কারণ, বম্বে থেকে পার্টির কাছে নির্দেশ এসেছে, গান্ধীজির কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আসন্ন। এই সময়ে অন্তুদের পার্টিরও ঝাঁপিয়ে পড়ার মোক্ষম সময়। তাদের প্রতি নির্দেশ, সিভিল ওয়ারের জন্য তৈরি হও। অন্তুর ওপর তার এলাকার গেরিলা বাহিনী সংগঠনের দায়িত্ব। কিন্তু ইংরেজ সরকারও চোখ বুজে বসে নেই। খবর সংগ্রহের যন্ত্র তাদেরও কম পাকা-পোক্ত নয়। এই সময়ে প্রথম সারির অনেক দাদাকেই পুলিস ছেঁকে তুলেছে। যাদের ধরতে পারেনি তারা সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম সারির অনেক দাদা ধরা পড়ার ফলে, অন্তুদের মত যারা, এ সময় নেতৃত্ব দেবার গুরুভার তাদের ওপর।

কিন্তু জঠরের ক্ষুধা দাঁত কামড়ে যথাসম্ভব সহ্য করা যায়, গলা দিয়ে রক্ত উঠলে তাও গোপন করা যায়, কিন্তু দিনের বেলায় দেহটাকে লোক-চক্ষুর আড়ালে রাখার মত আশ্রয় কোথায়?

এমন দিনে এক রাতে কোনো বস্তি এলাকার রাস্তায় কোচোয়ান লাল্লুর সঙ্গে দেখা। অন্তুদের পৈতৃক বাড়ি থেকে লাল্লুর দু'বছর আগেই বিদায় নিতে হয়েছিল। কারণ, ওই বাড়িতে ঘোড়ার গাড়ির কাল গেছে। সে জায়গায় মোটর গাড়ি এসেছে দু-দুটো। লাল্লুর খবর কেউ রাখে না, অন্তু তো রাখেই না।

অন্তুকে দেখে ভূত দেখার মতই চমকে উঠেছিল লাল্লু। অন্তু নিজে না ডাকলে লাল্লু তাকে চিনতেও পারত না।

—স্বদেশীবাবু, আপনে! এ কি মূর্তি ওইসে আপনের!

ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষে পুলিসে টানা-হেঁচড়া শুরু হবার পর থেকেই লাল্লু ছোট মনিবকে সগর্বে স্বদেশীবাবু বলত। অবশ্য কারো সামনে নয়। স্বদেশীবাবু এমন কি স্বদেশী ডাকাতও তার চোখে বিরাট মানুষ।

লাল্লুর এই আর্তনাদ স্বাভাবিক। কোন বাড়ির কত আদরের ছেলে ছিল এই স্বদেশীবাবু, তার থেকে ভাল আর কে জানে। সেই ছেলের পরনে এখন ছেঁড়া ময়লা কাপড়, জামার অভাবে এই গরমের দিনেও গায়ে

বিবর্ণ ফ্লানেলের শার্ট, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

—চুপ, আস্তে! খাটো গলায় অন্তু প্রথমেই তাকে সতর্ক করল। তারপর জিগ্যেস করল, তুমি কি জান, পুলিস আমাকে চিনতে পারলে আর ধরতে না পারলে সোজা গুলি করে মারবে?

লাল্লু আঁতকে উঠল, কয়েন কি, এই অবস্থা খাড়ইছে—আপনে তাইলে বাইর ওইসেন ক্যান?

ওর চোখমুখের এই দরদ আর উৎকণ্ঠা ভোলবার নয়। অন্তু জানান দিল, পুলিস তাকে শিকারী কুকুরের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে—থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার জায়গা নেই। চোখে চোখ রেখে জিগ্যেস করল, তুমি আমার একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে পার লাল্লু যেখানে পুলিস ভুলেও পা দিব না?

—পারি পারি নিচ্চয় পারি—আপনে আমার বুকের কোনখানটা জুইরা বইয়া আছেন আপনেও কি জানেন? ··কিন্তু আমাগো মতন লোকের জায়গায় থাকতে আপনের তো কষ্ট অইবো—

—লাল্লু, আমি রাত্রে শ্মশানে খাল-বিলের দারে বা গাছতলায় পইড়া থাকি—আমার কোনো কষ্ট নাই—যদি পার তো একটা ব্যবস্থা করো।

—বুঝছি। আহেন আমার লগে।

—কোনখানে।

—আগে আমার গরে তো চলেন, তারপর বাইবা দেখি।

মদনমোহন বসাক রোডে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। সেখানে মুসলমান কোচোয়ানদের বসতি। লাল্লুর ঘর আরো একটু নিরিবিলিতে খালপারে।

রাতের অন্ধকারে তাকে নিজের ঘরে এনে তুলল। তার বিবিকে বলল, এই আমার সেই বাবুর ছোট মুনিব—কি অবস্থায় পড়ছে মুখ দেইখ্যাই বুইজা ল—কেউ আমার কাছে আইলে দরজা খুলিবি না, মুখ হিলাই কইরা থাকবি। আমি চট কইরা একবার বাজার থিকা গুইরা আহি—

অন্তু জানাল সে-ও এক জায়গা থেকে ঘুরে আসছে, এক জায়গায় তার একটা ভাঙা তোরঙ্গ পড়ে আছে সেটা নিয়ে আসবে—

শোনামাত্র লাল্লু উতলা।—এই রাইতে তুমি বাস্ক আনবা ক্যামনে?

—কিছু বাইবো না, এই পোশাকে আর মূর্তিতে তোরঙ্গ মাথায় কইর
আনলে লোকে আমারে একটু বালা জাতের কুলি বাববো।

লাল্লুর তবু খুঁতখুঁতুনি। কিন্তু কি আর করে। স্বদেশীবাবুদের মর্জি
ওপর কথা চলে না।

রাতে অন্তুর খাওয়া রুটি আর ঝাল মাংস। তার মনে হচ্ছিল এমন
রাজভোজ জীবনে কমই খেয়েছে।

সেই রাতেই লালুর সঙ্গে তার পরামর্শ হয়ে গেল। হ্যাঁ, লাল্লুব এই
ডেরায় যখন তখন অন্য কোচোয়ানরা আসে বটে। তারা ডেরায় একজন
অজানা অচেনা লোককে আস্তানা নিতে দেখলে সন্দিগ্ধ হতে পারে বটে
একটু ভেবেচিন্তে লাল্লু বলল, আইচ্ছা ছোট মুনিব, এই রাইতটা আর
কাইল দিনের বেলাটা তুমি এইখানে কাটাও—এর মধ্যে কেউ না আসে
হেই ব্যবস্থা করুম—কাল রাইতে আমি কাছেই তোমারে এমন এক
জায়গায় লইয়া যামু সেইখানে হদেশী মানুষ ছাইরা কোনো হদেশী মায়ি
আছে কেউ বাবতে পারব না।

—সেটা কোনখানে, কার বাড়ি?

—এইখান থিকা এক মাইলও না, কিন্তু কোনো বদ্দরলোক হেই-
খানের মাটি পাড়ায় না—আমার নিজের হালার বাড়ি—এই পরিবারের
ছুডো বাই—

—হেয় কামটা কি করে?

—এই তো বিপদে ফালাইলেন, হক কথা কই আপনেরে, হালা
রাইতের চোর, বার কয়েক গানি টানছে—আমি কতবার অ-রে গাড়োয়ান
অওনের লেইগা ডাকছি—কিন্তু হালায় চুরির নেশা কাটাইয়া উঠতে পারে
না। কিন্তু আপনের পক্ষে খু-উ-ব নিরাপদ জায়গা, নিশ্চিন্ত থাকেন
হালায় আমারে পীর পয়গম্বরের মতন বগ্গিপতি বাবে।

অন্তু ভেবে দেখল এরকম জায়গাই নিরাপদ বটে। তক্ষুনি রাজি।

পরের রাতে এই নতুন আবাস। লাল্লুর এই চোর শালার নাম
ইসমাইল। বছর তিরিশ-বত্রিশ বয়েস। লাল্লু তাকে নানাভাবে সতর্ক

করতে সে বলল, বোনাই দাদা, আমি চোর ওইতে পারি কিন্তু আল্লার কিরা মানি, আমার জান থাকতে ছাবতার কোনো ক্ষতি ওইবো না—

সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিল, এই ফুলি—এই হারামজাদী এদিকে আয় না ক্যান, গরে ছাবতা আইলো আর তুই হরমে (সরমে) হইরা আছস!

একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়েস। সুন্দর স্বাস্থ্য। ঘোমটার ফাঁকে যেটুকু দেখা গেল, কালো-কালো মিষ্টি মুখ।

—হোন, বোনাই এই ছাবতারে আনছে, আমাগো অতিথি—অতিথি সৎকারের ট্যাকা বোনাইই দিব কইতাছে, কি করম আমাগো আর হেই বাইগ্য বা ক্ষ্যামতা নাই—আমাগো একটাই দায় ছাবতারে কিছুদিন নিরাপদে রাখতে ওইবো—তেনারে পিছনে ফেউ লাগছে—আমি কসম খাইছি, আমাগো জান-পরাণ কিরা, ছাবতার ক্ষতি ওইতে দিমু না। বুজলি?

ফুলি মাথা হেলালো। বুঝেছে। দরমার ও-ধারে সরে গেল।

একটাই মাটির ঘর। মাঝে দরমার পার্টিশন। সে পার্টিশনও আবার ছেড়াখোঁড়া। চোখ লাগালে ও-দিকের অনেক কিছুই দেখা যায়। অন্তু পার্টিশনের এদিকটায় থাকে। অস্বস্তিকর, তবে নিরাপদ আশ্রয়ই বটে।

সমস্তটা দিন দরমার এধারের খুপরির মধ্যেই কাটে তার। তখন ইসমাইলও ঘরে থাকে। দেবতার এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে কিনা এই চিন্তা তার। ফুলি তার সাধ্যমত যত্ন করে রান্না করে। অন্তুর জন্য সকালে চা করে নিয়ে আসে। দুপুরে তার থাকার জায়গাতেই কলাই করা থালায় খেতে দিয়ে ঘোমটা টেনে দরজার কাছে অপেক্ষা করে। যদি কিছু লাগে। লাল্লু বাজার করার জন্য তার কাছে টাকা রেখে গেছে। ও নিজেই এক-ফাঁকে বেরিয়ে বাজার করে আনে। কারণ সকালে অতিথির দেখাশুনা সেরেই ইসমাইল নিদ্রা দেয়। তার রোজগারের অর্থাৎ চুরির ধান্দায় রোজই রাতে বেরুনো আছে। সকালে আর দুপুরে না ঘুমিয়ে পারে কি করে?

অন্তুও দিনের আলোয় কাউকে মুখ দেখায় না। রাতে বেরোয়। কখন কত রাতে ফেরে ঠিক নেই। তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। মুখেচোখে

জল দিয়ে খেয়ে নেয়। তখন পার্টিশনের ওধারের কুপি নেভানো থাকে কিন্তু রোজ রাতেই খেতে বসে অন্তুর মনে হয় দরমার ফাঁক দিয়ে ফুলি বিবি অতিথি দেবতা ঠিকমত খেলো কিনা লক্ষ্য করছে। এক রাতে চাপ গলাও কানে এল, আর দুইটা বাত দেই ?

—না।···আমার লেইগা কেউ এত রাইত পর্যন্ত জাইগা থাকবে আমার অসুবিদা অয়।

আর কোনোদিন রাতে ভাত লাগবে কিনা জিগ্যেস করেনি। কিন্তু অন্তু জানে তার ফিরে এসে রাতের খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত ফুলি বিবি জেগেই থাকে। অবশ্য তার দিকের কুপি তখন নেভানোই থাকে। অন্তু এসে কুপি জ্বেলে খেয়েদেয়ে কুপি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। রাতে ইসমাইল কখন ফেরে না ফেরে টেরও পায় না।

অসুস্থ শরীর নিয়েই অন্তুর রাতের চলাফেরা। আজ পাঁচদিন হল সে এই আশ্রয়ে এসেছে। রোজই রাতে একটু একটু জ্বর হচ্ছে মনে হয়। সেদিন ভালরকমই জ্বর এল। সেই সঙ্গে মাথায় দারুণ যন্ত্রণা। কিন্তু এদের বলে লাভ কি। ওষুধ বা জ্বরের পথ্য তো এখানে আশা করতে পারে না। সেই রাতে আর বেরুনো সম্ভব হল না। যাহোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত দশটার পরে ঘরের মালিক ইসমাইলও তার রাতের শিকারে বেরিয়ে পড়ল টের পেল। তার আগে তার বিরক্তি মেশানো চাপা গলা কানে এল।—তুই গুমাইয়া কাদা ওইয়া থাকস ক্যান গলার আওয়াজ তুইলা ডাকতে অয়, দুয়ারে টক টক শব্দ করলেই উইঠা খুইলা দিতে পারস না ?

কোনো জবাব শুনল না। ইসমাইল বলল বটে কিন্তু অন্তু কোনোদিন ওর ডাকাডাকি কানে শোনেনি।

রাত কত হবে তখন ঠিক বলতে পারবে না। সাড়ে এগারোটা বারোটার বেশি নয়। তন্দ্রার ঘোরে পড়েছিল। বাইরে হাঁক শুনে ভূমি শয্যা ছেড়ে অন্তু ধড়মড় করে উঠে বসল। পার্টিশনের ওধারে তখনো কুপির আলো জ্বলছে।

—কইরে হালা ইসমাইল, গরে আছস ?

অন্ত স্থির-নিশ্চল। চোয়াল শক্ত। এদিক থেকে কেউ জবাব দিল না।

আবার সেই গলা।—গরে কুপি জ্বলে, সাড়াশব্দ নাই ক্যান, হালায় বিবির লগে রস করতাছস নাকি—ডাকতাসি কানে যায় না?

এবারে ফুলির মৃদু গলা।—কে···?

—আমি তোগো যম নুরুল হাবিলদার, তুই চি চি করতাছস ক্যান—ওই হালায় কই?

—গরে নাই তো, একটু কামে বাইর ওইসে।

ওমনি ভারী গলার গর্জন—এই রাইত বারোটায় কামে বাইর ওইসে—অ্যাঁ? আমারে নসি-কোকা পাইসস—কামডা কি আমি জানি না? হালায় এর মদ্যেই আবার চুরি করতে বাইর ওইসে! সন্ধ্যার পর আর গর ছাইড়া বাইর ওইবো না, হেইদিন এই কিরা কাইটা না ও খালাস পাইয়া বাইর ওইলো! আর আইজ এই রাতে আমি আইলাম নিসপেক-শনে—আর গরে নাই! দরজা খোল, আমি সার্চ করুম!

বালিশের নিচে যন্ত্রটা রাখা অন্তর এখন অভ্যাসেব মধ্যে। সেটা তুলে হাতে নিয়ে নিশ্চল বসে রইল। তার ধরা পড়লে চলবেই না।

—কি ওইলো, দরজা খুলবি, না আমি লাইথ্যাইয়া বাংগুম?

—আঃ, এত চিল্লাও ক্যান দারোগা সাহেব, রাইত দুপুরে এত চিৎকার কইরা মাইয়ালোকের গরে ঢুকতে চায়!

দারোগা সাহেব অর্থাৎ নুরুল হাবিলদার এই খুব মৃদু গলার ধমক খেয়ে খিক খিক করে হেসে উঠল। এবারে গলা খাটো করে বলল, আইচ্ছা, কথা না বাড়াইয়া দুয়ার খোল—

—আমি একলা আছি জাইনাও গরে আইতে চাও, কেমন দারোগা তুমি?

ফুলির খুব মিষ্টি মোলায়েম গলা। হাবিলদারের আবার তক্ষুনি মেজাজ চড়ল একটু।—তুই দরজা খুলবি না আমি জোর কইরা ঢুকুম—গরে চোরাই মাল আছে কিনা সার্চ না কইরা আমি এইখান থিকা নড়ুম না—

অন্তর দু কান উৎকর্ণ। তেমনি চাপা মিষ্টি হাসি একটু।—গরে চোরাই মাল নাই, হকের মাল আছে তুমি বালোই জানো—দারোগা ওইয়া হকের মাল লুঠ কত্তি আইবাই?

এবারে লোকটার হিহি হাসি। গলাও নরম। বলল, তরে কয়দিন চোখের দেখাই দেখছি তাইতেই বিতর আনচান—এর উপর বেশ আবার রসের কথাও কছ্ দেখি—নে দুয়ারটা খোল, কতক্ষণ আর বাইরে খাড়া করাইয়া রাখবি···।

দরজা খোলার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ। ভারী জুতো পায়ে লোকটা ভেতরে ঢুকল। ও ঘরে কুপি এদিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরমার ফাঁক দিয়ে অন্তর দেখার অসুবিধে নেই। লোকটা হাসি-হাসি মুখে দড়ির খাটিয়ায় আরাম করে বসামাত্র পুরনো খাটিয়া আর্তনাদ করে উঠল।

—এইটা বাঙবো নাকি রে?

অস্ফুট হাসি। তারপর খুব চাপা জবাব, বাঙতে পারে, দারোগার বার (ভার) তো! চ্যাটাই বিছাইয়া দেই, মাটিতে বহ, আর অত জোরে কথা কইও না, পাড়াপড়শীর গুম বাঙবো—

হাবিলদার হাসি মুখে খুপরির চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর দু চোখ ফুলির অর্ধনগ্ন দেহে আয়েস করে বিঁধিয়ে নিতে নিতে বলল, ওই হালায় এখনো চুরি কত্তি বাইর অয়, গরে চোরাই মাল-টাল হত্যাই রাখে নাই তো রে?

তক্ষুনি মৃদু মুখঝামটা।—চোরাই মালের খোঁজেই আইয়া থাক যদি সেরাচ কইরা চইলা যাও—

খিকখিক হাসি।—আরে রাগ করস ক্যান, আমাগো ডিউটি তো আছে—

—বুজছি, খুব ডিউটি কত্তি আইছ, আর রাইত কইরো না, ডিউটি সাইরা চইলা যাও—ওদিকে কখন আইয়া হাজির ওইবো ঠিক নাই।

ফুলির ধারণা দরমার ওধারের লোক ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম ভাঙার ভয়েই এত মৃদু গলা। কথা শেষ করেই ধুপ করে হাবিলদারের পায়ের কাছে বসে পড়ে তার পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। হাবিলদারের

লুব্ধ দুই হাত তার পিঠের ওপর, তারপর নগ্ন বুকের দিকে। নগ্ন কারণ, রাতের শয্যায় গোড়া থেকেই তার গায়ে কিছু ছিল না, ছেঁড়া শাড়িটা জড়ানো।

—আঃ, করো কি, জুতা জোড়া খুলতে দাও।

—তুই কি বালো রে, তর নামটা য্যান কি?

—নাম দিয়া কি ওইবো, নাম কই আর তুমি রাইত বিরাইতে আইয়া ওই নাম দইরা ডাকো।

হাবিলদারের গলায় মধু।—আইচ্ছা তুই আমার ময়না পাখি—ক্যামন? কোমরের বেল্ট খুলছে।

—আ-হা। ফুঃ!

এক ফুঁয়ে ফুলি কুপি নিভিয়ে দিল।

—কুপিটা আবার নিবালি ক্যান!

ফিস ফিস জবাব, আর বেশি রসে কাম নাই।

অন্তু দরমার এধারে স্থির নিশ্চল পাথরের মত বসে। সেই অন্ধকারের বাকি নাটকটুকু কেবল অনুভবের বস্তু। বেড়ার ওধারে নারীমাংসলোলুপ আদিম পুরুষ। তাকে লোলুপ বিস্মৃতির পথে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেই নারীর আর একজনকে নিষ্ঠুর বলির হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদ। জঠরের সন্তানের স্নেহে তাকে আড়ালে রাখার চেষ্টা। নারীর এই চেষ্টা সফল।

খানিকক্ষণের মধ্যে আবার পুরুষের পরিতৃপ্ত গলা।—তুই এত মিষ্টি এত বালো, একটা চোরের লগে গর করতাছস কেমনে—এই হালারে ছাইড়া দে।

—যেমন বাইগ্যি। ছাড়লে আমারে কে নিব। তুমি নিবা? তোমার গরে নিয়া তুলবা?

—আরে আমার ঘরে তো আর এক মাগী সব আগলাইয়া বইয়া আছে—তুই এইখানেই থাক, দেখি তরে আর একটু বালো রাখতে পারি কিনা।

—বেশি বালোয় কাম নাই, হ্যাসে দুই দিকই যাইবো আমার।

—আরে না না, আইচ্ছা আবার কবে আমু ক'।

—অখন আর কয়েক দিনের মধ্যে আহনের নামও কইরো না, তুমি খবর নিতে আইছিলা শুনলেই মরদে কিছুদিন আর গর থিকা বাইর ওইবো না।

—আমি আইছিলাম তুই তাইলে কইস না—তাইলেই বাইর ওইবো—

—দারোগাগিরি কইরাও যে কি বুদ্ধি তোমার, তুমি এই দিকে' টহল দিতে ডুকছ তা এই দিকের কম কইরা ডজনখানেক লোকে জানছে -- এমন একটা ডাকসাইটা লোক তুমি, তোমারে কেউ আইতে দেখে নাই বাবলা কেমতে?

—ঠিক আছে, তাইলে কয়েকদিন পরেই আহুম।

অন্য দিনের মত পরদিন সকালে ফুলি কলাইয়ের গেলাসে অন্তুর চা নিয়ে এল। ছোট ঘোমটায় কালো মুখের খানিকটা দেখা যায়। অন্তু হাত বাড়িয়ে চায়ের গেলাস নিল। গায়ে জ্বর আছে। মাথাটা ভার।

—ইসমাইল উঠছে?

মাথা নাড়ল। এখনো ওঠেনি।

—উঠলেই একটু পাঠাইয়া দিও তো, কথা আছে।

ঘোমটার ফাঁকে সচকিত দুই চোখ তার মুখের ওপর চলে গেল।

খানিক বাদে ইসমাইল এল।—আমারে ডাকছেন?

না তাকিয়েও অন্তু দরমার ফাঁকে দুটো উদ্‌গ্রীব চোখের অস্তিত্ব অনুভব করছে—তোমার বোনাই দাদাকে একটা খবর দিতে পারবা?

—পারুম না ক্যান, তারে তো রোজই আপনের কথা কইয়া আইতে অয়—কি কমু?

—একবার আইতে কইবা, দরকার আছে।

নিজের নিরাপত্তার কারণেই অন্তুর এবার এখান থেকেও সরে যেতে হবে। রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ এরপর ঘনঘন এখানে আসবেই। এই সময়ে ধরা পড়ার থেকে অন্তুর মৃত্যু কাম্য। লাল্লু অনুরোধ করেছিল তাকে না জানিয়ে স্বদেশীবাবু যেন এখান থেকে চলে না যায়।

ইসমাইল লাল্লুকে খবর দিতে চলে গেছে। অন্য দিনের মত আজ দরমার বেড়ার ওধারে টুকটাক ঘরকরনার সাড়াশব্দও নেই।··ওই যাওয়াটা অন্তু খুব সহজ করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা কি হল না? ফুলি বিবি কিছু আঁচ করেছে?

লাল্লু মিঞা নিঃশব্দে এসে হাজির হল।—হুকুম করেন···

—হুকুম কিছু নাই, আমি আইজ চইলা যামু, তুমি···তোমরা অনেক করলা—

—কি আর করলাম, আমাগো করনের সাদ্দি কি—কিন্তু আপনার চোখমুখ তো ঠুসঠুইসা, শরীরও বালো দেখতাছি না, এই শরীর লইয়া কই যাইবেন?

হাসল।—পাগল, আমাগো এইসব জিগাইতে নাই।

—বুজলাম। কখন যাইবেন?

—সন্দার পরে···আমি বাইর ওইয়া গেলে তুমি আমার তোরঙ্গটা খুব সাবদানে বুড়িগঙ্গার ফেরি গাটে দিয়া আইতে পারবা?

লাল্লু মিঞা বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল। পারবে।

সেদিনও বেড়ার এধারে বসেই অন্তু দুপুরের খাওয়া খেল। ইসমাইল সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করছে। ফুলি বিবি পরিবেশন করেছে। মাথার ঘোমটা অন্য দিনের তুলনায় বেশি টানা।

দিন গেল। সন্ধ্যা হল। অনাড়ম্বর বিদায়কাল উপস্থিত। ইসমাইল বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে আসার ইচ্ছে ছিল। অন্তু নিষেধ করেছে। দরমার এ ধারের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল। দাঁড়াতে হল একটু।

দরজার কাছে ফুলি বিবি দাঁড়িয়ে।

মাথায় ঘোমটা নেই তাও খেয়াল নেই বোধ হয়। চেয়ে আছে। এমন বিষণ্ণ মুখ অন্তু আর কি দেখেছে···।

বেরিয়ে এল। বুকের ভেতরটা নিঙড়ে একটা অনুভূতি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। · মা-গো, তোমাকে যদি জীবনে ভুলি আমার সব কাজ মিথ্যে।

বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে অন্ত যে গ্রামে এল তার নাম সুভৈড্যা। পার্টির নির্দেশে আগে গ্রামে গ্রামেই বেশি ঘুরতে হত। এই গ্রামেও অনেকবার এসেছে। ঢাকার পরেই এখানে তাদের সংগঠন। এক চাষী পরিবারের সঙ্গে খাতিরটা স্নেহের সম্পর্কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারা চিনতে পারল, এই চেহারা দেখে আঁতকেও উঠল।

অন্তুর নিজের ওপরেই রাগ। এ সময়ে কাজের অন্ত নেই। কাঁধে গুরু দায়িত্বভার। আর এই সময়েই কিনা শরীর অচল হয়ে পড়ছে।

এখানেও পার্টির ছেলেরা আসন্ন সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তারা জানত তাদের নেতা আসছে। রাতে যোগাযোগ হয়। অন্তু তাদের মারফত ঢাকায় পার্টির কাছে আর ছেলেদের কাছে নির্দেশ পাঠায়। হাতে সময় খুব নেই। দিন এগিয়ে আসছে। কোথায় কিভাবে কাজ হবে প্ল্যান হয়, খবর যায়। রাতে ঘরের মাচার ওপর পাটকাঠির বিছানায় শোয়। নড়লে চড়লে মড়মড় করে। অন্তু জ্বরে ধোঁকে।

সময় এগিয়ে আসছে। ঢাকার সঙ্গে অন্তুর এখন নিবিড় যোগাযোগ দরকার। আবার শরীরটার জন্যও ঢাকায় না এলে নয়। গলা দিয়ে ঘনঘন রক্ত উঠছে। দু'পায়ে এসময় শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর জন্যও কিছু চিকিৎসা দরকার। চেহারা যা, দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এ ছেলের বাইশ বছর মাত্র বয়েস। মন নয়, অন্তু সেনের দেহটাকে জরায় পেয়ে বসছে।

ঢাকায় চলে এল। গ্যাণ্ডারিয়াতে অতি পরিচিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বাড়ি। মোটামুটি পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। এদিক থেকে অনেকটা নিরাপদ আশ্রয়। অন্তুর এখানে গোপন বাসের খবর পার্টির আর ব্যায়াম সমিতির কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানে না। খুব সংগোপনে চিকিৎসা চলছে আবার কাজও থেমে নেই। রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। কিন্তু সময় এগিয়ে আসছে বলে অন্তুকে প্রায়ই বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে সুভৈড্যায় আসতে হয়। আবার রাতের অন্ধকারে ফিরেও আসে।

আগামী পরশু বড় আঘাত হানার দিন। আজ বিয়াল্লিশ সালের

এগারোই আগস্ট। তেরোই আগস্ট অ্যাকশন ডে। প্ল্যান রেডি। ঢাকা য়ুনিভার্সিটির আর কলেজের ছাত্ররা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ নিয়ে 'কুইট ইণ্ডিয়া' স্লোগান দিতে দিতে প্রসেশন নিয়ে বেরুবে। আশা করা যায় সাধারণ মানুষও প্রসেশনে যোগ দেবে। প্রথম লক্ষ্য আদালত। সেখানকার ইউ-নিয়ন ফ্ল্যাগ পোড়ানোর প্রোগ্রাম, তারপর কোর্টের কাগজপত্র পোড়ানোর চেষ্টা। জনসাধারণের সমর্থন সেরকম জোরদার হলে ঢাকা জেল আক্রমণ করা হবে। কারা কোন্ সংঘাতে নেতৃত্ব দেবে তাও স্থির। অন্তু সেন ভোর-রাতে বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে গ্রামে চলে আসবে। এখানকার ছেলেদের দায়িত্ব টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, ঢাকায় এসে বিশেষ বিশেষ রাস্তায় ট্রেঞ্চ কেটে রাস্তা আটকানো। তের তারিখে এই সব-কিছুই আচমকা এবং একযোগে হবে।

অন্তু ঢাকার গ্যাণ্ডারিয়ার সেই বাড়িতে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। মনে একটাই প্রার্থনা, আর তুটো দিন যেন এই দায়িত্বভার বহন করার মতো শক্তিটুকু দেহে থাকে।

বাড়ির একজন এসে চুপি চুপি খবর দিল প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর ধরে একটা ছেলে বাড়ির গেটের কাছে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়িটাই তার লক্ষ্য এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। খুব সম্ভব স্পাই।

অন্তুর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। ভয়ে নয়। এতবড় প্রোগ্রা-মের মুখে এসে ধরা পড়লে সর্বনাশ। যে গোপন ব্যবস্থায় অন্তু সেন এখানে আছে কাকপক্ষীরও টের পাওয়ার কথা নয়।

অন্তু বালিশের নিচে থেকে রিভলভারটা নিয়ে পকেটে রাখল। বলল, যাও, বুঝে এসো কি চায়, আর পিছনের দরজা দিয়ে আমার বেরুনোর ব্যবস্থা করে রেখে যাও। তাড়াতাড়ি এসে খবর দেবে—

মিনিট দশেকের মধ্যে আবার এসে খবর দিল, তোমার নাম করে তোমার সঙ্গেই একবারটি দেখা করার জন্য খুব অনুরোধ করছে। অন্তু সেন নামে এ বাড়িতে কেউ নেই, কেউ থাকে না, ও নামের কাউকে এখানে কেউ চেনেও না বলতে সে জানালো তার নাম বিপুল বসাক, বনগ্রামের ব্যায়াম সমিতি থেকে আসছে, তার নাম করে তোমাকে বলতে

বলল, খুব দরকার, একবারটি দেখা করেই চলে যাবে।

প্রথম অনুভূতিতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল অন্তুর। স্পাই নয়। ব্যায়াম সমিতির পাণ্ডারাও এখন বিশ্বাস করে ছেলেটা ভাল আর সরল। কিন্তু তারপরেই অন্তুর আবার চোয়াল শক্ত। সে এখানে আছে এ খবর দলের বিশেষ কয়েকজন ছাড়া আর কারো জানার কথাই নয়। তাদের কেউ না বলে থাকলে বিপুল জানলো কি করে? যে ওকে বলেছে সে যে কত বড় সঙ্কটের ঝুঁকি নিয়েছে তা তো তার না জানার কথা নয়।

কঠিন মুখে অন্তু জিগ্যেস করল, যে এসেছে তার চেহারা কেমন?

বর্ণনা শুনে সন্দেহ থাকল না। বিপুল বসাকই বটে।

—নিয়ে এস।

একটু বাদে বিপুল বসাককে সঙ্গে করে সে ফিরে এল। অন্তুর ইশারায় তাকে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, অন্তুদা, এ কি চেহারা ওইসে তোমার—ওরা যা কানাকানি করে তাই সত্য তাইলে—তোমার গলা দিয়া রক্ত পড়ে?

অন্তু অপলক কঠিন চোখে চেয়ে আছে।—আমি এইখানে আছি তোমারে কে কইলো?

দু হাত জোড় করে কাতর মিনতির সুরে বিপুল বলল, জিগাইও না—অন্তুদা, আমি কথা দিছি কমু না—তোমার সম্বন্ধে উড়া উড়া কথা শুইনা আমি পাগলের মতো ওইয়া গেছিলাম, খাইতে পারি না গুমাইতে পারি না—হ্যাসে একজনে বিশ্বাস কইরা আমারে কইলো। পকেটে হাত দিয়ে বিপুল বসাক এক পাঁজা নোট বার করল, তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমি জানি চিকিৎসার লাইগা এই সময় তোমার টাকার দরকার, এইখানে হাজার টাকা আছে—এই টাকাটা তুমি দয়া কইরা রাখো অন্তুদা, আমার উপর রাগ কইরো না, আমি অখ্যনি চইলা যাইতাছি।

অন্তুর কঠিন মুখে নরম রেখা পড়তে লাগল। চেয়ে আছে। গম্ভীর তখনো। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। বিয়াল্লিশ সালের হাজার টাকা অনেক টাকা। কিন্তু তার থেকেও এই দেওয়ার আকৃতি কম কিছু নয়। টাকা নিয়ে পকেটে রাখতে বিপুল কৃতার্থ।

—এইবার বলো আমি এখানে আছি এ তোমারে কে কইছে ?

—তুমি তারে শাস্তি দিবা অন্তুদা, তার বদলে তুমি আমারে শাস্তি দাও, দোষ আমার !

—শোন বিপুল, অন্তুর গলার স্বর স্থির কঠিন, যে তোমারে কইছে সে কত বড় অন্যায় করছে তুমি জানো না—তোমার মুখ চাইয়া তারে শাস্তি না দেই ওয়ার্নিং না দিলে দলের ক্ষতি ওইবে। কে বলছে তোমারে কইয়া যাইতে ওইবো।

কাতর মুখে বিপুল নাম বলল। আবারও তার হয়ে ক্ষমা চাইলো। আবারও জানালো তার ছটফটানি দেখেই সে না বলে পারেনি।

—ঠিক আছে, যাও।

বিপুল উঠে দাঁড়ালো। যেতে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়ালো। —একটা কথা কমু অন্তুদা ?

অন্তু চেয়ে আছে। মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

—আমারে কেউ পাত্তা ছায় না, কেউ কিছু কইতেও চায় না, বড়লোকের পুষ্যি বইলা ঠাট্টা করে—কিন্তু আমি কি তোমাগো কোনো কাজে লাগতে পারি না—একবার বিশ্বাস কইরা ছাখো না ?

অন্তু তার পরেও চেয়ে রইলো খানিক। মাথা নাড়ল, পারো।…কি কাজে লাগতে পার পরশু সকালে তোমারে ব্যায়াম সমিতির একজন কইয়া দিব—তোমার ইচ্ছা আর সাহস ওইলে আসবা। এখন যাও।

—তুমি কথা দিতাছ আমারে তোমরা তোমাগো লগে নিবা? আনন্দে ছু'চোখ চকচক করছে।

—দিতাছি। পরশু সকালে জানতে পারবা।

সেই পরশু। তেরোই আগস্ট। অন্তু রাত থাকতে নিজেদের খেয়ায় বুড়িগঙ্গা পার হয়ে গ্রামে এসেছে। বেলা এগারোটার মধ্যে ঢাকার চারদিক থেকে চারটে প্রোসেশন বেরুবে। সকলের লক্ষ্য কোর্ট, ইউনিয়ন জ্যাক। ও-দিকের ব্যবস্থা সেরে অন্তু বেলা বারোটা-একটার মধ্যে আসল দায়িত্ব

নেবে।

ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। প্রায় দেড়টা। বিপুলের দেওয়া সেই টাকা পকেটে। তখন পর্যন্ত তা থেকে এক টাকাও খরচ হয়নি। নদী পেরিয়ে যেখানে নৌকো এসে লাগল সেটা কোনো ঘাট নয়। অন্তু দেখল সেখানে তিনটি ছেলে তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে।

ওদের মুখ দেখেই কেমন মনে হল খবর ভাল নয়।

নেমে আসতেই যা শুনল, অন্তু খানিকক্ষণের জন্য নিশ্চল পাথর। ···বিপুল বসাক নেই।

···ও-দিকের প্রোসেশন যখন নবাবপুর পোলের কাছে এসেছে, পুলিস বন্দুক উঁচিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তবু প্রোসেশন এগোতে ফায়ারিং শুরু করেছে। ছাত্র আর জনসাধারণের প্রোসেশন তখন পোল থেকে নেমে ইংলিশ রোড ধরে গন্তব্য লক্ষ্যের দিকে ছুটেছে। পুলিস গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু নিয়েছে। যার হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সে পায়ে গুলি লেগে মুখ থুবড়ে পড়ল। সকলের আগে পাগলের মত ছুটে গিয়ে বিপুল বসাক সেই ফ্ল্যাগ নিয়ে ছুটল। পিছনে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুলিস তাড়া করে আসছে। বিপুল বসাক সেই ইংলিশ রোডেরই একটা একতলা বাড়িতে ফ্ল্যাগ হাতে ঢুকে পড়ল। ওটা নাকি দাশেদের বাড়ি। বিপুল বসাক ছাদে উঠে গিয়ে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে বক্তৃতা শুরু করে দিল। সার্জেন্ট জোনস বন্দুক উঁচিয়ে তাকে নেমে আসতে বলতে বিপুল বসাক ছাদ থেকে তার মাথা লক্ষ্য করে একটা বড় পাথর ছুঁড়ে মারল। হেলমেট থাকা সত্ত্বেও জোনস মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তক্ষুনি অন্য সার্জেন্টরা পরপর গুলি করে বিপুল বসাককে ফেলে দিয়েছে, ছাদের ওপর ফ্ল্যাগ হাতে তাকে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে সকলে।

ওই একঝাঁক গুলি খাওয়ার পর বিপুল আর বেঁচে নেই তাতে কারো সন্দেহ নেই।

···ঢাকা শহরের চারদিক জ্বলছে। কিন্তু সব থেকে বেশি গণ্ডগোল ইংলিশ রোডের ওই একতলা বাড়ির কাছে। সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে প্রোসেশনিস্টদের সেখানে খণ্ডযুদ্ধ চলছে। ওই বাড়িটাকে লক্ষ্য করে

উন্মত্ত জনতা এক-একবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে, জবাবে পুলিসও অবিরাম গুলি চালাচ্ছে। এক-একবার তাড়া করে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে।

অন্তু সেনের আত্মস্থ হতে খুব সময় লাগল না। সে গেরিলা বাহিনীর নেতা, শিরায় শিরায় রক্ত জ্বললেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যে-বাড়ির ছাদের ওপর বিপুল পড়ে আছে সেই দাশেদের বাড়ি শুধু নয়, ইংলিশ রোডের প্রায় সব বাড়ি-ঘরের ছকই জানা, বলতে গেলে চোখের ওপরে। ··যে-বাড়ির ছাদে বিপুল পড়ে আছে তার লাগোয়া বাড়িটাও একতলা। হাত দুয়েকের মত ফারাক। মাঝে খুব সরু বাঁধানো গলি। প্রথম বাড়িটা···

—পুলিস ওই বাড়িগুলোর সামনের রাস্তা জুড়ে পাহারা দিচ্ছে?

ওরা জানালো সামনের অনেকটা রাস্তা জুড়েই পাহারা দিচ্ছে—ওই বাড়ি দুটোর সামনে রাইফেল আর বন্দুক নিয়ে কম করে বিশ-পঁচিশ জন সার্জেন্ট আর সিপাই ফায়ার করার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

সঙ্কল্প স্থির করে নিতে অন্তুর দু মিনিটও সময় লাগল না। ওই ছেলেরা সাইকেলে এসেছিল, তাদের একজনের সাইকেল নিল। বলল, বিপুলের বডি আমাদের চাই, এটাই এখন সব থেকে বড় কাজ। তোমরা ইংলিশ রোডে চলে যাও। লিডার যাদের পাও তাদের গিয়ে বল ওরা হাজার গুলি চালালেও যেন সরে না আসে, যতটা সম্ভব গুলি বাঁচিয়ে বার বার যেমন অ্যাটাক করছে তেমনি করে যেতে হবে। মোট কথা জনতাকে নিয়ে আরো ঘণ্টা দুই অন্তত পুলিসকে ওখানেই ব্যস্ত রাখতে হবে—হবেই। দু-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পুলিস যেন ট্রাক বা ভ্যান নিয়ে যাবার মত রাস্তা ফাঁকা না পায়। বিপুলের বডি আমাদের চাই—ওই বডি নিয়ে প্রোসেশনে বেরুতে পারলে আমাদের আজকের অপারেশন সাকসেসফুল জেনো। বডি দখলের ব্যবস্থা আমি করছি—তোমরা চলে যাও—গিয়ে খবর দাও!

এমন অসম্ভব ব্যাপার কি করে সম্ভব হতে পারে তারা ভেবে পেল না। কিন্তু ভাবার অবকাশ বা প্রক্রিয়ার তাদের নেই। দু সাইকেলে চেপে তিনজনে ছুটল।

গলা দিয়ে রক্ত পড়ে, শরীর দুর্বল, অন্তুর কিছুই মনে থাকল না। এই গণ্ডগোলে কোন্ কোন্ রাস্তা একেবারে ফাঁকা থাকা সম্ভব অন্তুর তা নখদর্পণে। ঢাকা শহরের বন্দুকধারী পুলিস আর সার্জেণ্টরা এখন কোন্ কোন জায়গায় ব্যস্ত তাও নির্ভুলভাবেই জানা। ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে সে ব্যায়াম সমিতিতে চলে এল। গেরিলা বাহিনীর আরো দশটি ছেলে সেখানে তার জন্যই অপেক্ষা করছে। অন্তুর এই দল নিয়ে বেরুনোর কথা। এরা সকলেই মরতে প্রস্তুত।

কি হয়েছে তাদের সংক্ষেপে জানালো। কি করতে হবে তা-ও বলল। বলল, হয় মরব না হয় বিপুলের বডি নিয়ে প্রোসেশনে বেরুব—জনতাকে ডাকব। এই দশজনের মধ্যে দুজনকে মাত্র সঙ্গে নিল। দুজনকে বলল, বিপুলের বডি উদ্ধার করতে পারবে ধরে নিয়ে বড় নতুন খাট এনে আর অনেক ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতে। বাকি ছজনের মধ্যে তিনজনকে পাঠিয়ে দিল ইংলিশ রোডের হামলার জায়গায়। অন্য তিন-জনের সঙ্কেত পেলে তারা প্রোসেশনকে পিছু হটিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে। সেখানে দলের সব লিডারদের সাহায্যে সেই প্রোসেশনের লোক নিয়ে এখানে এই ব্যায়াম সমিতিতে আসতে হবে। না, ফিরে আসার সময় তারা প্রোসেশন করে এখানে আসবে না। পুলিস যাতে বুঝতে না পারে এমনি ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা রাস্তা ধরে দলে দলে এখানে আসবে।

বিপুলের দেওয়া সেই হাজার টাকায় এই প্রথম হাত পড়ল। বিপুল বসাকের জন্য খাট আসবে, ফুল আসবে। টাকা নিয়ে দুজন সেই ব্যবস্থা করতে চলে গেল। তিনজন নির্দেশ নিয়ে সাইকেলে ছুটল ইংলিশ রোডের দলের সঙ্গে মিশে যেতে।

বডি উদ্ধারের সঙ্কেত নিয়ে যে তিনজন যাবে তারাও কি করতে হবে বুঝে নিল। ইংলিশ রোডের কোন্ একতলা বাড়ির ছাদে বিপুলের বডি পড়ে আছে এরাও তা সহজেই আঁচ করতে পারল। অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে তারা সেই বাড়ির পিছনের দিকটায় চলে যাবে। ধরা পড়ার আশঙ্কা কম। কারণ ওই সারির সব বাড়িগুলোরই পিছন দিকে মেথর আর জমাদারদের ময়লা নিয়ে যাবার সরু গলি। যে রাস্তায় তারা দাঁড়াবে

সেই সারির বাড়িগুলোর পিছন দিকেও ওই একই গলি। পিছনের বাড়ির দিকে রাস্তায় দুজন দাঁড়াবে, আর একজন গলির মুখে। পিছনের ওই গলি দিয়ে ডেড-বডি বার করতে হবে। গলির মুখেই একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে। রাস্তার দিকের দুজন ওই ঘোড়ার গাড়ি পাহারা দেবে। ডেড-বডি সেই গাড়িতে তোলা হলেই গলির মুখে যে পাহারায় থাকবে সে অন্য দুজনকে নিয়ে ইংলিশ রোডের দলকে ফেরার সঙ্কেত দেবে। অন্তু এদেরও স্মরণ করিয়ে দিল, একবারে নয়, ওখানকার বিশাল জনতাকে নিয়ে ভাগে ভাগে ফিরতে হবে—পুলিসের চট করে না সন্দেহ হয়।

ওই তিনজনের সাইকেলের পিছনে অন্তু আর বাকি দুজন উঠল। খালপারের কোচোয়ানদের এলাকার আড্ডার কাছে তাদের নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে যাবে। বডি আনার সরঞ্জামের মধ্যে একজনের থলেতে কিছু দড়ি আর ছোট একটা দড়ির মই। এ-রকম অনেক সরঞ্জাম ব্যায়াম সমিতিতেই মজুত থাকে।

···অন্তুর আশা এই গণ্ডগোলের দিনে কোচোয়ান লাল্লু মিঞাকে খালপারে বা তার ঘরেই পাবে। সব রাস্তাই ফাঁকা। পথে কোনো গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে।···আর যদি লাল্লু মিঞাকে না পায় তাহলেও ওই কোচোয়ানদের এলাকায় ঘোড়ার গাড়ি একটা পাবেই। কোমরে গোঁজা রিভলবার সকলের কাছেই আছে, যারই নাকের ডগায় ধরবে সেই বিনা বাধায় সুড়সুড় করে আসবে।

খালপারের কাছাকাছি তাদের নামিয়ে দিয়ে ওরা তিনজন অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্তু আর অন্য দুজন ছাড়াছাড়ি হয়ে খালপারে চলল।

লাল্লুকে তার ঘরেই পেল। সবে দুপুরের খাওয়া শেষ করে উঠেছে। এই দিনে স্বদেশীবাবুকে এখানে দেখে তাজ্জব। কিছু বলে ওঠার আগেই অন্তু আঙুল তুলে নিজের ঠোঁট চাপা দিল। অর্থাৎ এখানে একটি কথা নয়।

তাকে আড়ালে ডেকে এনে জানাল, এক্ষুনি ঘোড়ার গাড়ি বার করে তাকে আর আরো দুজনকে তুলে নিয়ে এক জায়গায় যেতে হবে। গাড়িতে একটা ডেড-বডি তুলে আনতে হবে। যে রাস্তা দিয়ে তারা যাবে,

ধরা পড়ার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। পড়লেও শুধু তারা তিনজনই মরবে—লাল্লুর কোনো ভয় নেই। পুলিসকে সে শুধু বলবে স্বদেশীবাবুরা নাকের ডগায় রিভলবার ধরে জোর করে তাকে নিয়ে গেছে। নিজের প্রাণের দায়ে তাকে গাড়ি নিয়ে আসতে হয়েছে।

প্রথম ধাক্কায় লাল্লু মিঞা হকচকিয়েই গেছে। কিন্তু এককালের সেই খোকা মনিবের মুখের দিকে চেয়ে সামলে উঠতে সময় লাগল না। গলা খাটো করে জিগ্যেস করল, রিবলবার আপনের সঙ্গে আছে?

জবাবে অন্তু নিজের গায়ের জামাটা একটু তুলে দেখাল। বলল, অন্য দুজনের সঙ্গেও আছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য লাল্লু মিঞার চোখেমুখে ত্রাসের ছায়া। কিন্তু এটুকু যে তার সেই অতি প্রিয় খোকা মনিবের জন্যই, এটুকু অন্তু বুঝতে পারল না। বলল, বেগতিক দেখলে তুমি তো তোমারে রিভলবার দেখাইয়া জোর কইরা দইরা আনার কথা কইবাই, তাছাড়াও কথা দিতাছি লাল্লু, প্রাণ দিয়াও আমরা তোমারে বাচাইতে চেষ্টা করুম—তোমার শালার গর থিকা চইলা যাওনের দিন তুমি কইছিলা, দরকার হইলে তোমারে য্যান না বুলি···আমার জীবনে এর থিকা বেশি দরকার আর হইবো কিনা জানি না লাল্লুভাই···আইজ তুমি গাড়ি লইয়া না আইলেই না—

লাল্লু সোজা হয়ে দাঁড়াল।—আমি তোমার লেইগাই অস্থির হইতা-ছিলাম, তুমি যে আমার কতখানি জান না খোকা মুনিব·· তুমি মরলে আমার এই পরানটা বেশি না···তোমার লগে আমিও মরতে পারুম—তুমি অন্যদের লইয়া রাস্তায় গিয়া খাড়ও, আমি পাচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি লইয়া আইতাছি—

যেতে গিয়েও থমকালো।—কিন্তু খোকা মুনিব, আইজকার দিনে তো রাস্তার পুলিস ঘোড়ার গাড়ি দেখলেও থামাইয়া দেখতে চাইতে পারে—

কথাটা বলে মূর্খ লাল্লু মিঞা প্রকারান্তরে কি যে রক্ষা করেছে তাদের, সেটা অন্তুকে মর্মে মর্মে বুঝতে হয়েছে। অন্তু প্রথমে বলল, আইজ

অন্য সব রাস্তায় পুলিসই নাই—। তারপর কি ভেবে জিগ্যেস করল, তোমার গরে গোটা তিনেক বোরখা ওইবো ?

—বোরখা! পরক্ষণেই লাল্লু বুঝল। বুঝে নিশ্চিন্ত। হাসলও। —আমার গরে চাইর-চাইট্টা মাইয়া আর পরিবার—বোরখা গাড়ির মধ্যেই থাকব—আপনেরা ডাইকা ডুইকাই বইয়েন।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে লাল্লু তার ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এল। কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় যেতে হবে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে সঙ্গী দুজনকে নিয়ে অন্তু গাড়িতে উঠল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে বাইরে ভট-ভট শব্দ আর একটা হাঁক শোনা গেল, এই—ও! গাড়ি থামাও! এই দিনে গাড়িতে কে যায়—কই যায় ? দিশি মানুষের গলা।

গাড়ি থামল। লাল্লুর গলা, সেলাম সার্জেন্ট সাহেব—হুজ্জতের দিনে বিবিগ দুই পোলা গরে আহে নাই—তাগো কান্নাকাটি কইরা নবাবপুরের থানার দিকে যাইতাসে—হেই থানায় তাগোর কোন্ রিস্তা বালো কাম করে—

ভট-ভট শব্দ করে মোটর-বাইকটা গাড়ির পাশে এল। হাতের এক ধাক্কায় বন্ধ দরজার একটা দিক খুলে গেল, পরক্ষণে আবার শব্দ করে বন্ধ হল। গাড়িতে কালো বোরখা ঢাকা তিনটে মেয়েছেলেই। ভট-ভট শব্দ তুলে মোটর-বাইক এগিয়ে চলে গেল।

অন্তু কি এই লাল্লু মিঞাকেও জীবনে ভুলবে ?

ঠিক নিশানায় এসে ঘোড়ার গাড়ি থামল। অন্তু অন্য দুজনকে নিয়ে চোখের পলকে পিছনে মেথর যাতায়াতের গলিতে ঢুকে পড়ল। তার মধ্যেই তারা চোখ চালিয়ে দেখে নিল, গলির মুখে আর রাস্তায় দলের তিনজন সাইকেলে ঠেস দিয়ে বাতাস খাচ্ছে।

খিড়কির পলকা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু পিছনের এই দেয়াল অনায়াসে টপকানো যায়। অন্তু আর দুই সঙ্গী আধ মিনিটের মধ্যে লাগোয়া একতলা বাড়ির ভিতরে।

রিভলবার হাতে তিন-তিনটে লোককে দেখে বাড়ির মেয়ে-পুরুষ

আতঙ্কে বোবা। বাইরে সামনের রাস্তায় যা চলেছে তাইতেই তাদের থরোথরো কাঁপুনি।

অন্ত গম্ভীর নিচু গলায় বলল, আপনেগো কোনো ভয় নাই, আমরা কারো কোনরকম ক্ষতি করতে আসি নাই, আমরা কেবল আপনেগো ছাদ দিয়া ওই লাগোয়া ছাদ থিকা আমাগো বন্ধুর দেহটা আইনা এইখান দিয়া চইলা যামু, আপনেরা কেবল চুপ কইরা থাইকা আমাগো সাহায্য করেন—কেউ বাইরের দিকে যাইবেন না, কেউ একটা কথা কইবেন না। ··তাপস, তুই এইখানে এগো লগে থাক, রমণী, তুই আমার লগে ছাদে আয়।

বাড়ির লোক চিত্রার্পিত। রিভলবার হাতে একজনের নিচে থাকার অর্থ তারা ভালই বুঝেছে। বিপ্লবীদের এই মূর্তি দেখা না থাক, ঢাকার মানুষের জানা নেই এমনও নয়।

অন্ত তার সঙ্গীর সঙ্গে চোখের পলকে ছাদে উঠে গেল। তারপরেই হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। দাঁড়ালেই সামনের রাস্তার লোক অর্থাৎ পুলিস দেখতে পাবে। ছাদের আলসের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখল দু বাড়ি জুড়ে সামনের রাস্তায় বন্দুকধারী সেপাই ছেয়ে আছে, সাত-আট জন লাল-মুখ সার্জেন্ট এদিক ওদিক টহল দিচ্ছে। দুই বাড়ির ছাদের ফারাক বড় জোর দু'হাত।

ছোট্ট থলেটা হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ত ছাদের মাঝামাঝি জায়গার দেয়ালের সামনে এল। তার সঙ্গী রাস্তার দিকে চোখ রেখেছে। সে ইশারা করা মাত্র থলে হাতে পাঁচিলের ওপর উঠেই ওদিকের ছাদে লাফ দিয়ে নেমেই বুকের ওপর শুয়ে পড়ল। ওদিকের পাঁচিলের কাছে বিপুলের দেহ পড়ে আছে। মনে হল, চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে সে। কাঁধের কাছে ধরা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ।

হামাগুড়ি দিয়ে অন্ত কাছে এল। বিপুলের মুখ বুক গুলিতে ঝাঁঝরা কপালের রক্ত মুখের কাছে শুকিয়ে আছে, বুকের রক্ত বুকেই। তবু মনে হল বিপুলের অত ফর্সা মুখখানা বড় সুন্দর, বড় প্রসন্ন।

উচ্ছ্বাসে কাটানোর মত অত সময় নেই। বিপুলের একটা হাত ধরে

টেনে টেনে অন্তু তাকে এধারের পাঁচিলের কাছে নিয়ে এল। দড়ির মই পেতে তার ওপর শুইয়ে দিল। অন্য দড়ি দিয়ে ভাল করে দেহটা বেঁধে ফেলল। আরো সুবিধে হল, ছাদে কয়েকটা বাঁশ পড়ে আছে। দুদিকে দুটো বাঁশের সঙ্গে দেহসুদ্ধ দড়ির মই শক্ত করে বাঁধল। অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করল, রেডি?

—ওদিকের জবাব, ওয়েট, গলির মুখে সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে।···ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অন্তু খেয়াল করে কান পাতল। পরপর বেশ কয়েক রাউণ্ড ফায়ারিংয়ের শব্দ কানে এল। তার বিশ্বাস, দলের লোক নির্দেশ পালন করেছে—সিপাই আর সার্জেণ্টদের ব্যস্ত রাখছে। সকলেরই মনোযোগ সেই দিকে।

ফায়ারিং চলেইছে। ও-ছাদ থেকে সঙ্গীর গলা শোনা গেল, নাও, কুইক!

দু-দিকের বাঁশসুদ্ধ মইয়ের দড়িতে শয়ান বিপুলের দেহ অন্তু বুকে তুলে ফেলল। দেওয়ালের ওপর রাখতেই বাঁশ দুটোর একদিক দু-হাত ফারাকের ও-বাড়ির ছাদের পাঁচিলের ওপর। দেহও ও-দেয়ালের সঙ্গীদের নাগালের মধ্যে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে বাঁশসুদ্ধ দেহ ও-দিকের ছাদে টেনে নামাল। কয়েক সেকেণ্ড বাদেই আবার সংকেত করতে অন্তুও লাফিয়ে ও-ছাদে।

পরেরটুকু অপেক্ষাকৃত সহজ আর সংক্ষিপ্ত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রিভলবার হাতে সঙ্গী নেমেছে, পিছনে অন্তুর কাঁধে বিপুলের রক্তাক্ত দেহ। বাড়ির লোকেরা কেউ টুঁ শব্দ করেনি। উত্তেজনায় নিশ্চল নির্বাক সকলে। তিনজন বেরিয়ে আসার মুখে বাড়ির বৃদ্ধটি এই দৃশ্য দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, ঈশ্বর, তুমি এই দেখনের লেইগা আমারে বাচাইয়া রাখছ—চোখে দৃষ্টি দিয়া থুইছ! যে গেছে—গেছে, ঈশ্বর তুমি দ্যাশের এই পোলাগ বাচাইয়া রাইখো, আর নির্মম হইও না!

অন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখল। মাথা নুইয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এল।

খিড়কির দরজা খুলে তারা বেরিয়ে এল। মেথরের গলি পেরিয়ে লাল্লুর গাড়িতে। মৃতদেহসুদ্ধ ওই তিনজনকে নিয়ে গাড়ি ছুটল। সাইকেলের ছেলেরা ইংলিশ রোডের সদর রাস্তার জনতার দিকে।

পথে আর কোনো বিঘ্ন হল না। চওড়া গলিতে ঢুকে লাল্লু কোচোয়ানের গাড়ি বসাক বাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকে সোজা একেবারে ব্যায়াম সমিতির আঙিনায়।

বিপুলের দেহ নামিয়ে শুইয়ে দেবার পরেও লাল্লু চলে যেতে রাজি নয়। সে খোকা মুনিবের সঙ্গে থাকবে, মরতে হয় মরবে। বিপদের যে এটা শেষ নয়, শুরু মাত্র, এ ও কেমন করে যেন বুঝেছে।

· ·অন্তর প্রায়-নির্মম কঠিন হুকুমে গাড়ি নিয়ে তাকে চলে যেতে হল। গাড়ি এখানে থাকলে তার বিপদ তো বটেই, এখানে যা ঘটার সম্ভাবনা তাতে সকলের অসুবিধেও হবে। পুলিস টের পাবার আগে আর জনতার ভিড় হবার আগেই তাকে চলে যেতে হবে। লাল্লু বুঝেছে এ হুকুমও অমান্য করার নয়। চোখ মুছতে মুছতে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

নতুন খাট এসেছে। অনেক ফুল এসেছে। বসাক মশাই বিপুলের দেহের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠছেন। থেকে থেকে স্বদেশী ছেলেদের মুণ্ডপাত করছেন, আবার পুলিসেরও সাত পুরুষকে নরকের দরজা দেখাচ্ছেন। বসাক-গিন্নি বুক চাপড়ে কাঁদছেন। আবার ছেলেদের কথামত হারানিধির অঙ্গ রাজবেশে সাজানোর জন্য দামী গরদের ধুতি নতুন গেঞ্জি আণ্ডারঅ্যায়ার মটকার পাঞ্জাবি বার করে দিয়েছেন।

মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যে লোক জমায়েত শুরু হল। ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে দলে দলে ছেলেরা আসছে। নানা বয়সের লোক আসছে। ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত বেরিয়ে আসছে।

বন্দেমাতরম্ নিনাদে আকাশ বাতাস মুখর। বিপুল বসাকের জয়ধ্বনিতে জনতা উত্তাল। তাদের নেতা অন্তু সেনের জয়ধ্বনিরও বিরাম নেই। মরণপণ করে শাসক সরকারের কবল থেকে শহীদের

মৃতদেহ ছিনিয়ে আনতে পারার মত জয়ের নজিব কোনো স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে আছে কিনা তাদের জানা নেই।

লোক আসছেই। আসছেই আসছেই আসছেই। বসাক বাড়ির এত বড় প্রাঙ্গণে আর জায়গা নেই। গলিতে লোক উপচে পড়ছে। তারপর প্রশস্ত গলির অর্ধেক জুড়ে কেবল মানুষের মাথা আর উত্তাল জয়ধ্বনি।

বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!

ইংরেজ, ভারত ছাড়ো! ভারত ছাড়ো! ছাড়ো ছাড়ো ভারত ছাড়ো!

বিপুল বসাক জিন্দাবাদ! বিপুল বসাক জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

অন্ত সেন, যুগ-যুগ জিও! যুগ-যুগ জিও! যুগ-যুগ জিও!

প্রোসেশন রেডি। কিন্তু এই উত্তাল জনতা নিয়ে বেরুনোর উপায় নেই। গলির ও-প্রান্তের মুখে আর রাস্তা জুড়ে পুলিসের ভ্যানের পর ভ্যান আর সশস্ত্র সোলজার। শতেকের ওপর সাদামুখ সার্জেন্ট। কিন্তু সামনের জনতা দেখে তাদেরও গলিতে ঢোকার সাহস নেই। ঢুকলেও রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।

গলির ওধার থেকে হঠাৎ মাইকের গনগনে গলা—অন্ত সেন! আমি অন্ত সেনকে ডাকছি! আমি থানার ও. সি. মতি রায় বলছি! অন্ত সেন, আপনি আমাকে চেনেন! আপনাকে কথা দিচ্ছি, এত বড় অপরাধের জন্যও এখন কাউকে আমরা অ্যারেস্ট করব না। আপনি বিপুল বসাকের বডি সারেণ্ডার করুন! আমরা বডি নিয়ে চলে যাব---আর কিছুই করব না! অন্ত সেন, আপনি এত বড় বিপদের ঝুঁকি নেবেন না—এত রক্ত-পাতের জন্য দায়ী হবেন না—বডি সারেণ্ডার করুন! আমি এই দেশেরই মানুষ, আপনাকে অনুরোধ করছি বডি সারেণ্ডার করুন!

বিশাল জনতার উত্তাল জবাব, বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! শহীদ বিপুল বসাক জিন্দাবাদ! অন্ত সেন যুগ-যুগ জিও!

মতি রায় এদিককার থানার জাঁদরেল ও. সি.। কড়া মানুষ, কড়া অফিসার। কিন্তু কথার খেলাপ করেন না বলে সুনাম আছে। তিনি

ঘামছেন। সাদা চামড়ার ওপরওয়ালারা তাঁকে আদেশ দিচ্ছে, নির্দেশ দিচ্ছে।

থেকে থেকে সেইমত মাইকে মতি রায়ের একই অনুরোধ, একই মিনতি।—অন্তু সেন, এই বিপদ ডেকে আনবেন না! শত শত মাকে সন্তানহারা করবেন না! কথা দিচ্ছি আমরা কোনো অ্যাকশন নেব না—কেবল ডেড-বডি নিয়ে যাব—অন্তু সেন, আমার কথা শুনুন, ডেড-বডি সারেণ্ডার করুন! আপনি পাগল হয়ে গিয়ে না থাকেন তো ডেড-বডি সারেণ্ডার করুন!

বন্দেমাতরম্! বিপুল বসাক জিন্দাবাদ! অন্তু সেন যুগ যুগ জিও! ইংরেজ আর ইংরেজের দালাল তফাত যাও—দূর হটো!

—অন্তু সেন, এই শেষবারের মত বলছি, এত বড় ঝুঁকি নেবেন না। এমন বিপদ ডেকে আনবেন না! বডি সারেণ্ডার করুন।

ভিড় ঠেলে ঠেলে ততক্ষণে অন্তু সেন গলিতে তার দলের সামনে এগিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে একজনের হাতে বড় টিনের চোঙ। জনতা স্থির হলে ওটাই লাউডস্পিকারের কাজ করে থাকে। তার নির্দেশমত সামনের সারির জনতা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, সকলে চুপ করুন! আমাদের নেতা অন্তু সেন জবাব দিচ্ছেন! ইংরেজ আর ইংরেজদের দালালরা অন্তু সেনের জবাব শোনো!

মুহূর্তের মধ্যে বিশাল জনতা স্তব্ধ।

গলির ও-মাথায় পুলিস বাহিনীও নিশ্চুপ।

চোঙটা মুখে লাগিয়ে গনগনে গলায় অন্তু সেন বলল, আমি অন্তু সেন বলছি! মতিবাবু শুনুন, শুনে আপনার মুরুব্বীদের জানিয়ে দিন, আমরা শহীদ বিপুল বসাকের বডি নিয়ে প্রোসেশন করে বেরুচ্ছি—আপনারা এগিয়ে আসুন—গুলি চালান—বিপুল বসাকের ডেড-বডির কাছে পৌঁছুতে হলে আপনাদের ছ হাজার মেয়ে-পুরুষকে হত্যা করতে হবে—আপনারা এগিয়ে আসুন—আমরা নিরস্ত্র!

সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি।

ওদিক থেকে খানিকক্ষণের জন্য সাড়াশব্দ নেই। এটাই যে অব্যর্থ

তুরুপের তাস, অন্ত সেন নিজেও জানত কিনা সন্দেহ। মৃত্যুপণে শত সহস্রকে এগিয়ে আসতে দেখলে ঘাতকের হাতও কাঁপে। অন্তও সেদিন কেঁপে উঠেছিল। বিদেশী শাসনের বনিয়াদ সেদিন কত বড় ধাক্কা খেয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তা লেখা নেই।

একটু বাদে ওদিক থেকে আবার মাইকে ও. সি. মতি রায়ের ঘোষণা শোনা গেল, অন্তবাবু, আপনি দু-তিনজনকে নিয়ে দল ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে আসুন—কোনো দিক থেকে কোনোরকম হামলা হবে না এই শর্তে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। আপনার মত জানান!

অন্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিল, পরপর প্রত্যেককে জানাও আমি কথা বলে না আসা পর্যন্ত সবাই যেন সংযত থাকে। সাদা জামা পরা একজনকে বলল, গায়ের জামাটা খুলে দে—

সেটা হাতে নিয়ে মাথার ওপর তুলে অন্ত বারকয়েক মাথা নেড়ে মত জানাল। অর্থাৎ আসুন, কথা হোক—

জামা ফেরত দিয়ে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সে গজখানেক এগিয়ে দাঁড়াল।

পিছনের জনতা স্তব্ধ।

খুব ধীরে একটা জিপ আসছে।

জিপ থেকে মতিবাবু নামলেন। সঙ্গে সশস্ত্র তিনজন দিশি পুলিস। জেল খাটার সুবাদেই অন্ত সেন তাঁর অতি পরিচিত।

এগিয়ে এলেন। মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কর্তামহলে একরোখা দাপটের অফিসার বলে সুনাম তাঁর। কপাল-মুখ ঘর্মাক্ত। সামনের জনসমুদ্রের দিকে তাকালেন একবার। তারপর অন্তর দিকে। দু চোখের কোণে যেন বাষ্প জমে আছে, চিকচিক করছে।

—অন্তবাবু, আপনার না হয় জীবনের মায়া নাই, এতগুলি নিরীহ বলির কারণ ওইবেন আপনে—অগো মরতে দিবেন?

অন্তর ঠাণ্ডা জবাব, দেইখা আপনের মনে ওইতাছে অ-গো জীবনের মায়া আমার থিকা বেশি?

চেয়ে রইলেন। বুঝলেন। বার দুই অল্প অল্প মাথাও নাড়লেন।—শুনেন, আমি গোলাম ওইলেও এই দ্যাশেরই মানুষ···কর্তারা রাজি

ওইবো ভাবি নাই, কিন্তু রাজি ওইছে···আপনেরা বডি লইয়া সাইলেন্স প্রোসেশন নিয়া যাইবেন, একটাও স্লোগান দিবেন না···পুলিস ভ্যান আপনেগো পিছনে থাকব, আমিও থাকুম, কোনো হামলা ওইবো না—রাজি ?

অন্তু সঙ্গী দুজনের দিকে তাকাল একবার। বলল, রাজি।

সে জানে, শবদেহ নিয়ে এই বিশাল জনতার নির্বাক প্রোসেশন মৌন শ্মশানযাত্রার মানসিক সংঘাত লোকের মনে ঢের বেশি ছাড়া কম হবে না। পথের দু ধারের মানুষ দেখবে, দু ধারের সমস্ত বাড়ির মেয়ে-পুরুষেরা একতলা বা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। একটি অকালমৃত্যুর জয় দেখবে সকলে। জয়জয়কার দেখবে।

মতি রায় সশস্ত্র প্রহরীদের নিয়ে জিপে উঠলেন। জিপ ঘোরানো যেত। সোজা ব্যাক গিয়ার করে গলির ও-মাথায় চলে গেল।

সকলকে বোঝাতে আর প্রস্তুত করতে আধঘণ্টাখানেক লেগেছে। তারপর শবদেহ নিয়ে বিশাল মৌন মিছিল পথে নেমেছে।

মৌন মিছিল কি ? না আকাশছোঁয়া মৌনমুখর ?

···একটি মৃতদেহের দখল নেওয়া নিয়ে সেদিন পরদেশী রাজশক্তির সঙ্গে কাড়াকাড়ি '

আজ স্বাধীন দেশের মাটিতে দলাদলির বলি আর একটি মৃতদেহের ওপর দখলদারি নিয়ে দুই উন্মাদ তরুণ পশুশক্তির কাড়াকাড়ি।

কত কত কত তফাত।

একে একে স্বাধীনতাব তিন যুগ গত। প্রৌঢ় অন্তু সেন এই স্বাধীনতার হিসেব মেলাতে পারেননি। ভারতমাতার গলায় আজও কেবল তিনি জবার বদলে মুণ্ডমালাই দেখে যাচ্ছেন। শত শত। হাজার হাজার। লক্ষ লক্ষ।

বীভৎস!

চোখের ওপর সেই মুণ্ডমালায় আজ আর একটি মাথা যুক্ত হতে

দেখলেন।

দিন যায়। যাত্রার দিন এগিয়ে আসছে। অন্ত সেন স্তব্ধ। নির্লিপ্ত।

স্ত্রী মমতা উদ্বিগ্ন। মেয়ে-জামাই উদ্‌গ্রীব।

…অন্ত সেনের রাতের ঘুম গেছে। বিনিদ্র চোখের সামনে মুখের মিছিল। বিপুল বসাকের মুখ। সাধিকা মায়ের মুখ। বিপ্লবী গুরু নরেন মহারাজের মুখ। রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি, পুলিনবিহারী দাস, কেদারেশ্বর সেন, ত্রৈলোক্য মহারাজ, চারু রায়, দুর্গেশ ভট্টাচার্যর মুখ। লাল্লু কোচোয়ানের মুখ। ফুলি বিবির মুখ। জেলের আরো শত শত তরুণ বিপ্লবীর মুখ।

এরা কেন আসে? এদের মৌন মুখের ভাষা আজকের অন্ত সেন বুঝতে পারেন না কেন?

যাত্রার যখন আর তিন দিন মাত্র বাকি, মমতা সেন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। পিছনে মেয়ে-জামাই, আগে তিনি।—কি হল?

অন্ত সেন ফিরে জিগ্যেস করলেন, কি?

—আমরা যাব না?

অন্ত সেন আবারও ফিরে জিগ্যেস করলেন, কোথায় যাব? গলার স্বর জলদগম্ভীর।

মমতা সেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। মেয়ে-জামাইও।

ফয়সালা শেষ। অন্ত সেনের কথাগুলো এবারে একটু নির্লিপ্ত গোছের হালকা।—পরাধীনতার শেকলটাই শুধু ভেঙেছে।…কিন্তু সেদিনের থেকেও দেশ আজ ঢের বেশি বিপন্ন। থেকে কি করতে পারব জানি না. আর সেই ক্ষমতাও নেই। তবু দেখি…

খুশি হবার বদলে এই মুখের দিকে চেয়ে মমতা সেনের মুখে অজানা শঙ্কার ছায়া।

মেয়ে-জামাইয়ের মুখেও।

কাল যমুনার বিয়ে

কাহিনীর এই নামের ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে আজকের কোনো বয়স্ক পাঠকের স্মৃতির তারে কি টান পড়ল ? নামটার কারিগর এই লেখক নয়। এমন কি যে প্রাচীন কবি, 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে, যমুনা যাবে শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে' ইত্যাদির রসের ভিয়েনে ছেলে-বুড়োর কাছে যমুনা নামে কোনো এক গ্রাম্য মেয়েকে অক্ষয় যৌবনের পরমায়ু দিয়ে গেছেন—কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে এই শিরোনামের দাবিদার তাঁকেও বলা চলে না।

এই যমুনা কোনো কবির কল্পনা নয়। রক্তমাংসের একটি মেয়ে। খবরের কাগজের প্রথম পাতার ওই শিরোনামে পাঠকের কাছে কাল এই যমুনার বিয়ে ঘোষণা করেছেন একজন সাংবাদিক। তাঁব প্রয়োগপটুতায় প্রাচীন কবিব মহিমা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু এই প্রয়োগকুশলতা সাংবাদিকটির নিজস্ব সৃষ্টি, এ কেউ অস্বীকার করবেন না। সেদিন খববেব কাগজের ওই শিরোনাম এই লেখকেব নজব কেড়েছিল। আব আজ লিখতে বসেও ওই সাংবাদিককেই এই কাহিনীর নামের কারিগর বলতে দ্বিধা নেই।

কাল যমুনার বিয়ে। বছব কুড়ি আগে বড় হবপেব এই শিরোনামে খবরটা ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায়। লিখতে বসে এই কারণেই মনে হয়েছিল পাঠকের স্মৃতির তারে টান পড়ল কিনা। বিশ বছর আগের ওই খববের দিন-তারিখও লেখকের নোটবইয়ে নোট করা আছে। কিন্তু খবর নয়, বিশ বছর বাদে লেখক আজ পাঠকেব কাছে উপস্থিত একটি কাহিনী নিয়ে। তাই ক্যালেণ্ডারের খবরদারি নিষ্প্রয়োজন।



…বিশ বছর আগের ওই শিবোনামের খবরটি এক দিক থেকে করুণ। আর এক দিক থেকে তেমনিই রসালো। কোনো নাড়ি-ছেঁড়া করুণ

রাগিণীদরদী শিল্পীর বিস্তারে রূপে রসে ফুলে ফলে ভরে ওঠার সম্ভাবনার দিকে গড়ালে যেমন হয় অনেকটা তেমনি। খবরে নাড়ি-ছেঁড়া করুণ রাগিণী মূর্তি যার, তার নাম যমুনা—যমুনা বিশ্বাস। এম. এ বি. টি, মফঃস্বলের মেয়ে-স্কুলের টিচার। বয়েস সেই পঁয়ষট্টি সালে চৌতিরিশ। উনিশ থেকে চৌতিরিশ—টানা পনেরো বছরের অনিশ্চয়তায় বুক-দুমড়নো যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে প্রতীক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ। তারও পাঁচ বছর আগে থেকে অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে কিছুটা জ্ঞাতসারে আর অনেকটা অজ্ঞাতসারে কিশোরী হৃদয়ে ভালবাসার অমোঘ বীজ নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল। উনিশে তার পেলব শাখা-প্রশাখা অনেকটাই পল্লবিত। কুমারীর অক্ষত যৌবন আগলে রাখার তাড়না আবার একই সঙ্গে বাঞ্ছিত লগ্নে বিক্ষত হবার গোপন প্রত্যাশা। সেই বাঞ্ছিত লগ্ন না আসা পর্যন্ত এক অশান্ত দুরন্তকে নাগালের বাইরে ঠেলে সরানোর দায়, আবার বুকের তলায় দু'হাত বাড়িয়ে তাকেই অভ্যর্থনার শিকলে বাঁধার লালায়িত প্রতীক্ষা।···এমন দিনে, উনিশ বছরের কুমারী জীবনে এক কল্পনান্তক ঝড়।···সেই ঝড়ে ভালবাসার বনস্পতি তার সমস্ত শিকড় উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সব আশা ধূলিসাৎ। সব প্রত্যাশা হতাশার মরুভূমিতে নিশ্চিহ্ন। উনিশ বছরের অতি নিম্ন মধ্যবর্তী ঘরের মেয়ে—যমুনা বিশ্বাসের চোখের সামনে কেবল সর্বগ্রাসী অন্ধকার।

···বুকের দিক থেকে হৃদয়ের দিক থেকে যাকে সর্বস্ব দিয়ে বসে আছে, হঠাৎই দেখা গেল বিশ্বসংসারের চোখে সে এক নির্মম নিষ্ঠুর অমানুষ। মানুষের চোখে সমাজের চোখে আইনের চোখে সে এক ঘৃণ্য কদর্য পশু। আইনের শিকল তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অজানা অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছে। এর থেকে কঠিন শাস্তি হলেও কারো চোখে বেদনার বাষ্পের ছিটেফোঁটাও দেখা যেত না। বরং সেটাই উচিত শাস্তি মনে হত।···এমন কি যমুনা বিশ্বাসও সেদিন ওই শাস্তি অন্যায় বা অনুচিত ভাবতে পারেনি। সমাজের দিকে চেয়ে, ন্যায়-নীতির দিকে চেয়ে এমন ভাবার সাহসও তার ছিল না।

…কিন্তু আইনের সমুচিত নির্মম দণ্ড ঘোষণার পরে, আর লোকটাকে ওরা অন্ধকারের জগতে টেনে নিয়ে যাবার পরে সেদিন শুধু একটি মেয়ের বুকের তলাতেই ভিন্ন প্রশ্ন উঠেছিল। ঘাতকের হৃদয়েও কি স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা ঠাঁই পেতে পারে না? আইন যদি ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়ে তার অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিত তাহলে সেটা ভিন্ন কথা হত। কিন্তু আইন তাকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে।…তার মানে অনুশোচনার অধিকার দিয়েছে, অনুতাপে দগ্ধ হবার অধিকার দিয়েছে, সমস্ত জীবন ধরে তিল-তিল করে পাপের দাগ মুছে ফেলতে চেষ্টা করার অধিকার দিয়েছে। একদিন দু'দিন নয়, এক বছর দু'বছরে নয়, ছেলেবেলা থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত যমুনা নামে মেয়েটা ওই দুরন্ত বেপরোয়া মানুষের বুকের তলায় দরদের বুনট দেখেছে, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসায় ছোট বড় ঢেউ দেখেছে।…আবার পাপের এই দানব-মূর্তিও তারই। যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ভয়ংকর। আইন এই দানবের গলাতেই তার অব্যর্থ শিকল পরিয়েছে। কিন্তু পরিয়েও তাকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে।…অনুতাপে অনুশোচনার আগুনে জ্বলে জ্বলে ওই দানব যদি নিজেকে ক্ষয় করে দিতে পারে লয় করে দিতে পারে ছাই করে দিতে পারে, তাহলে অবশিষ্ট যে পড়ে থাকে সে কি আবার সেই দরদ আর স্নেহ-প্রেম-ভালবাসায় ভরা রক্তমাংসের নিটোল এক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না? নিশ্চয় পারে। না পারলে লৌহ-কপাটের আড়ালে পরমায়ুর ছাড়পত্র দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো অর্থই হয় না।

…বিচারকের রায় ঘোষণার দিন থেকেই যমুনা বিশ্বাস নামে উনিশ বছরের এক মেয়ে সজাগ তৎপর। এই চেতনা আর বিশ্বাস নিয়ে তার দিন কেটেছে কাল কেটেছে।

একে একে পনেরোটা বছর কেটেছে। তারপর এই চেতনা আর বিশ্বাসের মূলধন সম্বল করেই চৌতিরিশ বছর বয়সের মফঃস্বল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, যমুনা বিশ্বাস এম. এ. বি. টি বিচার পুনর্বিবেচনার সকরুণ দাবি নিয়ে আবার মানুষের দরবারে এসেছে। এটা আইনেরই এক সম্মত অধিকার। কিন্তু এই অধিকারের জোরটুকুই তার আসল জোর নয়।

কারণ একটা কলমের খোঁচায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অধিকারের দাবি নাকচ হয়ে যায়। যমুনা বিশ্বাস অধিকারের বলে দাবি পেশ করতে আসেনি। সে এবারে কেবল মানবিক বিবেচনার আবেদন নিয়ে এসেছে।

তার এই নাড়িছেঁড়া বেদনার করুণ রাগিণী যে দরদী শিল্পীদের বিস্তারে রূপে রসে ফুলে ফলে ভরে ওঠার সম্ভাবনার দিকে এগিয়েছে তাঁরা এই রাজ্যের শাসনযন্ত্রের কর্ণধার—জুডিসিয়াল সেক্রেটারি, জয়েণ্ট সেক্রেটারি, হৃদয়বান আইনমন্ত্রী ঈশ্বরদাস জালান, আর সবার উপরে রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু। এই মানবিক আবেদনে সাড়া দেবার জন্য তাঁরা আনন্দবাজার পত্রিকা এবং তার পাঠকদের কাছ থেকেও আন্তরিক ধন্যবাদ পেয়েছেন। কিন্তু চতুর সাংবাদিক রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু ছাড়ের পরোয়ানায় সই করার পরেই খবরটি পরিবেশন করেননি। দক্ষ সাংবাদিকের মতোই তিনি ঘোষণার নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করেছেন।

তারপর···

কাল যমুনার বিয়ে।

অভ্যাস মতো লেখক হেড-লাইনসুদ্ধ খবরটা তার নোটবইয়ে নোট করে রাখছিল। পাঠকের স্মৃতির পরমায়ু সাধারণত খুব বেশি নয়। এক দিনের রোমহর্ষক বা স্মরণীয় খবরও ক'দিন না যেতে পুরনো হয়ে গিয়ে বিস্মরণের আড়ালে পড়ে থাকে। কিন্তু নোট করে রাখলে আর মাঝে-সাজে তা ওলটালে অনেক ভুলে যাওয়া পুরনো খবর তাজা হয়ে ফিরে আসে, লেখার রসদ যোগায়। যাক, কাল যমুনার বিয়ে নোট করে রাখার সময় পাশে দাঁড়িয়ে যিনি হাসছিলেন কর্মক্ষেত্রে তিনি মুখার্জী সাহেব নামে সুপরিচিত এবং এই লেখকেরও আত্মজন। তাঁকে হাসতে দেখে নোট করতে করতে লেখকও হাসছিল। বলেছিল, তুই হাসছিস কেন বলব?

—কেন?

—পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী—ঠিক না?

আবারও হাসিই ওর হাসির জবাব।

লেখক জানে, রাজ্যের শাসনযন্ত্রের কর্ণধার জুডিসিয়াল সেক্রেটারি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি মন্ত্রী বা মহামাননীয়া রাজ্যপাল নয়, যমুনাকে কাল বিয়ের আসনে বসানোর নেপথ্য নিয়ামক যদি কেউ থেকে থাকেন তো তিনি এই মুখার্জী সাহেব। দূরের ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে তিনিও অনেক বড় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেদিনের ওই কর্ণধারদের তুলনায় তিনি অনেক নিচের সারির একজন। ডেপুটি সেক্রেটাবি, জুডিসিয়াল। কাল যমুনার বিয়ের নাটকে তিনিই সকলের অগোচরেব দক্ষ এবং সফল প্রম্পটার।

সন্ধিৎসু প্রশ্ন, কিন্তু তুমি যত্ন করে এ-সব নোট করছ কেন—এখানে যে রিপোর্ট ছাপা হয়েছে তার থেকে তো ঢের বেশিই জানো।

লেখক ঢের বেশি জানে ঠিকই। এত জানার মূলে এই মুখার্জি সাহেব। আলোশূন্য বাতাসশূন্য অন্ধকারের এই কাহিনী গত দু'আড়াই মাসের চেষ্টায় কেমন করে ধাপে ধাপে আলোর মোহনার দিকে গড়ালো তার হদিস খবরের কাগজে রিপোর্ট নেই। জুডিসিয়াল সেক্রেটারি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি, মন্ত্রী বা রাজ্যপালের সহানুভূতি হাত বাড়ালেও মেলে না। সাধারণের পক্ষে তাঁদের ছায়ার নাগাল পাওয়াও সহজ নয়। সেটা সম্ভব হয়েছে কি কবে তার আদ্যোপান্ত কেবল মুখার্জী সাহেব জানেন আর সেই সুবাদে লেখক জানে। শুধু তাই নয়, একটানা পনের বছর ধরে অন্ধকারের সমুদ্র সাঁতরে আজ আলোর তটে এসে দাঁড়িয়েছে রূপসী বাংলার যে গ্রামের মেয়েটি, খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে তার শ্রান্ত ক্লান্ত বিজয়িনী মূর্তিটি পাঠকের পক্ষে আঁচ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের গাড়িতে মুখার্জী সাহেবের পাশে বসে লেখক তাকে মুখোমুখি দু'হাতের মধ্যে দেখেছে। শুধু তাকেই নয়, লৌহ-কপাটের দরজা খুলিয়ে পনেরো বছর বাদে যে লোকটিকে সে উদ্ধার করে নিয়ে এলো—তাকেও। এদেব সঙ্গে মন-খোলা কথাবার্তাও হয়েছে। নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর তাকে নিয়ে যমুনা বিশ্বাস অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল। সঙ্গের উনচল্লিশ বছরের নম্র বিনয়ী মানুষটাকে দেখে তার চব্বিশ বছর বয়সের সেই ত্রাসের কালোমূর্তি কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু মন ভোলে না, সে

বলে দেয় এরই মধ্যে সেই ভীষণ মূর্তি ছিল। তাই কেবল ভাবতে ভালো লাগে পনেরো বছরের তাপে আর তপে সেটা মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

…কিন্তু চৌতিরিশ বছরের যমুনা বিশ্বাসকে দেখে রূপসী বাংলার মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল লেখকের। এই রূপ দেহের নয়, মনের—হৃদয়ের। দোহারা চেহারা, বেশ লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বলা যেতে পারে। না কালো না ফর্সা। পনের বছরের অকরুণ ঝড়-ঝাপটার সঙ্গে যুঝে যুঝে মুখখানা শ্রান্ত, কিন্তু শেষের এই জয়ের গৌরবে ভারী স্নিগ্ধও। এক কথায় যমুনা বিশ্বাস রূপসী নয়, কিন্তু লেখকের মনে হয়েছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটাই সে রূপসী বাংলার মেয়ে।

…কাগজে যেটুকু বেরিয়েছে লেখক তার ঢের বেশি জানে বইকি। এমন কি যমুনার কাল বিয়ে এ-ও ওই সাংবাদিকের ঢের আগেই জানে। কারণ খুশি গোপন করার দায়ে মাথা নিচু করে যমুনা মুখার্জি সাহেবকে বলেছিল, ওমুক দিন আমাদের বিয়ে, আপনাকে যেতে হবে…উপস্থিত থাকতে হবে।

মুখার্জী সাহেব হেসে জবাব দিয়েছেন, আমার প্রম্পটারের কাজ শেষ, এইখানে আমাকে মাপ করতে হবে—তোমাদের তীরে পৌঁছে দিয়ে আমি আর হাতে-নাতে ধরা পড়তে রাজি নই…আমার কথা বুঝতে পারছ?

ঠাণ্ডা দু' চোখ তাঁর মুখের ওপর তুলে ধরেছিল। সামান্য মাথা নেড়েছিল বুঝতে পারছে। লেখকের মনে হয়েছিল ওই দুই চোখের গভীরে রূপসী বাংলার কালো দীঘির জল টলটল করছে।

এত জানার পরেও খবরের কাগজের এই রিপোর্ট নোট করতে দেখে মুখার্জী সাহেব অবাক হতেই পারেন আর এ-প্রশ্নও করতে পারেন। লেখকের জবাব, রিপোর্টটা মানুষের মন ছোঁবার মতো আবেগ দিয়ে লেখা, দু'দশ বছর পরেও এ পড়লে ভিতরের আসল নাটকটা ঠিক ঠিক মনে পড়বে, নইলে অনেক কিছুই হয়তো ভুল পড়ে যাবে। মনের ওপর আজকের দাগ কাল টাটকা থাকে না, এ তো কবে লেখা হবে ঠিক নেই—তুই তো এখন লিখতে বারণ করলি।

সরকারী দপ্তরে এই কেসের ফাইল ওই প্রাথমিকা কর্মকর্তার টেবিলে

আসার পর থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত সমস্ত বিবরণ লেখকেব চোখের সামনে। তাই নিষ্পত্তির পরেই তুটি জীবনের ছবি কাহিনীর আকারে তুলে ধরার আগ্রহও স্বাভাবিক। কিন্তু মুখার্জী সাহেব তখনো সুবিবেচকের মতোই আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, এখন না, তু'পাঁচ বছর যাক—

—কেন?

—প্রথম কারণ, একজন সরকারী অফিসার, দরদের আবেগে আড়াল থেকে এ-ভাবে কলকাঠি নেড়েছি এটা এরই মধ্যে সরকারি মহলে ফাঁস হওয়া কাম্য নয়।...যে কারণে, এত আগ্রহ সত্ত্বেও আমি ওদের বিয়েতে গেলাম না বা যেতে পারলাম না।...যা করেছি তার সবটাই ন্যায়ের পথ ধরে, আর বিয়েতে গেলেও সেটা দোষের কিছুই হত না।..মাথার ওপবে এতজন ওপর-অলা থাকতে ন্যায়ের দণ্ড ধরে এ-ভাবে সামনের সারিতে এগিয়ে আসা কোনো সরকারী অফিসারের রীতি নয়। এতে তার ওপর-অলাদের মহানুভবতার জলুসে টান ধরে। নিজেদের কর্তব্য-বোধের ওপর অদৃশ্য আঁচড়ও পড়ে। তাছাড়া চেনা নেই জানা নেই শোনা নেই একটা মেয়ের জন্য কোনো সরকারী অফিসারের এত দরদ আর সহানুভূতিই বা কতজনে সাদা চোখে দেখে? রোসো না কিছুদিন, আমি তো এখানে এই পোস্টেই আর বরাবর পড়ে থাকছি না।

একটু বাদে আবার হেসে বলেছেন, এ ছাড়াও তোমাকে এক্ষুনি না লিখতে বলার আরো বড় কারণ আছে।

—আর কি কারণ?

—তুমি যমুনা বিশ্বাসের জীবনে অঘটনের শুরু থেকে শেষ সবটাই জানো ধরে নিলাম—কিন্তু তার আগের কতটুকু জানো? আর যে-মানুষকে ঘিরে এমন ঘটনা আর এত বড় অঘটন—তারই বা তখনকার বুকের তলার খবর তুমি ঠিক ঠিক কতটা রাখো?

লেখকের কাছে এটা কোনো সমস্যাই নয়। তার জবাব, ওদের মুখ থেকে যেটুকু আভাস তুই পেয়েছিস আর নিজেব চেষ্টায় আমি যেটুকু সংগ্রহ করেছি তাই থেকে চব্বিশ আর উনিশ বছরের তুটি ছেলেমেয়ের জীবনের ছবি কল্পনা করতে অসুবিধে কি—যে কোনো লেখকের কাছে

এ তো জল-ভাত ব্যাপার। আমি তো জীবনী লিখতে যাচ্ছি না, ওদে দিন-পঞ্জী নিয়ে বসার আমার কি দরকার?

—এইখানেই আমার আপত্তি। চরিত্র দুটি কাল্পনিক হলে তুমি যত খুশি কল্পনার ডানায় ভর করো আমার বলার কিছু নেই। সত্যের ভিত্তি ওপর দাঁড়িয়ে তুমি অনেক সম্ভাবনার সেতু ভাঙবে গড়বে পার হবে— আর সেটাই তোমার পাঠকদের কাছে ভারী বাস্তব হয়ে উঠবে। এমনিতেই এখন বহু লোকের কৌতূহল আর বিচারের চোখ ওদের ওপর পড়তে বাধ্য···আমার তো ধারণা দু'জনেই ওরা এখন যতটা পারে লোকচক্ষু আড়ালে সরে থাকতেই চাইবে। সঙ্গতি থাকলে ওরা হয়তো কৌতূহলে ছায়া পড়বে না এমন কোনো জগতে পাড়ি দিত। তার মধ্যে তোমার এই কাহিনী—যার মূল সত্য অথচ অনেক শাখা-প্রশাখাই কল্পনার—ত ওদের আবার নতুন করে লোকচক্ষুর বিচারের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানোর মতোই বড় হয়ে উঠবে না? লেখকের অতিসুন্দর আর স্বাভাবিক কল্পনা বলেও তারা কি কিছু মেনে নিতে রাজি হবে? উল্টে ভাববে, এই নায়ক-নায়িকাই নিজেদের বড় করার জন্য লেখককে এই ভাঁওতার রসদ যুগিয়েছে। ভিতটা সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে বলেই তোমার কল্পনার খুঁটি নাটিও ওদের চেনা-জানা সকলের যাচাইয়ের বিষয় হয়ে উঠবে। তা থেকে যাক না কিছুকাল—কাল তো সকলের সেরা কষ্টিপাথর জানোই— ঘষা-মোছা হয়ে কি থাকে আর কি যায় দেখো না—কাঁচা আর তাজা ঘটনার ওপর সাহিত্যের রূপ ফলাতে না যাওয়াই ভালো।

যুক্তি অকাট্য বটে। লেখক নোটবই তুলে রেখেছিল। সেই নোট বই কবে ভরাট হয়েছে, বদল হয়েছে মনেও নেই। এই বিশ বছরে হয়তো আরো পাঁচ-সাতটা অমন ঢাউস নোটবই ভরাট হয়ে কোথায় পড়ে আছে মনেও থাকে না। মনে পড়লে বা দরকার পড়লে খোঁজ পড়ে। পেলে খুশি। না পেলে বিরক্তি। তারপর আবার ভুল।

···অনেক বছর বাদে এবারে এত বড় বাড়িটার আমূল সংস্কারে হাত পড়েছে। কোথায় কোন্ খুপড়ি থেকে বেরুলো একটা ঝরঝরে পুরনো নোটবই। অনেক পাতা উইয়ে কেটে দিয়েছে। স্বভাবতই খোঁজ পড়ল

এটা লেখকের কোনো দরকারী জিনিস কি না।

দরকারী জিনিস যতো না তার থেকে বেশি দরদের জিনিস। কিন্তু নিজের স্বভাব-দোষে কত দরদের জিনিস কোথায় হারিয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তারও কি হিসেব আছে? সেটা আরো এক দফা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে লেখক পাতা ওলটাতে বসল। বিশ বছরে অনেক পাতা জীর্ণ অনেক লেখা বিবর্ণ, আবার অনেক পাতা তো উইয়ে খেয়েই দিয়েছে। বিরক্তমুখে পাতা ওলটাতে ওলটাতে লেখকের দু'চক্ষু স্থির। চোখের সামনে বড় বড় হরপের একটা শিরোনাম, তার নিচে নোট।

কাল যমুনার বিয়ে।

লেখক অভিভূতের মতো লেখাটার দিকে চেয়ে বসে রইলো খানিক। এরই মধ্যে বিশটা বছর পিছনে সরে গেছে! গঙ্গার ওপর দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে বটে, গঙ্গার বুকে শুকনো টান ধরেছে পর্যন্ত···তবু এই সে-দিনের সঙ্গে আজকের বিশটা বছরের ফারাক!

নোটবইটা হাতে করে লেখক দুড়দাড় পায়ে তিনতলায় উঠে এলো। সোজা মুখার্জী সাহেবের ঘরে। নোটবইটা তাঁর সামনে ধরে বলল, দ্যাখ—!

কি দেখতে হবে তাঁর বোঝবার কথা নয়। ওটার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, কি দেখব?

কাল যমুনার বিয়ে।

কর্মক্ষেত্রের শিখরে ওঠার পর তাঁরও এখন পরিপূর্ণ অবকাশের জীবন। কিন্তু ছেলেমানুষের মতোই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। নোটবইটা সাগ্রহে হাতে নিলেন। দেখলেন। পড়লেনও একটু। তারপর হাসিমুখে সেটা ফেরত দিয়ে বললেন, ঠিক সময়েই এটা তোমার হাতে এসেছে। সত্যের মূল ধরে এবার তুমি যেমন খুশি সাহিত্যের রূপ ফলাতে পারো—কারো কাছে আর কারো কোনো কৈফিয়ত দেবার দায় থাকছে না—বিশ বছরে সকলের সব রাইট অব ইনকুইজিশন ডেট-বারড হয়ে গেছে।

···লেখকের এটুকুই ভরসা। সাহিত্য ডেট-বারড হয় না।

সেটা উনিশশ' চুয়াল্লিশ সাল। কতই বা বয়স যমুনার তখন? গায়ে গতরে বড়সড় হলেও বয়েস তো মাত্র তেরো। সোনাপিসির ক্যাটক্যাটানি শুনে শুনে বাবার কান ঝালাপালা, তাই আরো বছরখানেক আগেই ফ্রক ছেড়ে যমুনাকে শাড়ি ধরতে হয়েছে। আর তার পর থেকেই লোকের চোখে ওর বয়েসটা যেন ধাঁ ধাঁ করে আরো বেড়ে যাচ্ছে। অথচ ওদের ক্লাসের আর একটি মেয়েও শাড়ি পরে না। তিন-চার ক্লাস ওপরে পড়ে এমন কত মেয়ে এখনো দিব্বি ফ্রক চালিয়ে যাচ্ছে। ওই কেবল শাড়ি ধরে সকলের চোখে ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে পড়েছে। বাবা বিরক্ত হলে বলে, দিনকে দিন ধিঙ্গি হচ্ছিস, বুদ্ধি-বিবেচনা আর কবে হবে। সোনাপিসি তো ধিঙ্গি ধিঙ্গি করে দিন-রাত ফিঙ্গি নাচ নেচে চলেছে। নিজের পিসি নয়, অনেক ডাল-পালা জুড়লে তবে সম্পর্ক বেরোয়, কিন্তু নিজের পিসির চারগুণ দরদ কেবল জিভে ভর করে আছে। এরই মধ্যে বাবার মাথায় মেয়ের বিয়ের ভাবনা ঢুকিয়েছে—এখন থেকে ছেলে দেখতে থাকো, মেয়েদের বয়স এ-বেলা ও-বেলা বাড়ে। আড়াল থেকে যমুনা চোখ-মুখ বিকৃত করে জিভ ভেঙচায়—সামনা-সামনি তো ও সকলের চোখেই শান্ত মেয়ে। ওই সোনাপিসি চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, সোয়ামীর ভিটেয় ঠাঁই হয়নি—যমুনার জন্মের আগে থেকেই সে এখানে বাবার আশ্রয়ে। তার আগে কত সংসার থেকে ধাক্কা খেয়ে এসেছে কে জানে। এখন সে মেয়েদের সম্পর্কে একেবারে সব-জান্তা। উপদেশের ঝুলি কাঁধে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে।

···স্কুলের টিচাররা ধিঙ্গি শব্দটা মুখে বলে না, কিন্তু হাব-ভাবে সর্বদাই বলে। শাড়ি পরার পর থেকে এ-রকম বলাটা আরো বেড়েছে। কত মেয়ে অসভ্যতা করেও রেহাই পেয়ে যায়, কিন্তু ক্লাসে যমুনাকে কারো সঙ্গে একটা কথা বলতে দেখলে টিচারদের কানে-চোখে হুল ফোটে। ওমনি ঠেস দিয়ে বলবে, অতবড় মেয়ে, ছোটদের সঙ্গে পড়ছ—কোথায় ওদের শেখাবে, না নিজেই ক্লাসে বসে কথা কইছো? ইংরেজি বাংলা ইতিহাস

ভূগোল সবেতেই ও ক্লাসের সেরা ছাত্রী, কিন্তু অঙ্কে বিচ্ছিরি রকমের কাঁচা। ফলে অঙ্কের দিদিমণির ক্লাসে ও-ই প্রধান শিকার। এমন করে যে জানা অঙ্ক ভুল হয়ে যায়। ওই টিচার তখন সাপের মতো ছুবলোতে থাকে ওকে।—ছোট ছোট মেয়েরা টপাটপ কষে ফেলছে, আর তুমি পারো না, লজ্জা করে না? কোনো মেয়েকে বলে, ওর মাথায় টোকা দিয়ে ছাখো তো মগজ বলে কিছু আছে কিনা। অঙ্কের ক্লাসে প্রায় দিনই ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। টিচারের তাতেও রাগ পড়ে না, হুমকি দেয়, এর পর বেঞ্চের ওপর দাঁড় করাবো, দেখতে বেশ হবে। এক-একদিন আবার বাচ্চা দেখতে কোনো মেয়েকে হুকুম করে, তোমাদের ওই বড়দির খাতায় অঙ্কটা কষে দিয়ে দেখিয়ে এসো কোথায় ভুল হল।

যমুনার ভিতরে ভিতরে কান্না পায়, কিন্তু চোখে জল কখনো আসতে দেয় না। ··তেরো বছর বয়সে ও মাত্র ক্লাস ফাইভে পড়ছে, হিসেব করে দেখেছে ঠিক ঠিক পাস করে ম্যাট্রিক পাস করতে আঠারো গড়িয়ে উনিশে পড়বে। বেশির ভাগ ছেলে পনেরো ষোলো খুব বেশি হলে সতেরোয় ম্যাট্রিক পাস করে। কিন্তু মেয়েরা তো আকছার উনিশে ম্যাট্রিক দিচ্ছে। এই ক্লাসেই তেরো বছরের মেয়ে কম করে আট-ন'জন আছে। কিন্তু দেখতে ছোট বলে তাদের বয়েসটাও দিদিমণির চোখে ছোট হয়ে যায়।

···সোনাপিসি বা স্কুল-টিচারদের উপদ্রব অত্যাচার যমুনা মুখ বুজেই সহ্য করে। এই বয়সেই নিজের মধ্যে ও একটা প্রতিরোধের বেড়া লাগিয়ে বসে আছে। এই বয়সে কেন, বলতে গেলে আরো বছর আড়াই আগে থেকেই। দাদা চিরকালের মতো ওকে ছেড়ে যাবার পর থেকেই। তখন থেকেই কেমন করে বুঝে নিয়েছিল অনেক ঝড়জল অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ওকে বেঁচে থাকতে হবে, নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। ···মা কেমন ছিল কি ছিল যমুনা জানেই না। বাবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো মায়ের বিবর্ণ একটা ফোটো টাঙানো আছে। যমুনা জানে ওই তার মা। তার বেশি আর কিছু জানে না। সোনাপিসির মুখে শুনেছে ওর দেড় বছর বয়সে মা হরি ঠাকুরের কাছে চলে চলে গেছে। হরি

ঠাকুরের কাছে যাওয়া কাকে বলে একটু বড় হয়ে বুঝেছে। আরো বড় হয়ে ওই নিষ্প্রভ ফোটোর মধ্যে খুব সাদামাটা এক মেয়ের অস্তিত্ব জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করছে। পারেনি। ওই ফোটো দেখে কোনো উৎসাহ বা উদ্দীপনার খোরাক মেলেনি, ভাবের খোরাকও না। কেবল মনে হয়েছে মা বলে একজন ছিল, সে আর নেই। নেই বলে কোনো খেদও ছিল না। যমুনার জগৎ জুড়ে বসেছিল শুধু একজন। দাদা। সে-ই মা। বাবা থাকতেও সে-ই বাবা। সে-ই ভাই বোন বন্ধু—সব। যমুনার চিন্তার রাজ্যের সবটাই জুড়ে ছিল দাদা।

···সেই দাদাও হঠাৎ নেই।

তারপর থেকে, বলতে গেলে এই দু' বছর ধরেই নিজের অজ্ঞাতে নিজের চারধারে যমুনা একটা প্রতিরোধের দেয়াল তুলে চলেছে। শামুকের মতো একটা খোল শক্ত-পোক্ত মজবুত করে তুলেছে। অবাঞ্ছিত কিছু ঘটতে চলেছে মনে হলেই প্রতিরোধের সেই চার দেয়ালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, খোলের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।

কিন্তু এক-এক সময় এই প্রতিরোধের বেড়া ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ভেঙে তছনছ করে, খোলটা নির্দয়ভাবে ভেঙে ভেঙে চুর চুর করে দিতে চায়—দেয়ও—কেবল একজন। যমুনার তখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ওই পানুদা।

···দা না ছাই, গুষ্টির পিণ্ডি (এই বিচ্ছিরি শব্দ দুটো ওই একজনের মুখে শুনে শুনে যমুনারও মনে বা মুখে এসে যায়)—ও আবার দাদা—ও একটা হারামজাদা শয়তান উল্লুক শুওর গাধা—

মাথার পাতলা বালিশটা টেনে বুকে এনে তেরো বছরের যমুনা আরো কয়েকটা উপযুক্ত গালাগাল ঠোঁটে আনতে চেষ্টা করল। সামনের বস্তি এলাকার শয়তানগুলোর মুখে আরো অজস্র রকমারি গালাগাল শুনেও যমুনার মনে থাকে না, থাকলেও মুখে আনতে পারে না।

···আজ যদি যমুনার হাতে একটা ছোরা-ঠোরা কিছু থাকত, আর মাথায় যে-রকম খুন চেপেছিল তা কাজে লাগানোর ফাঁক থাকত—তাহলে ওই পেনো হারামজাদা রক্তে ভেসে এই ঘরের মেঝেতে পড়ে

কাটা খাসি-পাঁঠার মতো হাত-পা ছুঁড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

কিন্তু প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার পরে, আত্মরক্ষার খোলটা চুরমার হয়ে যাবার পরেও যমুনা কিছুই করতে পারেনি। উঃ! বলে গলা দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ শুধু বেরিয়ে এসেছিল। এক হাতে মাথার তালু চেপে ধরেছিল। আর লাল নীল সবুজ দেখা দু' চোখ তুলে দু হাতের মধ্যে বসা ঘাতককে দেখছিল।

···আর এমন হেনস্থা করার পরেও ওই ষণ্ড ষাঁড় বাঁদরের মতো চাপা গলায় খিক-খিক করে হাসছিল।

যমুনার একটা হাত মাথার তালুর ওপর উঠে এলো। আঙুল ঘষে মনে হল একটুখানি জায়গা একটা টুকরো সুপুড়ির মতো উঁচিয়ে আছে। চাপ দিতে বেশ ব্যথাও লাগল।

···যমুনার দু'কান খাড়া একটু। মনে হল দরমার গেটে একটা খসখস শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন দড়ির ফাঁস খুলে ওটা ঠেলে সরাচ্ছে। এ দিকটায় ছিঁচকে চোরের উপদ্রব খুব। যদিও ওদের ঘরদোর নিঝুম এরই মধ্যে, কিন্তু রাত আর কত এখন! চোর মনে হল না যমুনার। তবু উঠে ছনের ঘরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ালো। আবছা অন্ধকারে একটা মানুষের মূর্তি চোখে পড়ল, গেট সরিয়ে ভিতরে পা দিয়েছে। যমুনা একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠল, কে?

—চুপ! আমি···।

পানুদার গলা। সেই পাজি উল্লুক হারামজাদা পেনো। হাতে ছুরি-ছোরা থাকলে যার বুকে বসিয়ে দেবার মতো খুন চেপে আছে মাথায়। হাতের ছোট টর্চ মাটির দিক করে জ্বেলে খুবরি জানলার দিকে এগিয়ে আসছে। এলো। টর্চের আলো একটু তুলে তেমনি চাপা গলায় বলল, রাত মোটে সাড়ে দশটা। এখন এরই মধ্যে তোদের মাঝরাত্রি! তোর আর পড়া-শুনা হয়েছে—

যমুনা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। টর্চটা আরো একটু তুলে মুখের ওপর ফেললে ওর মেজাজ বুঝতে পারত। মাঝরাত্রি হোক আর সন্ধ্যারাত্রি হোক, তার কি চাই তাও জিজ্ঞেস করল না।

—কাকা আর পিসি ঘুমোচ্ছে তো, একটু বেরিয়ে দাওয়ায় আয় না, খুব দরকারি কথা আছে—

গলার স্বর বেশ নরম। যমুনার মনে হল আপোস করতে এসেছে। কিন্তু হাজার দোষ করলেও এই ছেলের গলায় আপোসের সুর বড় একটা শোনা যায় না। তাই রাগ সত্ত্বেও কৌতূহলও একটু হল। ঘুরে দাঁড়িয়েও থমকালো একটু। মেঝেতে শুয়ে সোনাপিসি নাকডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদিকের ঘরে বাবাও তাই। সন্ধ্যার পরেই তারা দুজনে একসঙ্গে বসে আফিমের বড়ি আর দুধ খায়। তার খানিক বাদে যা হোক কিছু মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরে ডাকাত পড়লেও ভোরের আগে তাদের আর ঘুম ভাঙবে না।···ওই পাজি এটা খুব ভালো করেই জানে। এ-সময়ে কেন আবার এলো? বয়েস মাত্র তেরো হলেও যমুনার মনের বয়সের কে খবর রাখে। রাতের এই নিরিবিলিতে ওই শয়তানের সামনে যাওয়া কি উচিত?···বাবা বা পিসি পাশের ঘরে থাকতেই শাসনের ছুতো ধরে গায়ে হাত দেয়, চুল ধরে বা খিমচে মেরে গাল ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসে, শাস্তি দেবার নামে কাঁধের বা হাঁটুর ওপরের মাংস এত জোরে খাবলে ধরে যে যমুনা বেশ ব্যথা পায়—ওই পাজির তখনো রাগের মুখ, কিন্তু চোখের দিকে তাকালেই যমুনা বেশ বুঝতে পারে এই করে কিছু মজা পাচ্ছে। চোখে-মুখে কিছু শয়তানি কিলবিল করছে। আজ তিন মাস-টাস হল শাসনের নামে এই গোছের শয়তানি চালিয়েছে। ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে যাবার পর থেকেই।

কিন্তু মুখ বুজে যমুনা অনেক উৎপাত সহ্য করে বটে, ভিতরে ও খুব ঘাবড়াবার মেয়ে নয়। আর এখন অন্ধকারে এই মূর্তি দেখা মাত্র মাথায় তো আগুনই জ্বলছে। আবছা অন্ধকারে দুমদাম পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দরজার পাশ থেকে ডিম-করা লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বড় করে উস্কে দিল।···সব ঘুমুচ্ছে জেনে নিরিবিলি রাতের অন্ধকারে গায়ে হাত দেবার মতলবে এসে থাকলে যমুনা আজ হাতের লণ্ঠন দিয়েই এক ঘা বসিয়ে দেবে—দেবেই। ভয় করার কি আছে!

বড় বড় পা ফেলে দরজার হুড়কো খুলে লণ্ঠন হাতে দাওয়ায় এসে

দাঁড়ালো। এই পাজির জন্য আজ ওর রাতের খাওয়া পর্যন্ত হয়নি। ওঘরে বাবা আর এঘরে পিসি ঘুমিয়ে পড়ার পর যমুনাও না খেয়েই শুয়ে পড়েছিল। নিজের হাতে নিয়ে না খেলে ওকে খেতে বলার তো কেউ নেই।

পানু হাতের ছোট টর্চ জ্বেলেই এগিয়ে এলো। ডাকনাম পানু। ভালো নাম পূর্ণ। পূর্ণ ঘোষ। কিন্তু সেই ভালো নাম স্কুলের খাতাতেই আটকে আছে। স্কুলের ছেলেরাও ওকে পানু বলেই জানে, পানু বলেই ডাকে। পাড়ার ছেলেরা তো সব ওই স্কুলেই পড়ে, তাছাড়া যমুনার বাবা ওই স্কুলেরই সেকেণ্ড পণ্ডিত। তাই সেখানে এই ডাক নামটাই চালু হওয়া স্বাভাবিক।

টর্চ জ্বেলেই দাওয়ায় উঠে এলো। হাসি-হাসি মুখ। পরনে পাজামার ওপর একটা গেঞ্জি শুধু—পায়ে চপ্পল। টর্চের আলো যমুনার মুখের ওপর ফেলেই থমকালো। মুখের হাসিতে টান ধরল, অপ্রতিভ একটু।—তোর চোখ মুখ এত লাল আর ফোলা-ফোলা কেন·· কাঁদছিলি-টাদছিলি নাকি ?

সদয় গলা শুনে যমুনার গলার ধার অস্বাভাবিক রকম বাড়ল। এ-রকম বড় হয় না। বলল, আমার চোখ-মুখ লাল হোক ফোলা হোক তোমার তাতে কি ? এখন কি মতলবে এসেছ ?

—ও বা-বা, তুই যে একেবারে ক্ষেপে আছিস দেখছি !···শোন্, সত্যি তুই লক্ষ্মী মেয়ে, আর আমি একটা পাজির পা-ঝাড়া···মা-কালীকে বলে তুই তো কতবার আমাকে উতরে দিয়েছিস, মা-কালী তোর কথা শোনে, তাকে বলে এই শেষবারটাও তুই আমাকে উতরে দে—দ্যাখ, খবরটা শুনেই আমি তোর কাছে ছুটে এসেছি, গায়ে জামাটা গলাবারও ধৈর্য ছিল না—লক্ষ্মীটি, এক্ষুনি তোদের ঠাকুরঘরে যা একবার, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করছি।

ওকে সামনে দেখে যমুনার শরীরের রক্ত যেরকম ফুটছে, এই নরম গলা শুনে তা একটুও ঠাণ্ডা হবার নয়। কিন্তু একটা গোলে পড়ে ওকে তোয়াজ করতে এসেছে বুঝে ইচ্ছে করছিল মুখ বাড়িয়ে লণ্ঠনটা দিয়েই এক ঘা বসিয়ে দেয়। ওকে দিয়ে মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করিয়ে কাজ হাসিল হলেই আবার যেমন পাজি—তেমনি। তখন আর কিছু মনেও থাকে

না। রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করছে বলেই কি প্রার্থনার জন্য এই রাতে ছুটে এসে ওকে পূজোর ঘরে ঠেলে পাঠাতে চায়—মাথায় এলো না। কঠিন চোখে মুখের দিকে চেয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা।

—বাঃ! অমন করে চেয়ে আছিস কি—কাল যে আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুচ্ছে রে! ফণী একটু আগে কলকাতা থেকে এসে আমাকে খবর দিল আজই বেশি রাতে রেজাল্ট টাঙিয়ে দেওয়া হবে—শুনেই ওকে রেখে আমি তোর কাছে ছুটে চলে এলাম—সকালে তো আর সময় পাব না, ভোরের ফার্স্ট ট্রেনেই আমি আর ফণী কলকাতা চলে যাব।

যমুনার অপলক কঠিন দু'চোখ ওর মুখে বিঁধে আছে।···এই জন্যেই। এই দায়েই এত ভালো মুখ, এমন নরম মুখ। করছি প্রার্থনা, রোসো।

পানু ওর হাত ধরে পূজোর ঘরের দিকে টানল'।—লক্ষ্মীটি, এক্ষুনি যা একবার, অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশনে পাসটা না করতে পারলে আমার বারোটা বেজে যাবে—দাদা ঠেঙিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে, পড়াও বন্ধ করে দেবে। মা-কালীকে বেশ ভালো করে একটু বল—

যমুনা ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল। আমার যা কবার করছি, তুমি যাও—আমি কারো সামনে প্রার্থনা করি না।

পানু এটাও জানে প্রার্থনা-টার্থনা এক মনে নিরিবিলিতে বসে করতে হয়, আর যমুনা তাই করে। ঠিক আছে, আমি যাই তাহলে, কাল দুপুরের আগে তাহলে আর তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না—মা-কালীকে খুব ভালো করে বলবি কিন্তু, ঠাকুরঘরে বসে আবার ঘুমিয়ে পড়িস না।

দাওয়ায় নামল। দরমার গেট আবার টেনে দিয়ে চলে গেল। রাগে যমুনা আরো বেশি ফুঁসতে লাগল।·· এমন স্বার্থপর, এই সন্ধ্যাতেই কি হেনস্থা আর বজ্জাতি করে গেছে, পরীক্ষা-পাসের চিন্তায় এরই মধ্যে তা-ও ভুলে গেছে। নেমকহারাম বেইমান কোথাকারের।

লণ্ঠন হাতে যমুনা সত্যিই পূজোর খুপরি ঘরের দিকে এগোল। চোরের ভয়ে এই বাইরের ঘর তালাবন্ধ করতে হয় না। কি আছে যে নেবে। তাছাড়া ওর ধারণা কালীর ঘরে ঢুকবে এত সাহস চোরেরও নেই।

…ঘরের এই মা-কালী যমুনার প্রার্থনা শোনে এ-কথাটা প্রথম দাদার মুখ থেকেই ওই পাজি শুনেছিল। দাদা যমুনার থেকে ন' বছরের বড় ছিল আর পানুদার থেকে প্রায় চার বছরের।…দাদাকেই গুরু ভাবত, দাদার পিছনে ছায়ার মতো ঘুরতো। দাদার মুখের কথা খসলে এই ছেলের তখন যেন বাঘের গলায় দড়ি পরানোর হিম্মত। দাদা হল গিয়ে এই ইছাপুর-শ্যামনগর এলাকার ছাত্র-জগতের হিরো। ইছাপুর-শ্যামনগর বলার কারণ ওদের এই এলাকা ইছাপুব স্টেশন থেকে যতটা দূরে, শ্যাম-নগর স্টেশন থেকেও প্রায় ততটাই দূরে। শ্যামনগর সামান্য কাছে। সেই স্বদেশী আমলে দাদার মতো এত বুকের পাটা এ তল্লাটে কোনো ছাত্রর তো ছিলই না। স্কুলে পড়তে রুখে দাঁড়িয়ে গোরা সার্জেণ্টের হাতে ঠেঙানি খেয়েছে, কলেজে পড়তে দু'দুবার জেল খেটেছে। এমন মিষ্টি মুখ ছিল দাদার, কিন্তু তার ভিতরেব তেজের কথা ভাবলে যমুনার গায়ে এখনো কাঁটা-কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই দাদার হুকুম হলে আবার ভয় ভয়? পানুদা বুক ফুলিয়ে যমুনাকে বলত, জিতুদা হুকুম করলে আমি গণ্ডা-গণ্ডা গোরা খতম করে আসতে পারি—বুঝলি?

সেই দাদা যদি বলে মা-কালী যমুনার প্রার্থনা শোনে—এ-ছেলে অবিশ্বাস করে কি করে? আর শোনে যে তার প্রমাণ তো ওই শয়তান হাতেনাতেই পেয়েছিল।…দাদা মারা যাবার আগের বছরের ব্যাপার। পানুদার তখন বছর পনেরো বয়েস—ক্লাস সেভেন থেকে এইটে প্রমোশন পাবে না ধরেই নিয়েছে। সংস্কৃত আর ভূগোল দুয়েতেই ধেড়িয়েছে নিজেই জানে। ধেড়াবে না তো কি, বই নিয়ে বসে কখনো যে পাস করবে! ভূগোলে ম্যাপ-ট্যাপ এঁকেছে, মা-সরস্বতীর দয়া হলে তিরিশটা নম্বর পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু সংস্কৃততে আঠারো-কুড়ির বেশি কালিদাস এসে চেষ্টা করলেও কেউ দিতে পারবে না—আন্দাজমতো যেখানে সেখানে অনুস্বার বিসর্গ খণ্ড-ত বসিয়ে এসেছে। রেজাল্ট বেরুনোর দিন যত এগিয়ে আসছে, তার হিসেবে সংস্কৃতের নম্বর ততো কমে আসছে। একটাই আশা ছিল, বাবা কোয়েশ্চেন করেছে, বাবাই খাতা দেখবে। আর দাদাকে ধরে, দরকার হলে বাবারও হাতে পায়ে ধরে

তিরিশটা নম্বর ম্যানেজ করে নিতে পারবে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। ছেলেদের ক্লাস সেভেন থেকে এইটে তোলার ব্যাপারে ঝাড়াই-বাছাইয়ের বায়ু চেপেছে হেডমাস্টারের মাথায়। যারা ক্লাসে পড়িয়েছে আর কোয়েশ্চেন করেছে, তারা খাতা দেখবে না—সেই সেই বিষয়ের উঁচু ক্লাসের মাস্টারমশাইরা দেখবে। আর যেই খাতা দেখুক পানুদা কেয়ার করে না, ভাবনা কেবল ভূগোল আর সংস্কৃত নিয়ে। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় ভূগোলে তবু একশয় আটত্রিশ নম্বর পেয়ে গেছল—অন্য মাস্টারের হাতে অ্যানুয়ালে পাস-মার্ক থেকে দুই এক নম্বর শর্ট পড়লে সেটা একটা কন্সিডারেশনের ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু সংস্কৃততে কি হবে? সংস্কৃতের খাতা দেখছে অমাবস্যা-মূর্তি হেডপণ্ডিত মশাই—সংস্কৃত জানার দাপটে যে-মানুষ মাটি দাপিয়ে হাঁটাচলা করে, আর যার বিবেচনায় সংস্কৃত না-জানা লোক মাত্রেই মুখ্খু! হাফ-ইয়ার্লিতে বাবার হাতেই সংস্কৃততে নম্বর পেয়েছিল একশয় ছাব্বিশ—বাবা বলেই দিয়েছিল ষোলকে ছাব্বিশ করেছি, আর পারি না। এবারে হেডপণ্ডিতের হাতে পড়ে ওই সংস্কৃত খাতার কি দশা হবে! যত দিন যাচ্ছে তার হিসেবের নম্বর ততো কমছে।

নিরুপায় হয়ে শেষে এখানেই এসে দাদার কাছে আর্জি। কাকাকে অর্থাৎ বাবাকে বলে এবারের মতো তাকে উতরে দিতে হবে। ফেল করলে তার দাদা চটিপেটা করে গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নেবে। জিতুদা চেষ্টা না করলে তার ফেল করা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

দুঃসাহসী ভক্তকে এত কাতর দেখে যমুনাকে অবাক করে দাদাও হঠাৎ বেজায় রেগে গেছল।—সমস্ত বছর পড়াশুনা করিসনি, নেচে-খেলে বেড়িয়েছিস—এখন ফেল করার ভয়ে হেদিয়ে মরতে লজ্জা করে না? হেডপণ্ডিত কেমন মানুষ তুই জানিস না—বলতে গেলে বাবাকে যদি অপমান করে দেয়—তখন?

তোর হয়ে হেডপণ্ডিতের কাছে সুপারিশ করার জন্য আমি বাবাকে বলতে পারি!···খেটেখুটে পড়ে-টড়ে ফেল করলে দুঃখ হতে পারে, না পড়ে ফেল করলে মনখারাপ করার কি আছে—তোর তো মাথা নেই

এমন নয়, ভালো পড়, সামনের বছর খুব ভালো পাস করে যাবি, ফেল করলে তোর দাদাকেই বলে দেব না-হয়, বেশি কিছু বলবে না।

···দাদা যত স্বদেশী করুক আর ছেলেদের ওপর যত সর্দারি করুক, তার কোনদিন ফেল করার ভাবনা ছিল না। ষোল বছর তিন মাস বয়সে দুটো লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছিল, আঠারোয় হাই ফার্স্ট ডিভিশনে আই-এ পাস করেছিল···বি-এ পরীক্ষায় আর বসাই হয়নি। পানুদার আর দ্বিতীয় বার বলার সাহস নেই। তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে যমুনার খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু দাদা একবার না বললে তাকে আর হ্যাঁ করানো যায় না। তবু দাদারও বোধ হয় একটু মন খারাপ হয়েছিল। ভক্তকে ভালবাসে তো বটেই। বোনকেও মন-মরা দেখে হেসে ঠাট্টার সুরেই বলেছিল, তার থেকে তুই এক কাজ কর পেনো, যমুনাকে মা-কালীর কাছে বসে তোর জন্য প্রার্থনা করতে বল্, ওর কথা মা-কালী খুব শোনে—উতরে যেতেও পারিস।

দশ বছরের যমুনা বেশ মুশকিলেই পড়ে গেছল। দাদা যে কি করে বলল, দাদার মাথার ঠিক নেই। দাদা কোনদিন নিজের জন্য ওকে মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করতে বলেনি। তার সর্বব্যাপারে যমুনা নিজের থেকে পুজোর ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করত। সেই আট বছর বয়েস থেকেই পুজোর ঘরের সমস্ত কর্তৃত্ব ওর হাতে। সব গোছগাছ করে দিলে বাবা শুধু পুজো-টাই করে। দিনে বেশিক্ষণ করে, রাতে অল্পক্ষণ। কিন্তু যমুনার কি করতে হয়। সকাল-সন্ধ্যা ঠাকুরঘর মুছে তকতকে করে রাখে, সকালে স্নান সেরে আগে ফুল তোলে, সাজি রেখে মেঝেতে গ্যাঁট হয়ে বসে মা-কালীকে রাতের শয়ান থেকে তোলে। কাপড়ের টুকরো গঙ্গাজলে ভিজিয়ে মায়ের পা থেকে বাসি ফুল শুকনো চন্দন শুকনো বেলপাতা সব বেশ করে মুছে গোটা পটখানা খুব যত্ন করে চকচকে করে ফেলে। তারপর পায়ে অনেকক্ষণ ধরে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করে মাকে গদি-পাতা জলচৌকিতে বসায়। এরপর সরঞ্জাম গোছানোর পর্ব। সেও কি কম! পুজোর বাসনপত্র সব মেজে পরিষ্কার করা, ফল কাটা, লাল আর শ্বেত দু'রকমের চন্দন ঘষা, রেকাবিতে নৈবেদ্য আর ফল সাজানো, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজানো—

খুঁটিনাটি আরো কত কি আছে। ভোর পাঁচটায় শুরু করেও সকাল সাড়ে ছ'টার আগে সব সেরে বেরুতে পারে না। আগে বাবাকেই সব করে নিতে হত, তার খুব কষ্ট হত। যমুনা করে দিতে চাইলে সোনাপিসি ব্যাগড়া দিত, বলত, বিয়ের আগে মেয়েদের মায়ের পটে হাত দিতে নেই, ও-সব করতে নেই। শেষে দাদার কাছেই খুব জব্দ। একদিন মুখের ওপর সোজা জিগ্যেস করেছে, হাত দিতে নেই করতে নেই এ-সব শাস্ত্রকথা তুমি কোথায় পেলে?

দাদা তেড়ে এলে সোনাপিসিরও অন্য মুখ। আমতা-আমতা করে জবাব দিয়েছে, আমরা তো সেই কতকাল থেকেই এ-রকম শুনে আসছি রে।

—শুনে আসছ? লোকের মুখে? তা আমিও একটা লোক বলছি বিয়ের আগে মেয়েরা কালীর পটে হাত দিলে বা যত্ন করে সেবা করলে খারাপ কিচ্ছু হয় না—হলে বরং ভালো হয়। তারপর বোনকে সোজা হুকুম করেছে, কাল থেকেই বাবাকে যতটা পারিস সাহায্য করবি, গোছগাছ করে রাখবি।

সেই থেকে শুরু।···তা দু'বেলা অনেকক্ষণ ধরে পুজোর ঘরে কাটাতে হলে যমুনা একেবারে মুখ বুজে বসে থাকে কি করে। কিন্তু কথা বলার মতো আর দ্বিতীয় প্রাণীই বা ওই খুপরি ঘরে আর কে থাকে? অগত্যা কথাবার্তা যা হয় যমুনার কালীর সঙ্গেই হয়। মনের কথা মুখ ফুটে সব তাকে বলে। যেমন, বাবার শরীরটা মোটে ভালো যাচ্ছে না, তোমার চোখ নেই—দেখো না? দাদাকে সবসময় খুব ভালো রেখো, বুঝলে? নইলে তোমার সঙ্গে আমার কোনো খাতির নেই মনে রেখো, দাদা ভালো না থাকলে আমার দ্বারা আর তোমার কোনো কাজ হবে! ···বাবাকে আফিম তো ধরিয়েছ, কিন্তু আফিমের গুলি আবার বড় হতে দিচ্ছ কেন? দাদা বলে ওই জন্যেই তো বাবা আর আগের মতো রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠতে পারে না—আর যেন একটুও বাড়ে না দেখো। ···আচ্ছা, তুমি কি কেবল দেখে যেতেই আছ—কিছু করবে না? বাবার এত চিন্তা, দিনে দিনে সব জিনিসের দাম চড়ছে, এই আয়ে সংসার আর

চালিয়ে উঠতে পারছে না—এই শরীর বিকেলে আবার একটা টিউশনি সেরে স্কুল থেকে ফেরে, কিন্তু তাতেও খরচ কুলোয় না—এমন হয় কেন? হয় তুমি জিনিসপত্রের দাম শস্তা করে দাও, নয়তো বাবার রোজগার বাড়িয়ে দাও। বাবার কষ্ট আর ভাবনাচিন্তা দেখতে তোমার ভালো লাগে? ছেলের কষ্ট কোন মা দেখতে পারে? আচ্ছা মা, পানুদা এ কি বলে গেল—তাদের কাজলীতলার কোন এক বাড়ির ভাল মানুষ বউটা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করল। তুমি দেখলে চেয়ে চেয়ে? স্বামী অত্যাচার করত বলে তাকে তুমি জ্বলে-পুড়ে মরতে দিলে? স্বামীটাকে তুমি সুমতি দিলে না—আর কেরোসিনের টিনটাকেও জলের টিন করে দিতে পারলে না? বৌটার চার বছরেব ছেলেটার কি হবে—এরপর দিনরাত তাকে কোলে নিয়ে বসে থাকার সময় হবে তোমার না-কি ওটাও মরবে?···মা, তোমাকে অনেকবার বলেছি দাদার কোনরকম ক্ষতি হলে আমি কিন্তু যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে ছাড়ব! দাদাকে পুলিসে এত টানা-হ্যাঁচড়া কেন? পানুদা বলে, গান্ধীজীর হুকুমে দাদা দেশের গলা থেকে গোলামির শিকল খুলে ফেলতে চায়—এই তার দোষ। কিন্তু তুমি বলো দোষটা কোথায়? গলায় শেকল পরে থাকতে কোনো মানুষের ভালো লাগতে পারে? এ অপমান সহ্য করা তোমার মতে কি পাপ নয়?··· এবারে দাদা একমাস জেল খেটে ছাড়া পেয়ে এলো, দাদা বলছে তার কোনো কষ্ট হয়নি—কিন্তু মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি তার খুব—খু-উ-ব কষ্ট হয়েছে। ফের এমন হলে আমি তোমার পটে একটা শেকল বেঁধে দেখব কেমন লাগে বলে দিলাম!

যমুনা এমনিতে বেশ কম কথা বলে। কিন্তু পুজোর ঘরে এসে বসলে মা-কালীর সঙ্গে তার অনর্গল কথা। সবসময় দরজা ছুটো ভেজিয়ে দিয়ে বসে। কিন্তু দাদা এমন দুষ্টু, কখন দরজা একটু ফাঁক করে বা খুপরি জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ওর কথা শোনে যমুনা জানতেও পারে না। পরের হাসাহাসি দেখে আর কথা শুনে বুঝতে পারে দাদা আড়ি পেতেছিল। পুলিসের টানা-হেঁচড়া নিয়ে মাকে শাসানোর কথা পাড়ার লোকের পর্যন্ত জানত বাকি ছিল না।···মরুকগে। দাদার জন্য মা-কালীর

কাছে প্রার্থনা করাটা বাড়ানো কথা কিছু নয়। দাদা পরীক্ষা দিতে গেলে বা পরীক্ষার ফল বেরুনোর সময় হলে প্রার্থনা করত। দাদা কোনো ভালো কাজে বেরুলেই মা-কালীর কাছে এসে প্রার্থনা করাটা যমুনারও যেন ডিউটির মধ্যে। কিন্তু দাদার জন্য প্রার্থনা করা আর সকলের জন্য করা কি এক? দাদার বেলায় প্রার্থনা করতে বসলেই ওর মনে হয়, মা-কালী ওর মনের কথা আগেই বুঝে নিয়েছে, দাদা বিফল হবে না বা হতে পারে না। দাদাকে আগে থাকতে সে-কথা বলেই দিত।

…কিন্তু যে-ছেলের কপালে নির্ঘাত ফেল, মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করে তাকে সে পাস করাবে কি করে? ওর কথা শুনে মা-কালী কি হেড-পণ্ডিতের খাতা বার করে পানুদার সংস্কৃতর নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে আসবে। কি যন্ত্রণার মধ্যে যে ফেলে না দাদা। হেডপণ্ডিত নম্বর দেওয়া তো শেষ করেই বসে আছে—এখন আর কে কি করতে পারে! কিন্তু পানুদা দাদার কথা শুনে এমন চেয়েছিল যে যমুনাই যেন তার শেষ আশা, শেষ ভরসা। পারলে সেই বেলা ছুপুরেই তাকে মা-কালীর কাছে ঠেলে পাঠায়।

…যাক, সন্ধ্যায় মা-কালীর পটের সামনে বসে প্রার্থনা একমনে সত্যিই করেছিল। বলেছিল, মা-গো, এই বারটি তুমি দাদার মুখ রক্ষা করো—পানুদাকে পাস করিয়ে দাও। কি করে হবে কেমন করে হবে তুমি জানো, মোটকথা পানুদার পাস করা চাই। নইলে ও ভাববে দাদা বোনের হয়ে বাজে বড়াই করে। এবারকার মতো তুমি যে-ভাবে হোক পানুদাকে পাস করিয়ে দাও, তারপর দাদাকে দিয়ে আমি ওর মাথায় গাঁট্টা মারিয়ে ঠিকমতো পড়াশোনা করানোর ব্যবস্থা করব।

…সেই পরীক্ষার ফল বেরুতে দেখা গেছে, পানুদা ছোট মতো একটা ওয়ার্নিং খেয়ে ক্লাস প্রমোশন পেয়েছে। সংস্কৃততে অবশ্যই ফেল, কিন্তু পানুদা যত খারাপ ভেবেছিল ততো নয়। অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু খণ্ড-ত কয়েক জায়গায় হয়তো ঠিক-ঠিকই পড়েছে। তবু নম্বর একশ'তে আঠাশ। ছু'নম্বরের জন্য ফেল। কিন্তু ভূগোলে যত খারাপ হয়েছে ভেবেছিল ততো খারাপ হয়নি—একশ'তে একচল্লিশ পেয়েছে। অন্য সব

সাবজেক্টে মোটামুটি ভালো নম্বর। অতএব ওয়ার্নিং পেয়ে পাস। কিন্তু ক্রেডিট সব যমুনার। হেসে হেসে দাদা পর্যন্ত বলেছে, দেখলি ওর প্রার্থনার কেরামতি, কোথায় নির্ঘাত ফেল আর কোথায় ডঙ্কা মেরে পাস!

পানুদাও বিশ্বাস করেছে মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করে ও অসাধ্য-সাধন করতে পারে। কেবলমাত্র যমুনা এ-রকম ভাবে না। না, ওর নিজের কোনো কেরামতি নেই, মাকে ডেকে খুব করে বলেছিল, মা কথা রেখেছে। দাদার কথা শুনে ফোঁস করে উঠেছিল, ডঙ্কা মেরে পাস না আরো কিছু, ওয়ার্নিং খেয়ে কেঁদেককিয়ে পাস, মা-কালীকে আমি বলেই রেখেছি সামনের বার থেকে পড়াশুনায় ফাঁকি দিলে তুমি ওকে মাথায় গাঁট্টা মেরে সজুত করবে, আমি আর এ-জন্য মাকে ডাকাডাকি করতে পারব না।

···তখন দাদা ছিল, যমুনার দিনও অন্যরকম ছিল। কাকে ভয় করত, কাকেই বা পরোয়া করত? দাদার ভয়ে এই শয়তান কোনোদিন তার সঙ্গে লাগতে আসত! দুষ্টুমি একেবারে করত না এমন নয়। স্বভাবে আছে বজ্জাতি, একেবারে না লেগে পারবে কেন। কিন্তু দাদাকে বলে দেবে বলে যমুনা শাসালেই হল, ওমনি জোড়হাত। ওর নিজের দাদার চটি-পেটাকে কলা ভয় করে—ভয়-ভক্তি সবই কেবল করত দাদাকে। দাদা যাবার পর থেকে ওর দিনে দিনে বাড় বাড়ছে।···অবশ্য অমন বজ্রাঘাতের মতো অঘটনটা ঘটে যেতে এই পাজিরও কম কষ্ট হয়নি। দারুণ কষ্টই হয়েছিল। কাটা ছাগলের মতো দাপাদাপি করেছিল। রাগের চোটে বাবার মা-কালীর পটই আছড়ে ভাঙতে চেয়েছিল। আর প্রতিজ্ঞা করেছিল সুযোগ বা ফাঁক পেলেই সাদা চামড়ার মানুষ মারবে। এখানে তো আছেই; ওদের বাড়িতেও দাদার একখানা ফোটো আছে। সেই ফোটোতে প্রণাম না ঠুকে কোনো ভালো কাজে বেরোয় না। দাদার কথা উঠলে এখনো চোখ ছলছল করে, বুক টনটন করে বোঝা যায়। বজ্জাতি বাড়লেও যমুনা এই কারণেই ওকে বরদাস্ত না করে পারে না। বেশি রাগ হলে বাবার কাছে নালিশ করবে ভাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ও করে না।

···দাদা বেঁচে থাকার একটা বছর সত্যিই এই দামাল ছেলের পড়াশুনায় একটু মন এসেছিল। যমুনা যখন-তখন শাসাতো, পড়ায় ফাঁকি

দিচ্ছ, আমি কিন্তু মা-কালীকে তোমার জন্য আর একটা কথাও বলতে পারব না। তখন ওর সামনেই রাগ দাদার ওপরেও। তুমি আস্কারা দিয়ে ওকে বড়র দলে টানো বলেই ও আঙুল ফুলে কলা-গাছ হচ্ছে, এখন কিছু বলছ না কিন্তু পরীক্ষায় ফেল মারার দাখিল হলে আর আমার দিকে লেলিয়ে দিও না।

দাদা হাসি চেপে ওকে শাসন করত। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করত, সকালে দু'ঘণ্টা আর রাতে দু'ঘণ্টা করে পড়ছিস?

সেয়ানা ছেলে অম্লানবদনে মাথা নাড়ত; পড়ছে। কিন্তু এ-টুকু দেখার জন্যই এক-এক সকালে যমুনা হুট-হাট ওদের বাড়িতে চলে যেত; মনসা-তলা থেকে কাজিতলা বড়জোর আট দশ মিনিটের হাঁটা পথ। আর ওর অতবড় দাদা নিজের ভাইয়ের থেকে (যমুনা পরে জেনেছে নিজের ভাই নয়, সৎ ভাই) ঢের বেশিই ভালবাসতো। ওর দাদা বউদি দু'জনেই যমুনাকে খুব পছন্দ করত, আদর করে এটা-ওটা খেতে বলত। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই ওই ছেলের টিকির দেখা মিলত না। জিজ্ঞেস করলেই ওর দাদা রেগে টং।—কে জানে কোথায় আড্ডা দিয়ে আর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে—দু'দণ্ড বই নিয়ে বসার নাম নেই, আর তোর বউদিও হয়েছে তেমনি, কিছু জিজ্ঞেস করলেই দেওরের দোষ ঢাকতে ব্যস্ত, লাই দিয়ে মাথাখানা যে খাওয়া হচ্ছে সেটা আর বুঝতে পারে না।

সাহস করে দশদিন পানুদা বাড়ি নেই কেন বা কোথায় গেছে যমুনা জিজ্ঞেস করতেও পারে না। জিজ্ঞেস করলেই তো ঘুরে ফিরে বউদির কপালে বকুনি। ওই দস্যি দেওরের সব দোষেরই ভাগীদার যেন এই বউদি।

যমুনার শাসানির ভয়ে হোক বা স্বদেশী দাদার দাবড়ানির ভয়ে হোক, ওই একটা বছর একটু আধটু পড়াশুনা করেছে আর নির্ঝঞ্ঝাটে ভালোই পাস করে গেছে। তখন বুকের পাটা দশহাত।—সংস্কৃতটা ঘাড় থেকে নামল না বটে, কিন্তু ইতিহাস ভূগোল তো নেমেছে— এবারে অ্যাডিশনাল ম্যাথমেটিকস আর মিকানিকস নিয়ে নম্বরের ফুলঝুরি ছুটিয়ে দেব দেখে নিস্।

যমুনা তখন অ্যাডিশনাল কম্পালসারির কিছুই বোঝে না, বয়েস এগারো হলেও পড়ে তো মাত্র ক্লাস থ্রি-তে—বুঝবেই বা কি করে। বোকার মতোই জিজ্ঞেস করেছিল, ও-সবে ভালো নম্বর পেলে তোমার সংস্কৃততে ফেল করলেও চলবে ?

তখন আমতা-আমতা ভাব।—না, তা অবশ্য চলবে না, তুই কি ভাবিস ওই ঘোড়ার ডিমের সাবজেক্টে তিরিশটা নম্বরও জোটাতে পারব না, ক্লাস নাইনে তো উঠলাম, আর কিছু না হোক জ্ঞান-বুদ্ধি তো একটু পেকেছে—অনুস্বার বিসর্গ টিসর্গগুলোকে ঠিক তাক-মতো বসিয়ে দেব দেখে নিস।

কিন্তু যমুনার আর দেখে নিতে হয়নি। দাদাকে যত ভালই বাসুক আর চলে যেতে যত দুঃখই হোক—এ-ছেলের পাখাও গজিয়েই চলেছে। নিজের দাদার কাছে মার খেয়ে খেয়ে বেড়ালের হাড় হয়ে গেছে—তার মারকে আর পরোয়াই করে না। দিন-রাত যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। যমুনা ওর পড়ার কথা তুললে চোখ পাকিয়ে ফোঁস করে ওঠে।—বড় সাহস দেখি তোর, এইটুকু মেয়ে আমার পড়া নিয়ে মাথা ঘামাস।

কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরুবার সময়ে একেবারে কাঁচুমাচু মুখ। সেই সংস্কৃতর ভূত না ঘাড় মটকায়। শুধু সংস্কৃত কেন, বাংলার উন্নতিও সেই রকম। ওর প্রাণের বন্ধু ফণীদার মুখে শুনেছে, স্কুলের খাতায় রবি ঠাকুরের বাবার নাম ওই ওস্তাদ ছেলে লিখেছিল মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর। সদ্য ক্লাস ফোরের দিকে পা-বাড়ানো মেয়ে যমুনা হিহি করে হেসে উঠেছিল। ও পর্যন্ত ওই মস্ত কবির বাপ-ঠাকুরদার নাম জানে। কোথায় প্রিন্স দ্বারকানাথ আর কোথায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ! ওর সেই হাসি দেখে বন্ধুর সামনেই এই পাজি চুলের মুঠি ধরে কি টানাই না টেনেছিল। যমুনার চোখে জল এসে গেছল, তার থেকে বেশি হয়েছিল অপমান—কারণ ওই ফণী বজ্জাত ওর হেনস্থা দেখে খুব মজা পেয়েছিল।

…ক্লাস নাইন থেকে টেনে ওঠার সময় সংস্কৃত শুধু নয়, বাংলার ভয়েও জুজু। তখন মুখ দিয়ে কথা নয়তো একেবারে যেন মধু গলে পড়ছে।—যমুনা, লক্ষ্মীটি যা, একবার গিয়ে তোর মা-কালীর কাছে আমার জন্য ধন্না দে, নইলে আমার ফেল করা কেউ রুখতে পারবে না। জিতুদার

নাম করে বলছি, সামনের বারে এই দুটো সাবজেক্ট নিয়ে আমি আদা-জল খেয়ে লেগে যাব—

যমুনার ততদিনে এই পাজির ওপর অনেক রাগ জমে গেছে। সহজে রাজি হয়নি। রাগ ছাড়া ভয়ও আছে। বার বার এমন অন্যায় প্রার্থনা করলে মা-কালী শুনবে কেন? মা-কালী যেন ওর হাতের মেয়ে, ধরে নাড়া দিলেই ফল ঝরবে। মাঝে এমন হয়েছিল যে স্কুলের ফুটবল ম্যাচ জেতার জন্যও ওকে ধরে মা-কালীর কাছে ঠেলাঠেলি। আর একবার বে-পাড়ার তিন-চারটে ছেলে ওর হাত মুচড়ে ধরে গালে ঠাস-ঠাস চড় মেরেছিল। যমুনার সন্দেহ নেই, বদমায়েসিটা আগে ও-ই করেছিল, নইলে অন্য পাড়ার ছেলেরা ঠেঙাতে আসবে কেন? দাদা নেই, এখনো সব জায়গায় অত দাপট দেখাতে যাওয়া কেন! তা ছেলে সেই অপমানের শোধ নেবেই নেবে—একে একে সব ক'টাকে ধরে ঠেঙাবেই। সে-সুযোগ পাওয়ার জন্যেও ওকে কালীর ঘরে পাঠাতে চায়। ধারণা, ও প্রার্থনা করলেই প্রতিশোধ নেবার মওকা পাবে। দুটো ব্যাপারেই যমুনা বেঁকে বসেছিল বলে মারতে এসেছিল। দাদা নেই বলে যখন-তখন গায়ে হাত তোলে এখন এত বাড় বেড়েছে। কিন্তু যমুনাও ফুঁসেই উঠেছিল, বলেছিল, কালীর কাছে এ-সব নিয়ে প্রার্থনা করলে সে তোমাকে তো ছাড়বেই, আমাকেও ছাড়বে। এমন আক্কেল দেবে তখন বুঝবে মজা।

না, তারপর অবশ্য এই নিয়ে আর গোঁ ধরেনি। ছোটখাটো ব্যাপারে এরপর আর ওকে কালীর কাছে ঠেলে পাঠাতেও চায়নি। কিন্তু পরীক্ষা পাসের ব্যাপারখানা তো আর ছোট কিছু নয়। পীড়াপীড়ি আর সাধা-সাধির ফলে যমুনাকে প্রার্থনায় বসতেই হয়েছিল। আর প্রার্থনা যখন করে মন ঢেলেই করে।

...হ্যাঁ, সেবারও বাংলা সংস্কৃত দুই পেপারেই পাস করেছিল, আর অঙ্কে ভালো বলে ফার্স্ট ডিভিশনের নম্বরই পেয়েছিল। ও বলে, অঙ্ক, অ্যাডিশনাল অঙ্ক আর মিকানিকস নিয়ে ওদের তিনশ' নম্বরের পরীক্ষা, তার মধ্যে আড়াইশ'র কাছাকাছি পাবেই। দু'শ উনিশ পেয়েছিল, সেই জোরেই ফার্স্ট ডিভিশনের নম্বর। কিন্তু এমন নেমকহারাম

বেইমান যে ক্লাস প্রমোশন পাওয়ার পর যমুনার কাছেই ডম্ফাই করেছে, আসলে সংস্কৃত আর বাংলা পরীক্ষাও ততো খারাপ হয়নি ওর, তা না হলে সংস্কৃততে আটত্রিশ আর বাংলায় চল্লিশ পেল কি করে—যমুনা প্রার্থনা করলেও মা-কালীকে পাস করানোর জন্য কিছুই কষ্ট করতে হয়নি।

এই মেজাজের ওপর ওই সব পুরনো কথা মনে পড়তে রাগে যমুনার না-কালো না-ফর্সা মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। পূজোর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু দরজা খোলেনি। ও চলে গেল টের পেয়েই লণ্ঠন হাতে সেখানেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বাইরের ওই অন্ধকারের দিকে চেয়েই যাচ্ছেতাই ভাবে জিভ ভেঙচালো—মা-কালীকে খুব ভালো করে বলবি কিন্তু, ঠাকুরঘরে বসে আবার ঘুমিয়ে পড়িস না—পাজি উল্লুক শুওর কোথাকারের—কালীকে তোমার পাসের কথা বলব, না তোমার ওই হাত মুচড়ে ভেঙে দিতে বলব? এঃ! লক্ষ্মীটি—এক্ষুনি যা একবার! যাচ্ছি—যা বলার খুব ভালো করে বলছি।

ঝনাৎ করে দরজার শেকল টেনে নামালো। নিঃশব্দ রাতটাই যেন চমকে উঠল। আফিমের মৌজে না ঘুমোলে বাবা আর সোনাপিসি আঁতকে উঠে ছুটে আসত। যমুনা লণ্ঠন হাতে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। ঠক্ করে লণ্ঠনটা মেঝেতে রেখে মেঝেতেই বসে পড়ল। সন্ধ্যারাতেই পুজো সেরে বাবা কালীকে শয়ান দিয়ে রেখে গেছে। মা-কালীর আবার শোয়া ওঠা বসা কি! নিজেরা যা করি তাই করছি, নইলে মা-কালী সদাই জাগ্রত।

শোয়ানো পটের দিকে স্থির চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে চোখ বুজল। প্রার্থনার জন্য এইভাবেই মন তৈরি করে নেয়। যখন মনে হয় রক্ত-মাংসের একটা মেয়ের মতো মা তার দিকে চেয়ে বসে আছে তখন শুরু করে। কাছাকাছি লোক থাকলে মনে মনে করে, কেউ না থাকলে যা চায় স্পষ্ট গলায় নিবেদন করে। এই রাতে আর কে শুনছে।

—মাগো, আমি কি বলতে এসেছি তুমি বেশ বুঝতে পারছ। তবু বলছি, এবারে তুমি ওকে কক্ষনো পাস করতে দিও না, সোজা ফেল করিয়ে দাও। তুমি জানো আমি কক্ষনো কারো মন্দ চাই না, এত যন্ত্রণা দেয় তবু ওরও মন্দ চাই না। কিন্তু ওর বড় বাড় বেড়েছে বড় অহংকার

হয়েছে—একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। ও তোমাকে এতটুকু ভয়-ভক্তি করে না, ক'বার তুমি ওকে পাস করিয়ে দিলে তার জন্যে একটুও কৃতজ্ঞতা নেই—কাজ হাসিল হয়ে গেলে তোমার কথা মনেও থাকে না, কেবল বিপদে পড়লে তখন আমাকে তোমার কাছে ঠেলে পাঠায়। আজ সন্ধ্যায় ও কি করেছে তুমি তো জানো, আমার মাথাটা এখনো ফুলে আছে, ব্যথা করছে—তারপর আবার সব ভুলে নির্লজ্জের মতো আমাকে দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করার জন্য ছুটে এসেছে। না, এবারে আর তুমি ওকে কক্ষনো পাস করতে দিও না, আমি প্রার্থনা করছি এই একটা বছর তুমি ওকে ফেল করাও। ফেল করাও ফেল করাও।···ও অবশ্য ভাববে আমার প্রার্থনার আর জোর নেই বা তুমি আমার প্রার্থনা আর শোনো না—আর এখন আমি ওই পাজিকে বলতেও পারব না কেন ফেল করল—তাহলে ফেল করার রাগের মুখে হয়তো আমাকে মেরেই ফেলতে চাইবে—কিন্তু পরে আর একটু বড় হয়ে আমি ঠিক বলে দেব কেন ফেল করেছে আর আমি তোমার কাছে কি প্রার্থনা করেছিলাম। এবারে তুমি ওকে একটু শিক্ষা দাও, ফেল করিয়ে দাও, একটা বছর অন্তত ওর ফেল করা দরকার—

উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। হারিকেন হাতে তপতপে মুখে ঠাকুরঘর থেকে বেরুলো। দরজার শেকল তুলে দিল। এতক্ষণের রাগ যেন একটা রাস্তা পেয়ে মাথা থেকে নামতে শুরু করেছে। বুঝুক এবার কত ধানে কত চাল।

পা-টিপে শোবার ঘরের দিকে এগোতে গিয়েও গেল না। বেশ খিদে পেয়েছে।···এই রাতে ওর খাওয়া পর্যন্ত হয়নি। বাবা আর সোনাপিসি রাত সাড়ে আটটার মধ্যে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যমুনা তারপর ধীরেসুস্থে যখন হোক খায়। কিন্তু আজ রাগের চোটে আর খেতেই বসোনি।

নিঃশব্দে রান্নাঘরের শিকল খুলে দরজা দুটো সরালো। ডাল ভাত তরকারির থালা নামিয়ে খেতে বসল। খেতে খেতে কেন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে যমুনা। নিজের ভিতর থেকেই কেউ যেন এখন বলতে চায় কাজটা ভালো করল না।

আবার রাগ। যমুনা বড় বড় গরাস পাকিয়ে মুখে তুলতে লাগল। বেশ করেছি, খুব ভালো করেছি। যে-ভাবে খুশি অত্যাচার করে যাবে, আর মুখ বুজে তাই সহ্য করতে হবে? তার ওপর আবার পাস করানোর জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হবে?

কেউ যেন অনুযোগ করেছে, তাই যমুনা ফুঁসে উঠে জবাব দিচ্ছে।

দরজা দুটো খোলা, বাবার কাশির শব্দ কানে এলো। উৎকণ্ঠায় থালার ওপর যমুনার হাত থেমে গেল। যদি কোনো কারণে বাবার ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকে তো এক্ষুনি উঠে আসবে। লণ্ঠনটা নিয়ে আসার দরুন ও-দিকটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, উঠে বসলেই রান্নাঘরের আলো চোখে পড়বে। ···ইদানীং বাবার বেশ কাশি হয়েছে, কাশি উঠলে অনেকক্ষণ ধরে কাশে আর তাতে নেশার ঘুম ভেঙে যায়। রাত হয়তো বারোটা এখন, উঠে এলে চিত্তির। এ-বাড়ির কেউ কখনো হয়তো রাত বারোটার মুখ দেখেনি।

···না, আবার ঘুমোচ্ছে।

যমুনা হঠাৎ বাবার ওপরেই রেগে গেলে। যত নষ্টের মূলে এই বাবা। দস্যিটাকে একেবারে যেন নেমন্তন্ন করে আনা হল।—তোর তো খুব অঙ্কের মাথা, মনাকে তুই অঙ্কতে পাকা করে দে, তার বদলে এই ছ'আট মাস আমি তোর সংস্কৃতটা দেখে দিচ্ছি, অন্তত পঞ্চাশটা নম্বর যাতে পাস সেই রকম তালিম আমি তোকে দিয়ে দেব'খন।

ছেলে তার পরদিন থেকেই ওকে অঙ্কে পাকা করার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগে পড়েছে। এটা যেন তার জীবনের সেরা কাজ একটা। অঙ্ক আবার সাবজেক্ট আর তা নিয়ে ভাবনা! যার মাথায় এতটুকু মগজ আছে সে সবেতে কাঁচা হলেও অঙ্কে কাঁচা হয় কি করে? সেই থেকে যমুনার অঙ্কের কাঁচা মাথা খুব পাকা করে তুলছে বসে বসে। এমন পাকা করছে যে মগজ নড়েচড়ে যাবার হাল। এদিকে এই আট মাসের মধ্যে নিজের তালিম নেওয়া শিকেয় উঠেছে। আট দু'গুণে ষোল দিনও সংস্কৃত বই-খাতা নিয়ে বাবার কাছে এসে বসেছে কিনা ঠিক নেই। বাবার তো পড়াবার ভালো সময় রবিবারের বা ছুটির দিনের দুপুরে, নয়তো শনিবারের বিকেলে। এত রবিবার যায় এত ছুটি-ছাটা যায়, কিন্তু বাবুর কি দুপুরে

আসার সময় আছে! তা-ও বিকেলে আয়, না সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা পেরুনোর আগে সময়ই হয় না। তখন কি আর বাবাকে মেজাজে পাওয়া সম্ভব—বাবা তখন আফিমের বড়ি খাবার জন্য উসখুস করতে থাকে। নিজের পড়া হচ্ছে না তার জন্য ভাবনা নেই, বাবুর যমুনার অঙ্ক নিয়ে মাথা ব্যথা। ওদিকে আসে যখন, সংস্কৃতর বই-খাতা ঠিক হাতে থাকে। থাকবে না? দাদাকে বলে আসতে হয় না, কাকার কাছে সংস্কৃত পড়তে যাচ্ছি?

···গোড়ায় গোড়ায় তো সপ্তাহের সাত সন্ধ্যাতেই অঙ্ক শেখানোর জন্য এসে জাঁকিয়ে বসত। বেগতিক দেখে বাবার সামনেই যমুনাকে ফয়েসলা করতে হয়েছে। রোজ রাতেই কেবল অঙ্ক শিখলে হবে নাকি, আর কোনো পড়া তৈরি করা নেই ওর? সকালে পুজোর কাজ সেরে সোনাপিসিকে রান্নার ব্যাপারে সাহায্য করে আর নিত্য দুই-একবার দোকানে ছোটাছুটি করার পর অন্য পড়া করার কতটুকু আর সময় পায়? বাবা উদার হয়ে ফতোয়া দিয়েছে, সপ্তাহে তিন দিন তাহলে পানুর কাছে অঙ্ক শেখ, অন্য পড়ার জন্য আর তোর চার দিন থাক—অন্য কিছু নিয়ে তোর তো আর অত ভাবনা নেই!

সেই তিন দিনকে এই পাজি জোর করে চার দিন করে নিয়েছে। বাবাকে বলেছে অঙ্কে এমন দেয়াল-মার্কা মাথা মেয়ের যে তার কমে কিচ্ছু হবে না। কিন্তু এই চার দিন নিয়েও কি খুশি নাকি? এ ছাড়াও অনেক সন্ধ্যায় এসে হাজির হয়। যেন দিন ভুল করে এসে হাজির হয়েছে। সে-দিন যমুনা কিছুতেই অঙ্ক নিয়ে বসে না অবশ্য, কিন্তু ও কি কম খুনসুটি আর কম জ্বালাতন করে যায়? সেই সব দিন ওর প্রাণের বন্ধু ফণী শিকদারের রকমারি শয়তানির কথাবার্তা ওকে শোনানো চাই। ওটা আরো পাজির পা-ঝাড়া। হাড়-শয়তান। আগে অনেক সময়েই দুই বন্ধুতে এই বাড়িতে আসত। ও এলে যমুনার গা-পিত্তি জ্বলে যেত।·· এমন করে তাকায় বা হাসে বা এক চোখ ছোট করে যে, যমুনার চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করতে ইচ্ছে করে। ও কিছু না বোঝার মুখ করে থাকে অবশ্য। আর সেটাই সত্যি ধরে নিয়ে ওই ফণীর সঙ্গে এই বোকাও হ্যা-

হ্যা করে হাসে।

ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলে ওই ফণী হারামজাদা একদিন বলেছিল, তুই হলি গিয়ে আমাদের পানুর চিড়িয়া, তোকে আর কিই বা বলি বল,—

বোকা মুখ করে যমুনা বলেছিল, পানুর চিড়িয়া মানে! চিড়িয়া তো পাখি!

ও হেসে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে।—হ্যাঁ, খুব মিষ্টি পাখি।

পাখি হয়ে যমুনার ওর চোখ দুটো ঠুকরে দিতে ইচ্ছে করেছে। মুখে ঝাঁঝালো জবাব দিয়েছে, অঙ্ক কষাতে বসে তোমার সাগরেদ (দাদা চলে যাবার পর এই নচ্ছারের সাগরেদই হয়ে বসেছে বটে) তো আমাকে ধিঙ্গি মেয়ে ধিঙ্গি মেয়ে করে—আমি তাহলে পাখি না শকুনি?

— আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—তুই কত মিষ্টি পাখি নিজেই জানিস না। এক চোখ ছোট করে পানুদার দিকে তাকিয়েছে।—ওকে তাহলে খুব কষে অঙ্ক কষাচ্ছিস তুই? হিসেব-পত্র মাথায় ঢুকছে?

দু'জনেরই হ্যা-হ্যা হাসি। একটুও ভালো কথা নয় এটুকু বোঝার বুদ্ধি অন্তত যমুনার আছে।···হাড়-পাজি ওই ফণী শিকদার কলকাতায় চলে গেল বলে এই বাবুর কি মন খারাপ! হবে না, শয়তানির দোসর যে! ওরা কলকাতায় বদলি হয়ে গেল শুনে যমুনার যা মনে হয়েছিল সাহস করে সেটা আর মুখ ফুটে বলতে পারেনি। মনে হয়েছিল এবারে হাড় জুড়লো।···পানুদাব থেকে এক ক্লাস ওপরে পড়ত। ফেল করে ক্লাস-ফ্রেণ্ড হয়েছে। ওর বাবা রেলে চাকরি করে। বড় কিছু নয়, ছোট চাকরিই। টেস্ট পরীক্ষা তখন সামনে, এ-সময়ে আর কলকাতার নতুন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয় কি করে। কয়েকটা মাস কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছে, আর যেদিন খুশি প্রাণের বন্ধুর কাছে থেকে গেছে। টেস্ট পরীক্ষার পরেও সপ্তাহের মধ্যে চার-পাঁচদিন কলকাতা থেকে সকাল এগারোটার মধ্যে শ্যামনগর চলে এসেছে। কি না, দুই বন্ধুতে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া পড়বে। বাপের রেলের চাকরি। ওর আর আসতে-যেতে অসুবিধে কি। পয়সা তো লাগে না। কি পড়াই না

পড়েছে দুজনে একসঙ্গে যমুনা খুব ভালো করেই জানে। এখন এসে কান্নাকাটি, পরীক্ষায় পাসের জন্য কালী মায়ের কাছে প্রার্থনা কর। ফেল করুক—দু'জনেই ফেল করুক! বড় বেশি দেমাক হয়েছে।

...অঙ্ক কষাতে এলে এই ছেলেই আবার কড়া মাস্টার। একটু অন্যমনস্ক হলে বা এ-দিক ও-দিক তাকালে ঠ-ক করে মাথায় পেন্সিলের মার একবার দেখিয়ে দেবার বা বলে দেবার পরে আবার ভুল করলেও তাই ওর হাতের বাড়তি লম্বা পেন্সিলটা যেন যমুনার মাথার ঘিলু নড়িয়ে দেবার জন্য। আর মাথায় হাত দেওয়া বা মাথায় মারাটাই যমুনার স থেকে অসহ্য। কত দিন রেগে গিয়ে বলেছে, আমার মাথায় হাত দেবে না বলছি খবরদার! মাথায় যন্ত্রণা হয়—বাবাকে বলে আমি তোমার কাছে অঙ্ক শেখা বন্ধ করে দেব!

মাথায় মারা কমিয়েছে। তার বদলে বেশ জোরে গাল খিমচে ধরে টানে, কাঁধের মাংস খাবলে ধরে টানে। এই শাস্তি যে কেবল অঙ্ক না পারার জন্যেই নয়, এর পিছনে শয়তানি আর হাতের সুখের ব্যাপার আছে যমুনা সেটা আঁচ করতে পারে। যমুনা বেশি রেগে গেলে হাসে বলে মাথায় মারব না গায়ে হাত দেব না, এদিকে দিনকে-দিন যত ধিঙ্গি হচ্ছিস মাথা ততো কাঁচা হচ্ছে—তোকে নিয়ে কি করব?

অসহ্য হলে যমুনাও গজরে ওঠে, আমি ধিঙ্গি হই আমার মাথা কাঁচা হোক তাতে তোমার কি? তোমার কাছে আর আমি অঙ্ক শিখব না!

—তোর ঘাড় শিখবে, স্কুলের মধ্যে আমি অঙ্কের সেরা ছাত্র, আমার হাতে পড়েও তুই অঙ্কে ফেল করবি বা অঙ্ক শিখবি না আমি সেটা সহ্য করব? কাকা বারণ করলেও আমি তোকে রাস্তায় ধরে অঙ্ক শিখিয়ে ছাড়ব—কে ঠেকায় দেখি! আমার ওপর মেজাজ দেখাতে এলে মরবি।

এই পাজি এ-ও যে পারে যমুনা অবিশ্বাস করে না। রাস্তায় ধরে পড়াতে না পারুক, অঙ্ক শেখাতে না পারুক, গোঁ চাপলে নাজেহাল করে ছাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। দাদা নেই, দুনিয়ায় আর এই ছেলে কার পরোয়া করে? কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হলে যমুনার আবার নিজের ওপরেই রাগ হয়। অঙ্কে ওর মাথাটা এত কাঁচাই বা কেন? জল-ভাতের মতো

করে বুঝিয়ে দেবার পরেও ভুল হয় কেন ? তাছাড়া পানুদার অঙ্কের মাথা কত সাফ তা-ও স্বীকার করতেই হয়। যমুনার কাছে যত কঠিন আর দুরূহই হোক, ও তা মুখে মুখে করে ফল বলে দেয়। ওর যদি মুখের গালাগাল আর হাত একটু কম চলে তাহলে যমুনা হয়তো আর একটু ভালো করে শিখতে পারে। অঙ্কের জুজুবুড়ীর ভয় তো কাটিয়ে উঠতেই হবে—ম্যাট্রিক পাস না করা পর্যন্ত অঙ্ক থেকে রেহাই নেই। ম্যাট্রিকটা তো যে-ভাবে হোক পাস করতেই হবে, তারপর আই-এ, বি-এ ও পাস করতে হবে না ? দাদা নেই, যমুনা পাস-টাসগুলো না করে বেরুলে বাবার পিছনে কে দাঁড়াবে ? কিন্তু অঙ্কের জ্বালায় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উতরোতে না পারলে তো সবই গেল। তাই পানুদার অত্যাচার আর বজ্জাতি যতক্ষণ পারে মুখ বুজে সহ্য না করে উপায় কি।

কিন্তু আজ সব সহ্যের শেষ। কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম থেকে উঠেছিল কে জানে। পড়াতে শুরু করেই শয়তানের মাথায় বজ্জাতি চেপে ছিল কিনা কে জানে। নইলে এক অঙ্ক দু'তিন বার ভুল তো কতদিনই হয়। তার জন্য একটু-আধটু অত্যাচার আর চোখা-চোখা হুল ফোটানো কথাও শুনতে হয়। কিন্তু আজ একবারের ভুলেই ওই পাজি—খাতাটা জোরে মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। যমুনার কম লাগেনি। মেজাজ ঠাণ্ডা করে ফের আবার শুরু করতে সময় লাগবে না তো কি ? কিন্তু তার তর সইলো না। চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করল, বসে আছিস যে ? এবারে ঠিক না হলে তোকে আমি আস্ত রাখব— !

যমুনা মাথা গোঁজ ক'রে বসে থাকল।

হাত বাড়িয়ে একদিকের গাল খিমচে ধরে টানতে চেষ্টা করতেই ওর হাতের ওপর যমুনা গায়ের জোরেই একটা ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল।

এতবড় প্রতিবাদ এই প্রথম। পাজিটার চোখ লাল হতে লাগল।

আরো বড় রকমের হামলার লক্ষণ দেখেই যমুনা আত্মরক্ষার চেষ্টায় চাপা গর্জন করে উঠল, চোখ পাকিয়ে দেখছ কি—তোমার শয়তানি আমি বুঝি না, কেমন ? অঙ্ক না পারলেই গালে হাত দাও, কাঁধের মাংস খিমচে টানো —মেয়েছেলের গায়ে এ-ভাবে হাত দিতে তোমার লজ্জা করে না ? বলব বাবাকে ?

যমুনার মনে হয়েছিল মুহূর্তের জন্য মুখ কালো দেখল একটু। তার-পরেই সেয়ানার মতো জবাব।—মাথায় গোবর বোঝাই, ধিঙ্গি মেয়ে ক্লাস ফাইভে পড়িস—উনিশ গড়াবে ম্যাট্রিক পাস করতে—লজ্জা করে না ? এরই মধ্যে মেয়েছেলে বলে টনটনে জ্ঞান—আমি মেয়েছেলে বলে তোর গায়ে হাত দিই ?

—একশ বার দাও—আগেও আমাকে কথায় ভুলিয়ে অনেকবার অনেক ভাবে গায়ে হাত দিয়েছ—আমি তোমার বজ্জাতি বুঝি না ভেবেছ ? সব-সময়ে ধিঙ্গি মেয়ে ধিঙ্গি মেয়ে করতে তোমার লজ্জা করে না ? আমি উনিশে ম্যাট্রিক পাস করব আর তুমি কতোয় করবে ? তোমার আঠারো হল না ? ভারী তফাৎ একেবারে—দাদার মতো ষোলয় ম্যাট্রিক পাস করতে, আঠোরোয় আই-এ পাস করে বি-এ ক্লাসে পড়তে—তাহলে মুখ নেড়ে কথা বলার মুরোদ বুঝতাম—

এর জবাবে কি কাণ্ড হবে যমুনা কি ভাবতে পেরেছিল ?···চেয়ার ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালো। হামলাটা কোন পর্যায়ে গড়াবে বুঝতে না পেরে যমুনাও চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল।

—উঃ !

দু'হাতে মাথা চেপে ধরল, কপালটা ঠক করে টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখছে। মাথার ঠিক মধ্যিখানে এত জোরে গাঁট্টাটা খেয়ে মগজ বুঝি চৌচির হয়ে গেল। টেবিলে মুখথুবড়ে পড়ার পরেও রেহাই নেই। পিঠের ওপর শিরদাঁড়া ভেঙে যাবার মতোই একটা কিল।

মেরেই ফেলতে পারে ভেবে এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও যমুনা চেয়ার ছেড়ে পাঁচ হাত দূরে সরে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো। চোখে এখনো

ঝাপসা দেখছে।

—আমার হাতেই তোর মরণ লেখা আছে জেনে রাখিস। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সেই গাঁট্টার চোটে মাথাটা এখনো টনটন করছে বটে, কিন্তু ব্যথা আর অত নেই। না থাকলেও কিছু একটা অচেনা যন্ত্রনা যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দাদা চলে যাবার পর এই আর একবার ও আলো-বাতাস শূন্য অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। খেতে আর ভালো লাগছে না। মুখ-হাত ধুতে ধুতে বার কয়েক জোর দিয়েই বলল, করুক করুক—এ বছরটা অন্তত ফেল করুক—একটা বছর ফেল করতে ও উনিশেই ম্যাট্রিক পাস করবে—তখন আর বয়েস নিয়ে খোঁচা দেবার মুখ থাকবে না—বেশ করেছে এমন প্রার্থনা করেছে, আরো ভালো করে করা উচিত ছিল—ইঃ, অন্তত সেকেণ্ড ডিভিশনে পাসটা না করতে পারলে বারোটা বেজে যাবে—দাদা ঠেঙিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে! ওর দাদা কত ভালো মানুষ যমুনা যেন জানে না—ঠেঙিয়ে বার করে দেওয়াই উচিত, কিন্তু ওর দাদা কিছুই করবে না, দু'চারটে চড়-চাপড় লাগাবে আর মুখে হম্বি-তম্বি করবে—শাসন থাকলে এমন ছেলে তৈরি হয়!

নিজের ঘরে এসে গুটিশুটি শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আর আসে না। ··একটা ভুল হয়ে গেছে, একই সঙ্গে ওই ফণী হারামজাদার ফেল করাব প্রার্থনাও করে আসা উচিত ছিল। পানুদা ফেল তো করবেই কিন্তু ফণীটা যদি পাস করে যায়? মরুকগে, মা-কালী ওর মনের কথা ওর থেকেও ভালো জানে।

এ-পাশ ও-পাশ করেও ঘুম আর সহজে আসে না যমুনার। বার বার মনে হচ্ছে কি একটা অন্যায় করেছে। তক্ষুনি আরো বেশি রাগ হচ্ছে। ও অন্যায় আবার কি করতে পারে—মা-কালী ওকে কক্ষনো কিছু অন্যায় করতে দেবে?

একটা অস্বস্তি নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। সামনে দাদা। হেসে হেসে বলছে, এই মেয়ে—কি বোকার মতো করলি বল্ তো?

যমুনা বিষম রাগে ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমি বোকার মতো করলাম, আর

ও দিনের পর দিন কি অত্যাচার করে যাচ্ছে তা দেখছ না—তোমার চোখ নেই ?

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। প্রায় সকাল। মেঝেতে সোনাপিসি তার বিছানায় বসে। বলল, কি রে মেয়ে, গোঁ-গোঁ করছিস কেন, ভোর রাতে কিছু স্বপ্ন দেখে উঠলি বুঝি ?

যমুনা আবার ধুপ করে শুয়ে পড়ল। চোখের ঘুম গেছে। গা-টা কাঁপছে। দাদার হাসি-হাসি মুখ এখনো যেন চোখের সামনে, কথাগুলো কানে লেগে আছে।

মনটাই খারাপ হয়ে আছে তারপর থেকে। দিনের আলোয় আর সকালের বাতাসে রাতের রাগ চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারছে না। স্বীকার করতে আপত্তি, কিন্তু ভিতরে কেউ বলে চলেছে রাতে কাজটা ও ভালো করেনি। ফলে রাগ বেড়েই চলেছে। স্নানের পর পুজোর ঘরের দিকে পা এগোতে চায় না। মা-কালীকে শয্যা থেকে তুলতেই মনে হল ঠাকরোন ওর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে আর দাদার মতোই মিষ্টি করে ওর দোষ ধরছে। পট হাতে যমুনা এবারে সত্যি সত্যি রেগে গেল। জিভ ভেঙচে বলে উঠল, বেশ করেছি—বেশ করেছি, আমাকে মেরে ফেললেও আমি কেবল মুখ বুজে সহ্যই করব—না ? আর আমারই যদি দোষ হয় তো সে-প্রার্থনা তোমার শোনার কি দায় পড়েছে—ফেল করানোর বদলে গুণের ছেলেকে একেবারে স্কলারশিপ পাইয়ে দাও না কেন ? আমার সঙ্গে লাগতে এলে আমি এবার থেকে এই রকমই করব – বুঝলে ?

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রে—অ্যাঁ ? রাত থাকতে স্বপ্ন দেখে গোঁ-গোঁ করে কি সব বললি, এখন আবার কালীর পট হাতে নিয়ে কাকে বকাবকি করছিস—হল কি তোর ?

রাগের চোটে পট হাতে ঘুরে বসল। কথা বলার ইচ্ছে নেই, কারো মুখ দেখারও ইচ্ছে নেই। নিজের মনে দুটো কথা বলবে তারও কি জো আছে !

তার পরেও মেজাজ তেতেই থাকল। ছুটির দিন হলে যমুনা নিজেই মোটামুটি সব রান্না করে। বাজারের মাছ তো আর কেনা হয় না, ছুটির

দিনে বাবাকে একটু মাছ খাওয়াতে ইচ্ছে করে, তাই ছিপ বা ছোট জাল হাতে করে বাড়ির লাগোয়া ঘাটে চলে যায়। কিছু না কিছু মাছ ধরে আনেই। আজ ছুটির দিন নয়। পিসির রান্না। বই নিয়ে বসার আগে আধঘণ্টাখানেকের জন্য এসে পিসিকে একটু সাহায্য করে। কুটনো কুটে বা বাটনা বেটে দেয়। পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে যমুনা আজ ও-দিক মাড়ালো না। পিসির গজগজানি কানে আসতেও না। আবার পড়ার বই হাতে নিয়ে ইচ্ছে করল সব ছিঁড়ে ফেলে দেয়। বই রেখে বঁড়শী আর টোপের মশলা হাতে ঘাটের দিকে পা বাড়ালো। তাতেও বাধা।—এখন মাছ ধরতে চললি কি, আজ তোর বাবার স্কুল নেই?

যমুনা ঝাঁঝিয়ে উঠল, বাবার স্কুল আছে তো আমার কি—আমি কাউকে আটকে রেখেছি?

হন-হন করে ঘাটে গিয়ে বসল। পনেরো মিনিটও ভালো লাগল না। ওর মেজাজ বুঝে ছোট মাছগুলোও যেন দূরে সরে আছে। জুলাইয়ের গরমে সমস্ত মুখ তেতে উঠেছে। হয় ঝম-ঝম বৃষ্টি, নয়তো গা-পোড়ানো রোদ। বঁড়শীটা তুলে শপাশপ জলের ওপর কয়েক ঘা বসিয়ে উঠে এলো। মাছ ধরবে বলে ঘাটে গিয়ে বসলে মাছ না নিয়ে ফেরে না বড়। বঁড়শীতে না পেলে জাল এনে ধরে। আজ সে ইচ্ছেও নেই। দুপদাপ পা ফেলে ফিরল, নিজের ঘরে এসে বসে রইলো।

বাবা তার সময়মতো স্নান আহ্নিক আর খাওয়া সেরে স্কুলে যাবার জন্য রেডি। একই সময়ে স্কুল হলেও বাবা মিনিট দশ পনেরো আগে বেরোয়। কিন্তু খেতে প্রায় একই সঙ্গে বসে। কিন্তু তার খাওয়া শেষ হতেও মেয়ে এলো না দেখে পিসিকে জিগ্যেস করল, যমুনার আজ স্কুল নেই?

সোনাপিসির জবাবও কানে এলো যমুনার।—কি জানি বাপু, সেই ভোররাত থেকেই তো মেজাজে ফুটছে দেখছি, কালীর পট হাতে কাকে বকাবকি করছে শুনলাম, পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে বঁড়শী হাতে দুমদাম মাছ ধরতে গেল, ফিরে এসে আবার গুম হয়ে ঘরে বসে আছে—

এত ঠাণ্ডা মেয়ে মেজাজে ফুটছে এ-কথা বাবা বিশ্বাস করে কি করে?

তার দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক।—গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিলি, জ্বর-টর এলো না তো?

—হুঁঃ! পিসির গলার বিরক্তিসূচক একটা শব্দ বেরুলো শুধু।

ঘরে বসেই যমুনা পিসির উদ্দেশে জিভ ভেঙচালো।

খাওয়া সেরে বাবা এই ঘরে এলো।—কি রে, খেতে বসলি না যে, স্কুলে যাবি না?

বাবা কাছে আসতে কেন যেন কান্না পাচ্ছে যমুনার। কিন্তু কে আর কবে ওকে কাঁদতে দেখেছে। কান্না পায়ই শুধু, চোখে ভাঙে না। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, না, আজ যেতে ইচ্ছে করছে না।

স্কুল থাকতে এমন কথা যমুনা কোনদিন বলেছে কিনা সন্দেহ। বাবা তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাত দিয়ে কপাল পরীক্ষা করল।—গা তো ঠাণ্ডা দেখছি, পেট-টেট কামড়াচ্ছে নাকি?

এমন ভালো মানুষ বাবার ওপরেও রাগ হচ্ছে যমুনার। আর জেরা না করে স্কুলে রওনা হলে বাঁচে। কোথায় কামড়াচ্ছে ও কি করে বলবে? —আমার কিছুই হয়নি, ইচ্ছে করছে না তাই যাব না—হল? তারপরেই গলার সুর পাল্টে জিগ্যেস করল, আচ্ছা বাবা, আজ ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুচ্ছে শুনলাম—সত্যি?

—কি জানি, বেরুতে পারে, সময় তো হয়েছে···তোকে কে বলল?

যমুনা ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, যার মাথাব্যথা সেই কাল মাঝরাতে এসে বলে গেল—ঝোলাঝুলি নিয়ে রেজাল্ট আনতে আজ ভোরের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেছে—

—কে? ও পানুর কথা বলছিস···মাঝরাতে এসে বলে গেল কি রে!

যমুনা শুধরে নিল, তোমার আর পিসির কাছে সেটা মাঝরাত।

—তা তুই কি পানুর রেজাল্টের দুর্ভাবনায় মুখ শুকিয়ে বসে আছিস নাকি!···কেবল সংস্কৃত বাদে সবেতে তো ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে শুনলাম, পাস করে যাবে'খন।

যমুনার ধারণা, তিনটে মাস ধরে যে পড়া পড়েছে বাবু, এক অঙ্ক বাদে সব পরীক্ষাতেই ফেল করবে। এক অঙ্ক বাদে আর সবেতে ফেল

করলে যমুনা আক্কেল দেখত। গজগজ করে বলল, ছাই পাস করবে, আমি বলে দিলাম ধেড়িয়ে আসবে—দেখে নিও।

এত জোর দিয়ে বলল যে বাবা অবাক একটু।

—একবার ফেল করে শিক্ষা হওয়া উচিত—বুঝলে? মুখ খোলার পর যমুনার মেজাজ তোড়ে আছড়ে পড়ছে।—তোমার কাছে এসে সংস্কৃত পড়ার কথা—আট মাসের মধ্যে ক'দিন তোমাব কাছে এসে বসেছে? বাবু কেবল দাপটে আমাকে অঙ্কে দিগ্‌গজ বানিয়ে চলেছে—মা-কালীর চোখ নেই, সে সব দেখছে না? যার যা পাওনা তাকে তা পেতে হবে না—আমি প্রার্থনা করলেই বা কি না করলেই বা কি?

বাবা হাঁ কবে খানিক মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আর কিছু না বলে চলে গেল।

যত বেলা বাড়ছে যমুনার ছটফটানিও বাড়ছে। ভিতর থেকে কেউ বলেই চলেছে ও কাজটা ভালো করেনি। যে যত দোষই করুক মা-কালীর কাছে কারো অমঙ্গল চাইতে নেই এ তো দোষই নিজেও জানে।...অত রাগ যখন হয়েই ছিল কোনো প্রার্থনা না কবলেই তো হত। ফেল করুক বা পাস করুক যমুনাব কোনো দায় থাকত না। এখন ফেল যদি করে—কববে তো জানা কথাই, যমুনার নিজেরই মনে হবে ওর জন্যই পানুদা ফেল করল। আরো খারাপ লাগছে, যত পাজিই হোক বিপাকে পড়ে আশা নিয়ে ওর কাছেই অত রাতে ছুটে এসেছে, আর যমুনা খুব ভালো করে পাসের প্রার্থনা করবে এই আশা নিয়ে গেছে। তার মধ্যে ও যা করে বসে আছে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি। খুব—খুব খারাপ কাজ না হলে দাদা স্বপ্নের মধ্যে ও-রকম বলে গেল কেন...। যমুনার নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। না-হয় মেরেই ছিল মাথায়, আর খুব জোরে মেবেছিল এটাও সত্যি—তবু এখন কি আর মাথায় সে-ব্যথা লেগে আছে? কিন্তু যমুনা যা করে বসল তার যন্ত্রণা তো চিরকাল লেগে থাকার মতো। পানুদা কিছু জানবে না বটে কিন্তু যমুনা ভুলবে কি করে?

বেলা গড়িয়েই চলল। কত বার যে ঘর-বার করছে ঠিক নেই। বেলা

দুটো আড়াইটে বেজে গেল এখনো টিকির দেখা নেই কেন? শিয়ালদা থেকে ট্রেনে ইছাপুর বা শ্যামনগর কতক্ষণের বা পথ—বড়জোর আধঘণ্টা। হয়তো এসেছে, কোনো বন-বাদাড়ে গিয়ে বসে আছে। অনেকবার ভেবেছে একবার কাজিতলা গিয়ে খোঁজ নেয়। কিন্তু ফেল করে বাড়িতে আসবে কোন্ মুখে? ওর দাদার ভয় ও খোড়াই করে, তবু চোখের পাতা বলে তো সকলেরই কিছু আছে। ফেল করি-করি করেও তো সত্যিই ফেল এ পর্যন্ত একবারও করেনি। নিজেকে চড়িয়ে শেষ করতে ইচ্ছে করছে যমুনার—এই প্রথম ও ফেল করবেই আর সেটা করবে যমুনার অমন প্রার্থনার জন্য।

বেলা তখন প্রায় চারটে। ছোট জানালার সামনে যমুনা বাইরের মাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুই চক্ষু স্থির। মাঠ ভেঙে ঢ্যাঙা মূর্তি লম্বা লম্বা পা ফেলে এ-দিকেই আসছে। শ্যামনগর স্টেশন থেকে সোজা এ-বাড়ি আসতে হলে এটাই শর্ট-কাট।···হাতে একটা একটু বড় সাইজেরই ডালি। যমুনা তাড়াতাড়ি নিজের দু'চোখ কচলে নিয়ে বড় করে তাকালো। না, ভুল না, ঠিকই দেখছে। হাসতে হাসতেই আসছে। আর হাতের ওটা মিষ্টির ডালি।

···তাহলে কি পাস করেছে? এমন অসম্ভব ব্যাপার যমুনা বিশ্বাস করে কি করে? আর পাস না করলে মুখে হাসি কেন, হাতে মিষ্টির ডালি কেন? ···যত কাছে আসছে মুখে হাসি যেন ধরে না। যমুনা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে।

—যমুনা! মেরে দিয়েছি রে! থ্রি-চিয়ারস্ ফর মা-কালী—একেবারে ফার্স্ট ডিভিশন, তার ওপর কম্পালসারি ম্যাথ্ আর মেকানিক্স-এ লেটার!

দাওয়া থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে সামনে এসে দাঁড়ালো।

স্কুলে পড়ে, ফার্স্ট ডিভিশন ছেড়ে লেটার কাকে বলে যমুনা জানবে না কেন? একশয় আশি পেলে তবে লেটার হয়।···তার মানে কম্পালসারি অঙ্কে আর মেকানিকস্-এ আশি বা তার ওপর নম্বর পেয়েছে।

—কি রে, এমন ববে চেয়ে আছিস কেন? একেবারে হাঁ হয়ে গেলি যে! নে এই ডালিটা ধর, আসার সময় স্টেশন থেকে তোর মা-কালীর

পুজোর জন্য ভালো মিষ্টি কিনে নিয়ে এলাম—রাতে পুজোর সময় কাকাকে বলবি মা-কে দিতে—তুই এমন বোবা মেরে গেলি কেন—ধর ?

যমুনার বুক ঠেলে কান্নার মতো কিছু গলার কাছে দলা পাকচ্ছে। হাত ধুয়ে আসার অছিলায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। কুয়োতলায় এসে হাত শুধু নয়, চোখে-মুখেও জলের ঝাপটা দিল। তারপর শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে এসে মিষ্টির ডালিটা নিল। পুজোর ঘরের দিকে চলল। পিছন পিছন পানুও চলল।—চল্, তোর সঙ্গে আমিও গিয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে আসি—তোর মা-কালী খেল্ দেখালে বটে একখানা।

শিকল খুলে এক হাতে মিষ্টির ডালি হাতে যমুনা পুজোর ঘরে ঢুকল। পা দিয়েই কালীর পটের দিকে চোখ গেল। স্পষ্ট মনে হল মা-কালী মিটিমিটি হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে ভোররাতের স্বপ্নে দাদার হাসি মনে পড়ল। সে-ও যেন অনেকটা এই গোছের মজাতে হাসি। আজ সবাই ওর সঙ্গে মজা করছে···।

—মা মা-গো—যমুনার ওপর তোমার এত দয়া বলেই আজ আমি এ-ভাবে তবে গেলাম—এবার থেকে আমাকেও তুমি ওর মতো একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা দাও ! উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে পানু সরবে প্রার্থনা করেছে। যমুনা স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে দেখল। শুনল। মিষ্টির ডালিটা মায়ের আসনের সামনে রেখে প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পানু হাসিমুখে জানান দিতে দিতে ঘরে ঢুকল, ফণীটাও থার্ড ডিভিশনে পাস করে গেছে, বুঝলি—দুপুরে ওর বাড়িতে ফিস্ট হল—এই জন্যেই সকালে আসতে পারলাম না—

মুখের দিকে চেয়ে থমকালো একটু।—তোর কি হয়েছে বল্ তো, এমন একটা খবর শোনার পরেও মুখে হাসি নেই কথা নেই—অথচ তোর প্রার্থনার জন্যেই এমন আশ্চর্য কাণ্ডটা হল—নইলে আমি তো কাঁপতে কাঁপতে রেজাল্ট জানতে গেছলাম—এই, কি হয়েছে বল্ না ?

—কি আবার হবে, কিছু হয়নি।

মুখের দিকে চেয়ে পানু আবার থমকালো।—আমি তো পুজোর জন্য

মিষ্টির ডালি এনেছিলাম পিসির হাতে দেব বলে—তোর তো এ-সম
স্কুলে থাকার কথা—স্কুলে যাসনি ?

—গেছি কিনা দেখছ না ?

—কেন যাসনি ?

—আমার খুশি যাইনি, তোমার তাতে কি ?

—ও ববা-বা, দারুণ মেজাজ দেখি তোর—কাকা বকেছে বুঝি ?

—কি ? বাবা কি তুমি যে মেয়েছেলেকে বকা-ঝকা করবে—গা
হাত তুলবে !

আবারও থমকালো। এই যমুনাকে কেমন নতুন নতুন লাগছে।
ওকে নিয়ে আজ কি যাচ্ছেতাই ঠাট্টাই না করেছে ফণীটা। পাস করা
আনন্দে ও কাঁসি হারিয়ে বসেছিল। ওর কথা শুনে পানুর পর্যন্ত কা
গরম মুখ লাল। এক নজর ভালো করে চেয়ে দেখল। কাল রাতে
ব্যাপারটা ভুলেই গেছল।···একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিল, যমুনা
রাগ হতেই পারে। তবু মেয়েটা এত ভালো যে তারপরেও মা-কালী
কাছে ওর জন্য প্রার্থনা করেছে।

হেসে বলল, তুই একেবারে ছেলেমানুষ, এখনো সেই রাগ নিয়ে ব
আছিস ! আমার তো মনেও নেই, ট্রেনে বসে আমি তোর কথা ভাবে
ভাবতেই এলাম, তোর কত ক্ষমতা, তুই রেগে থাকলে তো আমার সর্বনা
রে ! শোন্, এখন আমি বাড়ি গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি, বউদি নিশ্চ
সকাল থেকেই ছটফট করছে আর যাদের যাদের ভালো খবর আ
তাদেরও জানিয়ে আসি—রাতে কাকার পুজো হলে প্রসাদ নিতে তে
আসবই, তখন কথা হবে। আজ আর অঙ্ক নয়, কেবল গল্প—বুঝলি ?

চলে গেল।

যমুনার বুকের ওপর থেকে যেন একটা মস্ত পাথর সরে গেছে। ও
প্রার্থনা না শুনে মা-কালী ওর মুখরক্ষা করেছে।···নিজের গুণে ফাস্ট
ডিভিশনে পাস করেছে, ফেল করলেও নিজের দোষেই করত। কিন্তু ফেল
করলে যমুনা ভাবত ওর জন্যেই ফেল করল, মা-কালীর কাছে প্রার্থন
করে একজনের ক্ষতি করে দিল। সেটা একটা ঘায়ের মতো মনে লেগে

থাকত। কোনদিন ভুলতে পারত না। ওর প্রার্থনা ফলেনি বলে রাগ বা দুঃখ হওয়া দূরে থাক, বরং মনে হচ্ছে ও একটা মস্ত অপরাধের অভিশাপ থেকে বেঁচে গেল।

···কিন্তু আশ্চর্য, যমুনার একটুও আনন্দও হচ্ছে না কেন? একটা বিষম চাপা অশান্তি গেছে বটে, কিন্তু স্নায়ুগুলো এখন কেমন আবার টান-টান হয়ে আছে। মনে হচ্ছে খানিক বসে কাঁদতে পারলে ওগুলো আবার নরম আর স্বাভাবিক হত। না, কান্না পেলেও যমুনা কাঁদতে পারে না।··· পানুদা দু'দুটো লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে বলে ওর আনন্দে আটখানা হবার কারণ নেই। প্রার্থনা ফলল না বলে খুব—খুব স্বস্তি বোধ করছে বটে, কিন্তু আনন্দ একটুও হচ্ছে না। হবে কেন? ও তো পাজির পা-ঝাড়াই একটা। এরপর আরো লায়েক হবে, মায়ের হাত আরো গজাবে। সেজন্যে নয়, যমুনার খারাপ লাগছে, কান্না পাচ্ছে অন্য কারণে।···এত দিন বাদে স্বপ্নে জলজ্যান্ত দাদাকে দেখল, কিন্তু হাসিমুখে হলেও আসলে দাদা তো ওকে বকেই গেল। সকালে প্রথম কালীর পট হাতে তুলতেই মনে হয়েছে, হেসে হেসে মা-কালীও ওকে বকছেই।··· দু'জনেই ঠিক করেছে, অন্যের খারাপ চাইলে এরকম বকাই উচিত।

এই বকুনি একটুও অসহ্য নয়। খুব আপনার জনই এ-রকম করে বকে। তাতে ভালো ছেড়ে মন্দ কিছু হয় না। এত খারাপ কেন লাগছে যমুনার কাছে একটু একটু করে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।···একটা মস্ত মিথ্যেকে ওই শয়তান পানুদা সত্যি ভেবে বসে আছে। ভাবছে যমুনার কেরামতিতেই এমন অসম্ভব ব্যাপারখানা সম্ভব হল। হয়তো বাড়ি গিয়ে ওর বউদিকেও এ কথাই বলবে। আনন্দে ফুলে ফেঁপে হয়তো ফণে হারামজাদাকেও এ-কথাই বলেছে। যমুনাকে নিয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে এ তো নিজের মুখেই বলে গেল। এত বড় মিথ্যেটার সঙ্গে সরাসরি মা-কালীর সম্পর্ক। পানুদা ফেল করলে যমুনা কি প্রার্থনা করেছিল কোনদিন তা সে জানতে পারত না। কিন্তু এখন এতবড় মিথ্যেটাকে ও হজম করে বসে থাকে কি করে? এ তো অন্যের পাওনা নিজের বলে চুরি করার মতো বিচ্ছিরি। ভাবতে গিয়ে মাথার ভিতরটা দপদপই করছে

যমুনার।

বাবা স্কুল থেকে ফিরল। জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে জিরোতে বসল। যমুনার বাবার সামনেও যেতে ইচ্ছে করছে না, কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু সোনাপিসি আবার এ-সময় পাড়া টহল দিতে বেরোয়। গরমের দিনে বাবার বিকেলের খাওয়া চিড়ে-দই-কলা। একটা বাটিতে তার খাবার নিয়ে যমুনা বাবার ঘরে এলো।

চিড়ের বাটি হাতে নিয়ে বাবা বলল, স্কুলেও তো শুনলাম আজ ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে, সিনেটে সকালে লিস্ট টাঙিয়ে দিয়েছে—পান্নুর কোনো খবর পেলি ?

খরখরে গলায় যমুনা জবাব দিল, পেলাম।···রাতে মা-কালীর কাছে পুজো দেবার জন্য তোমার পুজোর ঘরে একগাদা মিষ্টি রেখে গেছে·—ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে—অঙ্কে আর মেকানিক্স না কিসে লেটার পেয়েছে···হাওয়ায় উড়ছে এখন।

খাওয়া ভুলে বাবা হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। বিশ্বাস হতে চায় না যেন। তারপর শুকনো মুখ হাসিতে ভরাট একেবারে।—বলিস কি রে - অ্যাঁ ? মাস্টারমশাইরা তো ওকে পাসের মধ্যে ধরবে, না ফেলের মধ্যে ভেবে পায়নি—ফার্স্ট ডিভিশন আবার দু'দুটো লেটার।

আনন্দে বাবার চিঁড়ে-দই আজ যেন বেশি উপাদেয় লাগছে। দু'তিন চামচ মুখে দিয়ে তল করার পর আবার বলল, আমার বরাবরই মনে হয়েছে অত দুরন্ত হলে কি হবে, ভিতরে সোনার ছেলে—তোর দাদা কি সাধে ওকে অত ভালবাসত—সে-ও বলত পানু খুব ভালো ছেলে, যেমন সাহস তেমন বুদ্ধি।···তা ও তো সংস্কৃতর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচল, তোর তো অঙ্কের ফাঁড়া কাটতে এখনো ঢের দেরি—এত ভালো অঙ্কের মাথা পান্নুর—ওকে ধরে ভালো করে শিখে নিচ্ছিস না কেন···।

সর্বাঙ্গ জ্বলেই গেল বুঝি যমুনার। তপতপে মুখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, ভালো পাস করল আর ওমনি ও তোমার কাছে সোনার ছেলে হয়ে গেল ? ওই পাজি নচ্ছারকে ভালো করে ধরব আমি ? আজ সন্ধ্যার পরে এলে তুমি ওকে সাফ বলে দেবে আর আমি ওর কাছে অঙ্ক করব না—

অঙ্ক শিখব না! কাল থেকে অঙ্ক শেখাতে এলে আমি তোমার ঘরে এসে বসে থাকব—বুঝলে?

কিছুই না বুঝে বাবা হাঁ।—সকাল থেকে আজ তোর কি হয়েছে বল্ তো?

—ছাই হয়েছে। অঙ্কের দেমাকে এমনিতেই মাটিতে পা পড়ত না, এখন দুটো লেটার পেয়ে চারটে পাখা গজাবে আর মাটি ছেড়ে বাতাসে উড়বে—ওকে এরপর ধরে বেঁধে টেনে নামাতে গেলে আমি আস্ত থাকব? এমনিতেই বলে, আমার মাথার ঘিলু—

শেষটুকু বলে উঠতে পারল না। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। অঙ্ক শেখাতে এসে ওই পাজি গায়ে হাত দেয়, সুবিধে না পেলে চোখে অন্ধকার দেখার মতো করে মাথায় মেরে বসে—এ কথাটা বলতে গিয়েও বলা হল না। না বলতে পেরে যমুনা রাগে আরো বেশি ফুটছে। কেন বলল না—বাবাকে বলা উচিত ছিল।

এত ঠাণ্ডা মেয়েটার এই মূর্তি আর এ কথা শুনে বাবা হতভম্ব। খাওয়া শেষ করে বাটি আর গেলাস হাতে বেরিয়ে এলো। বাবা উঠে এলো বলে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যমুনা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বাটি গেলাস নিল। তারপরেই তার কথা শুনে মনে হল গায়ে কেউ জল-বিছুটি ডলে দিলে।

—কেউ ভালো করলে বা কারো ভালো হলে হিংসে করতে নেই—বুঝলি? তুই এত ভালো মেয়ে, হিংসে করতে যাবি কেন! পানু অঙ্কে যত ভালো তুই ততো কাঁচা—তাতে কি হল? আবার সংস্কৃত এত সোজা জিনিস, ও আবার তাতে কি কাঁচা—আমার কাছে পড়ে তুই হয়তো ম্যাট্রিকে সংস্কৃততে লেটার পেয়ে যাবি—মায়ের ইচ্ছেয় এক-একজন এক-একরকম হয়—বুঝলি?

বোঝার চোটে যমুনার ঠাস ঠাস করে নিজের কপাল মাটিতে ঠুকতে ইচ্ছে করছে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। বাবার পুজো অনেকক্ষণ শেষ। বাবা আফিম আর দুধ না খেয়ে অপেক্ষা করছে। পিসিও ছোঁক ছোঁক করে ঘর বার

করছে। সন্ধ্যার পর বাবুর প্রণাম করতে আর প্রসাদ নিতে আসার কথা
দিগ্বিজয় করে ফিরেছে, সময়ে আসবে কেন! যমুনার ধারণা ইচ্ছে করে
সব দিন ও একটু দেরিতে আসে। বাবা ঘুমিয়ে পড়লে আর পিসি
ঝিমুনি এলে হামলা করার সুবিধে। আজও দেরি করছে বলে ভিতর
ভিতরে আরো বেশি তেতে উঠছে।

বাবার আফিম আর দুধ খাওয়া শেষ। একটু বাদে দু'খানা রুটি আর
একটু তরকারি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

—কই রে যমুনা, কাকার পুজো শেষ? বলতে বলতে মাতব্বরের
মতো ঘরে ঢুকল। মাতব্বরের মতো সেটা অবশ্য খালি যমুনারই মনে হল।

বাবা হাসিমুখে বলল, আয় রে পানু আয়, পুজো তো সেই কখন শেষ
আমি তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি—তুই স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছিস,
আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে আয়, তারপর হবে—

—দাঁড়ান কাকা, সবার আগে গুরু—যমুনা আয় তো—

তার হাতে শালপাতার পুঁটলি। পুঁটলির ভিতরে কি দেখা যাচ্ছে
ফুল। বাবার ঘর থেকে যমুনার ঘরে এলো। এ-ঘরেই দাদার মাঝা
সাইজের ফোটো টাঙানো। শালপাতার পুঁটলি ছোট টেবিলের ওপর রে
পকেট থেকে রুমাল বার করে যত্ন করে দাদার ফোটোখানা আগে মুছল
তারপর ফ্রেমের নিচের দিকে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল। শালপাত
মোড়ক খুলে মোটা বেলফুলের মালা ফোটোতে পরিয়ে দিল।

পিছনে দাঁড়িয়ে যমুনা দেখছে।...এই সব করে ওর রাগ কর
জোরটাও কেড়ে নিয়ে ওকে দুর্বল করা হচ্ছে।

—চল্। পানু পুজোর ঘরের দিকে চলল।

যমুনা সেদিকে না গিয়ে আবার বাবার ঘরে চলে এলো। ইঃ, উ
প্রণাম করবেন আর ওকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে!

একটু পরেই পানু এলো। পিসিও ওই ঘরেই। আগে পায়ে মাথা রে
বাবাকে প্রণাম করল। পরে পিসিকে। বাবা হেসে বলল, এবারে তো অ
সংস্কৃত নেই—ইন্টারমিডিয়েটে আরো ভালো রেজাল্ট করে সকলকে ত
লাগিয়ে দিতে হবে। সায়েন্সই পড়বি তো?

পিসি ওর গায়ে হাত বুলোচ্ছে তো বুলোচ্ছেই। বাবার কথা শেষ
তেই সে আর এক ধাপ ওপরে উঠল, এর পরের সব পরীক্ষায় তোকে
লারশিপ পেতে হবে বাবা—বুঝলি? কে আর তোকে দামাল ছেলে
লে দেখব—

এই বিশেষণ পিসির মুখেই সবার থেকে বেশি লেগে থাকে।

বাবাই সত্যিকারের খুশি। বলল, তোকে দিয়ে কেউ কখনো কিস্সু
াশা করেনি, এবারে সকলের টনক নড়বে।···আজ তো তুইই পুজোর
ামে অনেক মিষ্টি নিয়ে এসেছিস—রবিবার দুপুরে এখানে এসে খা,
ামিই বাজারে যাব'খন—

নাঃ, বাড়ির লোকই আজ যমুনার মাথাটা ঠাণ্ডা হতে দেবে না। এই
দিনে ওর ঠাণ্ডা স্বভাবের খোলসটাই বুঝি সরে গেছে। গলা চড়িয়ে বলে
উঠল, হ্যাঃ, এই শরীরে তোমাকে আমি বাজারে যেতে দিচ্ছি—কেন
পুকুরে মাছ নেই?

বাবার মনে ধরল না।—কেন, আমার শরীরের কি হয়েছে? ও মাংস
ভালবাসে, বাজারে গেলে একটু মাংস আনতে পারি···

যমুনার স্কুলের বয়েস তেরো। কিন্তু নিজের জন্মমাস জন্ম-বছর জানা
আছে। হিসেব করলে বয়েসটা প্রায় চৌদ্দর দিকে গড়িয়েছে। কাউকে
লে না, তেরোতেই তো সকলের মুখে ধিঙ্গি মেয়ে শুনে শুনে কান ঝালা-
পালা। কিন্তু তেরো হোক চৌদ্দ হোক ওর মনের বয়সের হিসেব কে
রাখে? মাংস ভালবাসে শুনেই যে জবাব মুখে এসেছিল তা অবশ্য বাবা
কেন, কাউকেই বলা যায় না। বলতে পারলে বলত, শুধু মাংস কেন হাড়ও
কম ভালবাসে না, ও আমার হাড়-মাস চিবুতে পারলে খুব সুখ হয়।

বেহায়ার মতো হাসছে। কথা শুনলেও পিত্তি জ্বলে যায়। হেসে হেসে
বলছে, ওর রাগ কেন বুঝছেন না কাকা—মাছ মাংস দুই-ই তো ওকে রাঁধতে
হবে—আচ্ছা, আমিই বাজার থেকে মাংস নিয়ে আসব'খন, ছাড়ন-ছোড়ন
নেই—আপনি টাকা দিয়ে দেবেন।

বাবা খুশি।—ঠিক আছে···মনা, তুই ওকে নিয়ে ও-ঘরে গিয়ে বোস,
আমাকে যা দেবার তোর পিসি দেবে'খন।

এ-ঘরে এসেই পানু বলল, বিকেলেও দেখে গেছি এখনো দেখছি··· তোর মুখ এত ভার-ভার কেন রে ?

—আমার কুৎসিত মুখের দিকে তোমার তাকানোর কি দরকার ?

হাসছে। চোখও পাকালো।—তোকে কুৎসিত কে বলে ? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কিছু। আরো হাসতে লাগল।—ফণী তোকে খুব সুন্দর দেখে আর আমাকে হিংসেই করে—তোকে নিয়ে আজ কি বিচ্ছিরি কথা বলল জানিস ?

যমুনা ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার জানতে হবে না—বিচ্ছিরি কথা শুনে তোমার মুখে তো হাসি ধরে না !

—আরে শোনই না, বিচ্ছিরি কথা হলেও ঠাট্টাই তো···বলল, অঙ্কে লেটার পাওয়া তোর উচিত হয়নি, ম্যাট্রিক পাস করলি, অ্যাডালট্ হলি, কলেজে পড়বি—এখন পর্যন্ত যমুনার বডির মাপ-জোকটাই ভালো করে নিতে পারিসনি—কলেজে ঢোকার আগে এই হিসেবপত্রগুলো আগে ভালো করে সেরে নে—

যমুনার মাথায় আগুনই জ্বলে উঠল বুঝি। কঠিন চোখে চেয়ে রইলো কয়েক পলক। তার পরেই আগুনের ফুলকির মতো মালা-ঝোলানো দাদার ফোটোর সামনে এসে দাঁড়ালো।—দাদা, তোমার বোনকে কি বলছে শুনছ ? ভক্তির চোটে তোমার গলায় মালা পরিয়ে তোমার সামনে বসেই ভালো পাস করার আনন্দ দেখছ ?

পানু সত্রাসে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে যমুনাকে টেনে সরালো। তারপর নিজের দু'কান মলে দু'হাত জোড় করে ফোটোর সামনে দাঁড়ালো।—গুরু, দোষ নিও না—তোমাকে কত ভক্তি করি তুমিও জানো—আর কক্ষনো এ-রকম ভুল হবে না ··ওই ফণে হারামজাদা আর এ-রকম ঠাট্টা করলে আমিই ওর মাথা ভেঙে দেব।

ফিরল।—তুই রাগ করিস না যমুনা, আমার সত্যিই অন্যায় হয়েছে—

নরম কথায় যমুনা আরো বিগড়ে গেল।—আজ তোমার অন্যায় হয়েছে ? অঙ্ক না পারলে দাদার চোখের সামনে বসে তুমি গাল টিমটে কাঁধ খিমচে টানো না ? কাল গাঁট্টার চোটে আমাকে টেবিলে শুইয়ে

ফেলোনি—মাথায় সুপুরি তুলে দাওনি ? সামনে বসে বোনের ওপর এই অত্যাচার দেখতে দাদার খুব ভালো লাগে—আজ দাদা বেঁচে থাকলে তোমার এত সাহস হত ?

পানু চেয়ে আছে। হকচকিয়ে গেছে। সেই এতটুকু বয়েস থেকে এই যমুনাকেই কি এতদিন ধরে দেখে আসছে! ম্যাট্রিকের ফল দেখার পর থেকেই পানুর মনে হচ্ছিল, ছোট গণ্ডি ছাড়িয়ে ও তাড়াতাড়ি একটা মস্ত বড় গণ্ডিতে পা ফেলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই যমুনা কবে কখন কোন্ ফাঁকে এত বড় হয়ে গেল ! ও এ-ভাবে এমন কথা বলে কি করে ?

চেয়েই আছে। নিজের অজ্ঞাতে চেয়ারটা টেনে বসল।—হ্যাঁ রে, সত্যিই তোর আজ কি হয়েছে বল্ তো ?

যমুনা জবাব দিল না। পায়ে মাড়ানো ভুজঙ্গিনীর চোখ।

—যাই তাহলে···আজ একটু প্রসাদ-টসাদ তো ভাগ্যে নেই দেখছি।

একটু কাজ হল বোধহয়। ঘুরে যমুনা হন হন করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। একটু বাদে সেই ডালিসুদ্ধু মিষ্টি নিয়ে ফিরল। সেটা সামনে টেবিলের ওপর রেখে বলল, নিয়ে যাও।

এবারে মেজাজ সত্যিই বিগড়োচ্ছে পানুরও।—আমি কি সব মিষ্টি গাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি ?

—পুজো দিয়ে বাবা আর পিসি প্রসাদ নিয়েছে।

—আর তুই ?

—না।

—তোর জন্য রেখেছিস ?

—না।

পানুর চোখ লাল হতে লাগল। প্রথমে বলল, এত সাহস তোর ? তারপরেই মনে হল আগের দিনের সঙ্গে এই একটা দিনের কি করে যেন নেক তফাৎ হয়ে গেছে। যত রাগই হোক ওর গায়ে হাত তোলা যাবে া। আবার বলল, আমার ওপর তোর এত ঘেন্না যে কাকার পুজো করা া-কালীর প্রসাদ পর্যন্ত মুখে তুলবি না ? দেখবি এ প্রসাদের কি করি ামি ? দেখবি ?

সরোষে মিষ্টির ডালির দিকে এগোতেই যমুনা ওটা টেবিল থেকে তুলে নিল। এই রাগের চেহারা চেনে।

ও-ঘরে কাকা আর পিসি এখনো জেগে আছে। পানু খুব চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, দে বলছি!

—কি করবে?

—ড্রেনে ঢেলে দিয়ে আসব, রাস্তার কুকুর দিয়ে খাওয়াবো! আর তোর মা-কালীকে বলব আমার এই পাপের জন্য কাল যেন তোকে আমার মরা মুখ দেখতে হয়—আমি প্রাণের পরোয়া করি?

করে না যমুনা সেটা খুব অবিশ্বাস করে না। এই জন্যেই দাদার অত পেয়ারের সাগরেদ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ও কি করে বুঝবে যমুনার এই সকাল থেকে সব থেকে বেশি রাগ নিজের ওপর। ও যা করেছে এই পাসের দরুন, পুজো-দেওয়া প্রসাদ মুখে তুলে কি করে।···মরা মুখ দেখার কথা বলতে বুকের ভিতরটা একেবারে ধড়াস করে উঠেছে। আচমকা দাদার শেষ খবরটা শুনে যেমন করে উঠেছিল অনেকটা তেমনি। যমুনা জ্বলন্ত চোখেই চেয়ে আছে। রাগে দু'চোখ ফেটে জল আসছে। কিন্তু যত রাগ ততো অসহায়। বিকৃত সুরে বলে উঠল, একটা মেয়েকে মরা মুখ দেখিয়ে খুব বীরত্ব ফলাচ্ছ—কেমন?

···মেয়ে যে কি মেয়ে পানু কি আজ সকাল পর্যন্তও জানত! এ মেয়ের দিক থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না। প্রসাদের ডালি বাঁচানো দেখেই ওর হার বুঝে নিয়েছে। এ-কথা শোনার পর নিজে জেতার একটা অদ্ভুত স্বাদ কানের ভিতর দিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চেষ্টা করে গম্ভীর এখনো। বলল, ভালো চাস তো ওটা এখানে রেখে দুটো ডিস নিয়ে আয়—দুটো না তিনটে—

যমুনা ঝাপটা মেরে উঠল, আমি এখন মিষ্টি খেতে পারব না, আমার সেই সকাল থেকে গা ঘুলোচ্ছে!

—যা বললাম আগে কর তো···তবু দাঁড়িয়ে আছিস?

শব্দ করে ডালিটা টেবিলের ওপর রেখে যমুনা ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডিশ হাতে ফিরল।···একটু ঠাণ্ডা, কিন্তু টান-ধরা মুখ।

ডিস ক'টা টেবিলে রাখতে আবার হুকুম করল, জল দে এক গেলাস।

ঘরেই কুঁজো। তাকে গেলাস।

জল ভরা হতে গেলাসটা নিয়ে পানু জানলার কাছে গিয়ে হাত ধুয়ে নিল। তারপর ডালি থেকে তিন-জোড়া অর্থাৎ ছ'টা সন্দেশ তুলে একটা ডিসে রাখল।—এর থেকে কাল সকালে দুটো কাকাকে দিবি, দুটো পিসিকে আর দুটো তোর—

যমুনা চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে।

অন্য দুটো ডিসে দুটো করে চারটে সন্দেশ তোলা হল।—এখন এই দুটো তোর আর দুটো আমার—চেয়ারটা টেনে বসে যা।

কত সন্দেশ এনেছে মেজাজের চোটে যমুনা চেয়েও দেখেনি। বলে উঠল, এঃ! দাতা কর্ণ একেবারে—প্রসাদ বাড়ির জন্য নিতে হবে না?

—আরো ছ'টা আছে গুণে ছাখ, দুটো দাদার দুটো বউদির আর দুটো রাণুর—অন্নপ্রাশনের আগে বউদি সুমুর মুখে তো কিছু দিতেই দেবে না।

রাণু আর সুমু ওর দাদা নিমুদার দুই মেয়ে, রাণু পাঁচ বছরের আর সুমু পাঁচ মাসের। বড় মেয়ের বেলায় একেবারেই সঙ্গতি ছিল না। যমুনা জানে ছোট মেয়ের একটু ঘটা করে মুখে ভাত দেবার ইচ্ছে বউদির। হেসে পানু বলল, আমার পাকা হিসেব, এই হিসেব করেই দশ টাকার কুড়িটা সন্দেশ এনেছিলাম—

[পাঠক, এই জমানার ছেলে-মেয়েরা সেই চুয়াল্লিশ সালে দশ টাকার মূল্য আর আট আনা দামের সন্দেশের সাইজ কল্পনা করতে পারবেন কি?]

এই পাকা হিসেবেও যমুনার পছন্দ হল না। গলার স্বর এখনো ঝাঁঝালো।—বললাম যে সকাল থেকে গা ঘুলোচ্ছে, এখন মিষ্টি খেতে পারব না!

—সকাল থেকে রাগে তোর গা ঘুলোচ্ছে। মিষ্টি খাবি কেন, খুব ভক্তি করে মা-কালীর প্রসাদ খা—একটুও গা ঘুলোবে না—নে আর জ্বালাস নে, ধর্—

ওর হাত টেনে ডিসটা ধরিয়ে দিল। চোখের পলকে যমুনা একটা সন্দেশ তুলে ওর ডিসে দিয়ে দিল। রাগত গলায়ই বলল, কাল সকালে খেলে তোমার থেকে বেশি খেতে যাব কেন—এমনিতেই এ প্রসাদ পেটে সইলে হয় !

পানু একটা সন্দেশ মুখে তুলে গাল ফুলিয়ে আয়েশ করে চিবুতে লাগল। চাউনিও যমুনার মুখের ওপর। একটা তুলে দিল মানে ওদের দু'জনের মোট তিনটে করে হল। কথাগুলো সন্দেশের চিবুনোর মতোই আয়েস করে শোনার মতো। আগে হলে এই সমান সমান ভাগ নিয়ে একটা চটুল রসিকতা করে বসত। এখন তা করতে গেলে এমন শোনার আনন্দটাই মাটি। এই দিনটা বড় আশ্চর্যরকমের অন্য-রকম হয়ে গেছে। ও ছোট গণ্ডি থেকে বড় গণ্ডিতে পা ফেলেছে। কিন্তু যমুনাও যেন এই একদিনের মধ্যেই আর ছোট গণ্ডিতে বসে নেই !

দেখছে। যমুনা খুব ভক্তি ভরে সন্দেশসুদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে কুট-কুট করে সন্দেশ দাঁতে কাটছে। মুখখানা এখনো বেজায় গম্ভীর, কটা দাঁত মাঝে মাঝে ঝিকমিক করছে।···ফণে পাজিটা যমুনার চোখের খুব প্রশংসা করে। বলে, ওদের ঠাণ্ডা দীঘির মতো কালো আর গভীর, কিন্তু চোখে চোখ রাখলে অনেকটা ভেতর দেখা যায়। আজ এখন মনে হল, পাজিটা দাঁত লক্ষ্য করেছে কিনা কে জানে, দাঁতও বড় সুন্দর। হেসে বলল, কালকের ওই ব্যাপারের জন্য তুই অত রেগে আছিস পাশ করার আনন্দে আমি তো ভাবতেই পারিনি !···অত রাগ নিয়ে কাল রাতে আমার জন্য তুই মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করলি কি করে ?

চাপা যন্ত্রণাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি না পেলেই নয়। · কি করবে ? মারবে ? মারুক। জবাব দেবার আগে কয়েক পলক চেয়ে রইলো।—কাল তোমার জন্য আমি মা-কালীর কাছে কি প্রার্থনা করেছি জানলে সন্দেশ আর তোমার গলা দিয়ে নামবে না !

সন্দেশ চিবুনো থেমে গেল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এই থমথমে মুখ থমথমে গলাও নতুন কিছু যেন। —তা তার মানে ? মা-কালীর কাছে কি প্রার্থনা করেছিলি ?

—আমি মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, এবারে তুমি যেন ফেল করো, উনিশের আগে তোমার যেন ম্যাট্রিক পাশ করা না হয়—মা-কালী যেন ফেল করিয়ে তোমার অহংকার চূর্ণ করে – এই একবার অন্তত তোমাকে ফেল করিয়ে ভালো রকম শিক্ষা দেয়।

পানু হাঁ করে চেয়ে আছে। নিজের দুটো কান দুটো চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।—যাঃ, এখনো রাগের চোটে তুই বাজে কথা বলছিস—

—মা-কালীর নাম নিয়ে আমি মিথ্যে কথা বলি না, যা করেছি তাই বললাম।

পানুর বিস্ফারিত চাউনি কয়েক মুহূর্তের জন্য ঈষৎ ক্ষুব্ধ। তারপরেই কি রকম মনে হল এখনো কিছু ভুল হচ্ছে, কিছু বুঝতে বাকি। তবু আহত গলায় বলল, আমার ওপর এত রাগ তোর ···এই প্রার্থনা করেছিস! আর ফেল করার বদলে আমি ভালো পাশ করেছি বলে আজও সেই বিকেল থেকে এত রাগ তোর ?

—তোমার যেমন বুদ্ধি তেমন বুঝছ।···ওই প্রার্থনা করার পর আমি নিজের ওপরেই রাগে জ্বলছিলাম, তবু জোর দিয়ে বার বার বলেছি বেশ করেছি—তোমার বজ্জাতির শিক্ষা হওয়া উচিত। তবু রাতে ঘুমোতে পারছিলাম না। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলাম, দাদা সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে আমাকে বকছে, বলছে, এই মেয়ে কি বোকার মতো করলি বল তো!

···সকালে মা-কালীর পট তুলেই মনে হল সে-ও আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে আর দাদার মতো করেই আমাকে মিষ্টি করে বকছে—সেই থেকে নিজের ওপরেই রাগে আমার মাথার ঠিক নেই!

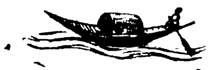
পানুর চোখে পলক পড়ে না। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। দেখছে তো দেখছেই। চোখে মুখে হাসি ছড়াতে লাগল। সেই হাসি গলায় এসে সশব্দে আছড়ে ভাঙল। হাসছে তো হাসছেই।

—কি রে পানু—অত হাসা-হাসি কিসের? ও-ঘর থেকে বাবার হৃষ্ট গলা।

পান্থ জিভ কেটে হাসি থামালো। তারপরেও চেয়েই আছে। খুব খাটো গলা করে বলল, যমুনা রে, তোর ওপর মা-কালীর কত দয়া জানিস না, মা তোর ভেতর দেখে রেখেছে, ভেতর জেনে রেখেছে—সেই জন্যেই মজা করে আমাকে এত ভালো পাশ করিয়ে দিল—নইলে আমার সাধ্য ছিল না···বুঝলি বোকা মেয়ে?

যমুনা কানে শুনেও শুনল না। তার ভিতরে একটা আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেল। সত্যি কথাটা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে, বলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কাল রাত থেকে এত ঘণ্টার সমস্ত যন্ত্রণা যেন মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হয়ে উবে গেল।

···এত বড় যন্ত্রণা থেকে এমন মুক্তির স্বাদ যমুনা জীবনে পায় নি। আনন্দে সর্বাঙ্গ শিরশির করছে।



যমুনার সেই ছেলেবেলা থেকে নিজের জগতের নিরিবিলিতে বাস। মা কেমন জানে না, স্কুল-মাস্টারি ছাড়াও বাবার এখন দুটো টিউশনি আর কোচিং ক্লাস, দাদার স্কুল কলেজ আর ওই বয়েস থেকেই স্বদেশী করা। ঘরে মুখ দেখার মানুষ বলতে সোনাপিসি। বসে বসে তার মুখ কতক্ষণ দেখা যায়, আর ক'টা কথাই বা বলা যায়। আশপাশের দু-চারটে দু'দশটা টালির ঘর বা ছনের ঘরের যারা বাসিন্দা তারা দিন-আনা দিন-খাওয়া মেহনতি মানুষ। তাদের ছেলেমেয়েরাও যমুনার কাছের কেউ নয়।

এই নিঃসঙ্গতা থেকেই যমুনার নিজের জগতের সৃষ্টি। চার দিকের এই ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও ওর এই জগৎটা যে কত ভর-ভরতি আর কত শান্তির এ-যদি কেউ জানত। যুদ্ধের দুর্যোগ তো সেই কবে থেকেই লেগে আছে, তার ছোট-বড় ঝাপটা পৃথিবীর কোথায় না এসে লাগছে? মাথার ওপর দিয়ে দিন-রাত এরোপ্লেন উড়ছে, যখন-তখন সাইরেন বাজছে, সন্ধ্যা পার হতে না হতে ব্ল্যাকআউটের অন্ধকার পৃথিবীটাকে গিলে বসে থাকছে। যুদ্ধের হিড়িকে সমস্ত জিনিসের দাম চড়ছে তো চড়ছেই। দাদা বলে, এই যুদ্ধের জন্য একদল লোক যত বড়লোক হয়ে যাচ্ছে আর একদল

লোক ততো গরীব হচ্ছে। গরিব আরো গরিব কেন হবে যমুনা বুঝতে পারে না। বাবা কি করে গরিব হয়ে যাচ্ছে? পানুদার দাদা সামান্য চাকরি করে সে কি আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে? দাদা বুঝিয়ে দিয়েছে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, সব জিনিসের দাম চড়ছে বলে গরিবরা আগে যে-দামে যে জিনিস কিনতে পারত এখন সেই জিনিস কিনতেই তার থেকে বেশি টাকা লাগছে, তার ফলে অনেক দরকারের জিনিস আবার কিনতেও পারছে না—এই করে গরিব আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে। দাদার কথা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ, দিনে দিনে এখানেও নতুন মুখের ভিখিরি বেড়ে যাচ্ছে।

এই সময় থেকেই আবার স্বদেশীঅলারাও কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে। দাদাও এদের একজন, তাই এব্যাপারেও যমুনার আগ্রহ আবার দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। দাদার মুখে শুনেছে, ইংরেজরা আমাদের এত বড় দেশটার গলায় দু'শ বছর ধরে শেকল পরিয়ে রেখেছে, তারা প্রভু আমরা দাস। এই দেশের দাসত্ব ঘোচানোর জন্য তামাম দেশটাই এখন উঠে পড়ে লেগেছে। এই সময় থেকেই যমুনার খবরের কাগজ পড়া শুরু। অন্য যুদ্ধ নিয়ে তার খুব একটা আগ্রহ নেই, দেশ স্বাধীন করার জন্য দাদাও যে যুদ্ধে নেমেছে তার সমস্ত খুঁটিনাটি ওর না জানলে চলে? কাগজ পড়ে পড়ে এই স্বাধীনতার যুদ্ধের যারা প্রথম সারির মানুষ তাদের সক্কলের নাম যমুনার মুখস্থ হয়ে গেছে। তারা কবে কোথায় কি করছে, কবে কে জেলে যাচ্ছে, কোথায় আগুন জ্বলল গুলি চলল—সব খবর যমুনা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে। ওই বয়সে যমুনা যত খবর রাখে, ওর থেকে ঢের বড় বয়সের মেয়েরাও কি তার সিকি খবর রাখে? যমুনা তখন থেকেই ভাবত তার যদি মা-কালীর মতো শক্তি থাকতো, তাহলে ইচ্ছে করা মাত্র ইংরেজরা চলে যেত, দেশ স্বাধীন হত, কোনো পক্ষেরই লোক মরত না—গুলি-গোলার ব্যাপার থাকত না।

...দুশ্চিন্তা হবে না? নিজের চোখেই তো দেখেছে স্কুলের ছেলেগুলোকে পর্যন্ত লাল-মুখো সার্জেন্ট আর পুলিশ ঠেঙাতে ঠেঙাতে নিয়ে চলেছে, আর ঠেঙানি খেয়েও এক-একটা ছেলে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার

করে উঠে আরো বেশি মার খাচ্ছে। যমুনার দম বন্ধ হয়ে আসে, হাড়-পাঁজর দুমড়ে যেতে থাকে—দাদাকে ধরে যদি ওই রকম মারে? এরই মধ্যে দাদা জেল খেটেছে, মেরেছে কিনা কে জানে? মারলেও দাদা কি ওকে বলবে?... বাড়িতে দাদাকে আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা দেখতে পায়। মনে মনে নিবিড় মমতায় দাদার গায়ে পিঠে বুকে হাত বুলোয়। নাঃ, ওর দাদার ক্ষতি হবে মা-কালী এটা হতে দিতেই পারে না। দাদার জন্য কখনো একটু চিন্তা হলেই ছুটে ঠাকুর ঘরে চলে যায়, দাদার জন্য ছোট্ট বুক নিঙড়ে প্রার্থনা করে—দাদাকে ভালো রেখো মা—দাদার গায়ে কখনো কেউ না আঁচড় কাটতে পারে দেখো মা।

বাইরের জগতে কত দুশ্চিন্তা কত রকমের উপদ্রব তার যেন শেষ নেই। কিন্তু যমুনা তার নিজের জগতে ঢুকে গেলে বড় শান্তি বড় আনন্দ। এই জগতের সব-কিছুই ওর বড় আপনার, বড় কাছের। সামনের ফুল বাগানটুকুতে রোজ ভোরে নিজের হাতে জল দেয়। ও ভাবতে চেষ্টা করে ছোট বড় সব ফুলের গাছগুলোর গা জুড়োচ্ছে বলে ভারী খুশি ওরা—ফুলের সঙ্গে ওর মিতালি। সাজি হাতে পুজোর ফুল তুলতে গেলে ওদের না-বলা কথা শুনতে কি ভালোই না লাগে। সমস্ত ফুলেরাই নিঃশব্দে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়, আমাকে নাও, মা-কালীর পুজোর জন্য আমাকে তোলো। জবা গাছটার সামনে এসে যমুনা এক-একদিন মুশকিলেই পড়ে যায়—সক্কলেরই বায়না মায়ের পায়ে যাবে। মনে মনে ছেড়ে যমুনা কোনদিন জোরেই বলে, দাঁড়া রে বাপু, মায়ের পায়ে দেবার জন্য আমি কি বাগানের সব ফুল তুলে নিয়ে যাব নাকি? মায়ের যাকে ইচ্ছে হবে আমার হাত দিয়ে তাকেই নেবে—বাকি সব মায়ের পায়েই ঝরে পড়ার জন্য গাছেই বসে থাক।

বাড়ির পুকুরটাকেই কি কম ভালবাসে যমুনা? ওতে স্নান করা দাপা-দাপি করা তো আছেই। পুকুরটা তখন যেন দামাল ছেলে-মেয়েগুলোকে বুকে নিয়ে তাদের উপদ্রব সহ্য করে। পাঁচ সাত দশ মিনিটের পথ পায়ে হেঁটে এসেও অল্প-বয়সী ছেলে মেয়ে এমন কি বউরাও এই পুকুরে স্নান করতে আসত। দাদার সঙ্গে যাদের ভাব-সাব তাদের বাড়ির অনেকেই

আসত। আরো ছেলেবেলায় পানুদা আর ফণীদাও প্রত্যেক ছুটির দিনেই আসত। ঝাঁপাঝাঁপি আছড়া-আছড়ি করে করে পুকুরটাকে যেন ওই দুই দস্যি পাগল করে দিত। যমুনার সঙ্গেই কি কম লাগত। ডুব দিয়ে হাত ধরে টানা, পা ধরে টানা। এমনি হুটোপুটি করতে গিয়েই এই পুকুরেই তো যমুনা ডুবে মরতে বসেছিল একবার। সেই ভয়ংকর ব্যাপারের কথা মনে হলে এখনো ত্রাস। জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে বুক ফেটে মরা কাকে বলে যমুনা জানে। তখন বছর আট মাত্র বয়েস ওর, মাস ছ'সাত আগে সাঁতার শিখেছে। ইজেরের ওপর বড় একটা গামছা জড়িয়ে নাইতে নেমেছিল। হুটোপুটি করতে করতে সেই গামছা এমন মোক্ষমভাবে দু'পায়ে ফাঁসের মতো লেগে গেল যে যত খুলতে চেষ্টা করে ততো ওটা বেশি জড়িয়ে যায়। আসলে যমুনা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাবার ফলেই অমন বিপদে পড়েছিল—তলিয়ে যাচ্ছিল। ওর আর্তনাদ শুনে আর তিন-চার জন যারা চান করছিল তাদের মধ্যে কেবল পানুদাই ওকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। যখন এসে ওকে ধরেছে তখন যমুনার প্রাণটা বুঝি বেরিয়েই যাচ্ছে। আশ্রয় পাওয়া মাত্র পানুদাকে এমন আঁকড়ে ধরল যে এবারে দু'জনে একসঙ্গে তলিয়ে যেতে লাগল। তারই মধ্যে পানুদা নিজেকে বাঁচিয়ে ওকেও বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। তারপর দু'জনেই জল খেতে খেতে দম বন্ধ হয়ে বুক ফেটে মরতে বসেছিল। ঘাটে যারা ছিল তাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে দাদা আর তার দুই বন্ধু ছুটে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে যমুনাকে আর পানুদাকে বাঁচিয়েছে। দু'জনে যমুনাকে ছাড়িয়ে নিতেই আর একজনের পানুদাকে নিয়ে খুব বিপদে পড়তে হয়নি। সহজেই ঘাটে ভেসে আসতে পেরেছে। কিন্তু ওরা এসে না গেলে যমুনা তো মরতই আর ওর জন্য পানুদাও মরত। পাড়ে তুলে আনার পরেও যমুনাকে নিয়ে সকলের কম ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে! ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হয়েছিল। এত জল খেয়েছে যে দম বন্ধ হয়ে মরেই যাচ্ছিল।...পরে দাদা বলেছে, পানু না থাকলে যমুনার বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। ও গিয়ে ধরার পরে তিন-চার মিনিট অন্তত যমুনাকে নিয়ে যুঝতে পেরেছে। তা না হলে তলিয়েই যেত। জলে তিন-চার মিনিট সময় পাওয়া মানে অনেক সময়।

এই কৃতজ্ঞতায় অনেক দিন পর্যন্ত যমুনা মুখ বুজে পানুদার অনেক দুষ্টুমি অনেক বজ্জাতি আর অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে, কত মনে রাখতে পারে, কত আর সহ্য করতে পারে।

কিন্তু নিরিবিলিতে এই পুকুর ধারে এসে বসলে অনেক সময় মনে পড়ে। সেই বুক-ফাটা দম-বন্ধ বোধটা ভোলেনি। গায়ে কাঁটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি না হয়ে যেতে পারত। এই পুকুর পাড়ে বসে সে-কথা মনে পড়লে এখনো পানুদার মার-ধর অত্যাচার ক্ষমা করে দেয়।

...প্রাণ তো নিজের দোষে যেতে বসেছিল, পুকুরটার আর দোষ কি? এই পুকুর ওর বরাবর যেমন প্রিয়, এখন তার থেকে ঢের বেশি। এটাকে নিয়ে যমুনা অনেক কিছু কল্পনা করতে পারে। দুপুরের সময় এটার নিথর শান্ত রূপ। মেঘলা দিনে স্থির কালো জল বুকে নিয়ে এটা যেন ভারী গম্ভীর। কেউ জানে না, এমনি নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা পুকুরটার দিকে চেয়ে চেয়ে যমুনা বারো তেরো বছর বয়সেও এক-একসময়ে রূপকথার কালে গিয়ে হাজির হয়। সেখানকার জন-মানুষ পশু-পাখিশূন্য এক প্রাসাদের পালঙ্কে শুয়ে মায়া-ঘুমে ঘুমোচ্ছে যে, সে যমুনা নিজে ছাড়া আর কে? তার মাথায় ছোঁয়ানো সোনার কাঠি আর পায়ে ঠেকানো রুপোর কাঠি। রাক্ষস-রাক্ষসী সকলকে খেয়ে কেবল আদর করে ওকে জিইয়ে রেখেছে।... এই শান্ত দীঘির কোথাও আছে সেই পাথরের খুপরি—যেখানে আছে সোনার কৌটা।...তার মধ্যে দুটো ভোমরা-ভোমরি। ও দুটোই রাক্ষস-রাক্ষসীদের প্রাণ। এক রাজপুত্র এসে এক ডুবে সেই কৌটো তুলে এনে এক কোপে ভোমরা-ভোমরি দুটোকে কেটে ফেলল। রাক্ষস-রাক্ষসীরা মরল। সোনার কাঠি রুপোর কাঠি নেড়ে রাজপুত্র ওর ঘুম ভাঙালো।

যাঃ। ওই রাজপুত্র পানুদা না আরো কিছু। নচ্ছার পাজি একটা, ফাঁক পেলেই জ্বালায় ওকে—সে আবার রাজপুত্র! কিন্তু যমুনার মহামুশকিল, রাজপুত্র যে বেশেই এসে দাঁড়াক না কেন—তার মুখের আদল অবিকল পানুদার মতোই। আর তক্ষুণি যমুনা রাগ করে আর জোর করে ওই মুখ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

পুকুরের তিন দিকে খানিকটা করে জায়গা নিয়ে ওদের বাগান।

বাগানের গাছ-গাছড়াগুলো সব যমুনার নিজের জগতের জিনিস। আম গাছ কলা গাছ, তিন দিকেই কয়েকটা করে নারকেল গাছ, লেবু আর বাতাবি লেবু গাছ, খেজুর গাছ, নিম গাছ, আতা গাছ, কুল গাছ, পেয়ারা গাছ—এই প্রত্যেকটা গাছের সঙ্গে যমুনার মিতালি। ওরা যমুনার মন বোঝে, ও কখন কার কাছে আসবে সেই অপেক্ষায় থাকে। যমুনা ওদের গুঁড়িতে ডালে পাতায় হাত বুলোয়, নাগালের কুঁড়ি ফুল ফল আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করে। ওদের স্পর্শ কি নরম কি মিষ্টি। ওই দুই দস্যি পানুদা আর ফণীদা বাগানে ঢুকলেই ওর বুক দুরু-দুরু করে। হুটোপুটি করে ডালপালা ভেঙে তছনছ করত। আর যমুনার যেন হাড়-পাঁজর ভেঙে-ভেঙে যেত। দু'জনেরই নারকোল আর পেয়ারার ওপর বেশি লোভ। পেয়ারার ডাল শক্ত, নারকোল গাছের আর ভাঙবে কি—এই যা রক্ষা। তবু যা খাবে তার তিন গুণ নষ্ট করবে, এ দেখলে যমুনার খুব রাগ হয়। ওদের এ গাছের নারকোল দারুণ মিষ্টি, পানুদা দড়ি কোমরে বেঁধে কাঠ-বেড়ালির মতো নারকোল গাছে উঠে যায়। তিনজনে মিলে খাবে হয়তো দুটো কি তিনটে নারকোল, কিন্তু গাছে উঠলে কেটে নামাবে এক কাঁদি। যমুনা নিষেধ করে কিন্তু কে শোনে?

বাগানের গাছপালা ফুল-ফলই শুধু নয়, আরো অনেক কিছু ওকে টানে। কাঠবেড়ালির ব্যস্ত ছোটাছুটি, কুতকুত করে তাকানো দেখতে কি মজাই লাগে। মৌচাকের একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে মৌমাছির আনাগোনা নির্ভয়ে দেখে। ওদের বিরক্ত না করলে ওরা কিছু করে না। একবার পানুদা একটা মস্ত চাকে ঢিল মেরে বসেছিল, যমুনা তখন অনেক দূরে ছিল বলে রক্ষা। পানুদা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলো যখন, মৌমাছির কামড়ে ওর সমস্ত মুখ ফুলে ঢোল। যমুনা মৌমাছিদের কোনো দোষ দেখেনি—ওদের মারলে ওরা কামড়াবে না? গাছে টিয়া ময়না আরো কত রকমের পাখি এসে বসে, বসন্তকালে তো কোকিলের ডাক শুনে কতবার যে দৌড়ে দৌড়ে বাগানে আসে ঠিক নেই। আর মজা রং-বেরঙের প্রজাপতির পিছনে ছুটতে। ছোটেই কেবল, একটাও ধরে না। ওর এত বাগানে টহল দেওয়া দাদা পছন্দ করে না, বলে কবে যে তোকে সাপে কামড়াবে ঠিক

নেই—গরমে আর বর্ষাকালে এ-জন্যে তো দাদার কাছে বকুনিই খায়। বাগানে বিষাক্ত সাপও কম নেই যমুনা জানে। কিন্তু আশ্চর্য, ওর একটুও ভয় করে না। কেমন একটা ধারণা, বাগানের সাপও ওকে চেনে, ওর কিছুই করবে না। কেন করবে, ও কি কারো ক্ষতি করতে যায়? পৃথিবীতে কেন যে এত মারামারি কাটাকাটি হয়, যুদ্ধ হয়, যমুনা ভেবে পায় না। কেউ কারো কোনো ক্ষতি না করতে চাইলেই তো বেশ শান্তিতে থাকতে পারে!

...মাথার ওপর নীল আকাশ বা মেঘের সারিও যমুনার জগতের বাইরে নয়। নীল আকাশের ওপরে দেব-দেবীর রাজত্বটা কল্পনার চোখে কতভাবে দেখতে চেষ্টা করে ঠিক নেই। আর মেঘে-মেঘে জোড় খাওয়ার সময় এক-একটা মূর্তি কল্পনা করা ওর নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যেমন ভাবত, জোড়-খাওয়া মেঘ ঠিক সেই মূর্তি ধরত। পাহাড় ভাবলে পাহাড়, অতিকায় সিংহ বা দৈত্য কল্পনা করলে তাই, পেখম মেলা বিশাল ময়ূর ভাবলে ময়ূর—যা ভাবা যায় তাই।

...যমুনার এই নিজস্ব জগতের খবর কেবল একজনই রাখত। দাদা। দাদাকে বিশ্বাস করে যমুনা বলত না এমন কথাই নেই। দাদা বেশ মন দিয়ে ওর কথা শুনত, সময়-সময় হেসেও উঠত, কিন্তু কক্ষনো ঠাট্টা ইসারা করত না। পড়া ফেলে বা কাজ ফেলে হাঁ করে ওকে বাইরের দিকে নয়তো আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে দেখলে বাবা বকলে বা পিসি কিছু বললে, দাদা উল্টে ওর পক্ষ নিত। বলত, ওর মন যে দিকে যায় যেতে দাও না, তোমাদের কি অসুবিধে হচ্ছে?

...যমুনার এই জগতে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল দু'বছর আগে। পায়ের নিচের মাটি দুফাঁক হয়ে বিকট হাঁ করে গিলতে এলো ওকে। সেটা বিয়াল্লিশ সাল। কাগজে দেখল গান্ধীজী তার অহিংসার শেষ মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছে। বলেছে, ইংরেজ তোমরা ভারত ছাড়ো—কুইট্ ইন্‌ডিয়া!

দাদা রোজ সকালের গাড়িতে যেমন কলকাতা যায় তেমনি গেছে। বাবাকে যমুনা অনেক বার করে বিড়বিড় করে বলতে শুনল, আজ কেন

গেল, আজ কোথাও পড়াশুনা হবে না কিছু হবে! যত চিন্তার মধ্যে ওরা আমাকে ফেলে!···পানুদা আবার বলল, সকালে যাবার সময় দাদার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে, হাতে বই-খাতা কিছু ছিল না, খালি হাতে স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছে।

না, যমুনার মনে খুব একটা দুশ্চিন্তা নেই। দাদার আবার কি হতে পারে। দুপুর আর বিকেলের মধ্যে অনেক রকম খবর আসতে লাগল। কলকাতায় ছেলে-মেয়েরা আইন অমান্য করতে নামার ফলে অনেক জায়গায় আগুন জ্বলছে, গোলাগুলি চলছে—কলকাতার রাস্তায় সৈন্য নেমেছে, বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তা টহল দিচ্ছে। বিকেল গড়ালো, সন্ধ্যা পেরুলো। রাত।···তা দাদা তো কত দিন রাত দশটায়ও বাড়ি ফেরে। যমুনা কতবার ঠাকুর ঘরে ঢুকেছে ঠিক নেই।—মা, দাদার কি কি-চ্ছু হতে পারে? কি-চ্ছু হতে পারে না—তাই না?

···রাতে দাদা আর ফিরলই না। পরদিন সকালে না। দুপুরেও না। কাগজের খবর শুধু কলকাতায় নয়, সমস্ত ভারতেই আগুন জ্বলেছে, জ্বলছে। বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ থানা থেকে লোক এলো—কোমরে রিভলভার গোঁজা পুলিশের লোক। বাবা বাড়িতেই বসে। তার সঙ্গে কি কথা হল যমুনা জানে না। ওর বুকের ভিতরটা থর থর করে কাঁপছে, আর বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।···বাবার এমন ছাইয়ের মতো মুখ কেন? বাবা ওদের সঙ্গে চলে গেল কেন? কোথায় গেল? পিসিও কিছু জানে না, পুলিশ দেখেই পুজোর ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে।

বাবা চলে যাবার পর যমুনা পাঁচ মিনিটও আর ঘরে থাকতে পারল না। প্রাণপণে ছুটল কাজিতলার দিকে। বউদি বলল, নিমুদা মানে পানুদার দাদা বাড়ি নেই—কলকাতায় গেছে। পানুদাও বাড়ি নেই, বউদির কাছ থেকে তিনটে টাকা চেয়ে নিয়ে সেই যে বেরিয়েছে এখনো ফেরেনি।

আরো একটা রাত্রি কি আতঙ্ক কি বিভীষিকার মতো কাটল যমুনাই জানে। শুধু রাত কেন, পর দিনেরও সকাল দুপুর পেরিয়ে প্রায় বিকেল পর্যন্ত।

…বাবা ফিরল। দাদা না।

তার মুখ দেখেই যমুনা বুঝেছে ওর জগৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবা‹ মতোই কিছু হয়েছে।

…বাবাকে তার স্কুলেরই আরো কেউ ধরে ধরে নিয়ে এসেছে।·· একটু বাদে পিসিমার বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে কান্না।…নিমুদা এলো পানুদাও। পানুদার মুখের দিকে তাকালে ভয় করে।

সমস্ত ব্যাপারটা জানতে বুঝতে যমুনার অনেক সময় লেগেছে। দাদ নেই। দাদা আর কোনদিন আসবে না। দাদাকে আর কোনদিন দেখ‹ না। মিলিটারির গুলিতে দাদা রাস্তার ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়েছে তারাই দাদাকে তুলে নিয়ে গেছে। তার পরেও দাদার দেহ তারা ছাড়েনি আজ তাদের প্রহরাতেই দাদার দেহ ছাই হয়ে গেছে। দাহ শেষ হবা‹ পর বাবা আর নিমুদা ফিরেছে।

…কখন বিকেল গেছে, সন্ধ্যা পেরিয়েছে। রাত। মা-কালীর পট বু‹ নিয়ে যমুনা পুজোর ঘরে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। এমন শোকে‹ মুখেও তাই দেখে পিসির চোখে হুল ফুটেছে।—করলি কি? অশৌচে‹ মধ্যে কালীকে ছুঁলি?

যমুনা কি-ভাবে তাকিয়েছিল জানে না। পিসি ওর মুখের দিকে চেয়ে থতমত খেয়েছে। তারপর সরে গেছে।

যমুনা বসেই আছে। মাঝে মাঝে বলছে, এ কি করলে মা? ও‹ এ-সব কি বলছে। দাদা আর আসবে না, দাদাকে আর কোনদিন দেখ‹ না—এ কি হয় নাকি? এ কি তুমি হতে দিতে পারো? এ কি তুমি করতে পারো? তাহলে এ কি করলে মা?

সামনে পানুদা দাঁড়িয়ে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে যমুনা ভয় পেয়ে গেল। নৃশংস নিষ্ঠুর মুখ। ওর বুকে ধরা কালীর পটের দিকে চেয়ে আছে।

…কি বলছিস তুই? কি বললি? ওই রক্তখাকী সর্বনাশী এ-ভাবে জিতুদাকে নিয়েছে? জিতুদার রক্ত খেয়েছে? ওর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব না—ওকেও আমি যম-দোরে পাঠাব না? দে—দে বলছি!

ঝাঁপিয়ে পড়ল। পট নিয়ে কাড়াকাড়ি। নেবেই। আছড়ে ভাঙবেই।

তারপর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বেই। আর যমুনা প্রাণপণে তাকে রক্ষা করছে। আর চিৎকার করছে।

বাবা আর পিসি এসে ওকে আটকালো। তারপরে যোল বছরের ছেলের সেই গর্জন।···কালী জিতুদাকে নিয়েছে যখন, তার রক্ত খেয়েছে যখন, তাকে আরো অনেক রক্ত খাওয়াবে—আশ মিটিয়ে রক্ত খাওয়াবে—যেখানে সাহেব দেখবে মারবে—যেখানে পুলিশ দেখবে মারবে—মেরে মেরে একদিন নিজে ফাঁসি যাবে! কেউ তাকে রুখতে পারবে না—কেউ না কেউ না কেউ না!

বড় দুঃখে আর শোকের মধ্যে হলেও দিন বসে থাকে না। গড়িয়েই চলে। বাবা স্কুলে যায়, আসে। কোচিং ক্লাস করে টিউশনি করে। আগেও বাড়িতে কথা বার্তা কম বলতো—কার সঙ্গেই বা বলবে? এখন সটা আরো কমেছে। আর তফাতের মধ্যে রাতের আফিমের মাত্রা বড়েছে। বাবার কথায় যমুনাকেও আবার বইখাতা নিয়ে বসতে হচ্ছে, ফুলে যেতে হচ্ছে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছে জীবনে ও আর এক পা এগোতে পারবে না, এখানেই থেমে গেল। বাবা কাজের কথা বললে বা ়ই নিয়ে বসতে বললে রাগ হয়ে যেত। রাগ করে ঠাকুর-ঘরেও যেত না। াবাকেই সব গুছিয়ে নিতে হত। তাতে বাবার খুব কষ্ট হত। বাবার কষ্ট ক'দিন আর চোখ চেয়ে দেখা যায়? অগত্যা আগের মতোই ভোরে উঠে ম্নান করে, বাগানের ফুল তোলে, পুজোর ঘর পরিষ্কার করে, পুজোর উপকরণ গোছায় চন্দন ঘষে, নৈবেদ্য সাজায়। অভিমানে মা কালীর পটের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করে না। আবার না তাকিয়েও পারে না। মনে হয়, মা কালী এমন চেয়ে আছে যেন কিছুই হয়নি, সব আগের তোই আছে।

···অনেক দিন স্কুল কামাই করেছে। বাবা বলা সত্ত্বেও বই নিয়ে সেনি। তারপর হঠাৎ মনে হয়েছে, দাদা কোথাও নেই এ তো হতে ারে না। যেখানে যত দূরে থাক ওকে দেখছে। ওর পড়াশুনার ব্যাপারে

দাদার কি আগ্রহই না ছিল। · যমুনার চার বছর বয়সে একবার নাকি দারুণ অসুখ হয়েছিল। টাইফয়েড না কি নাম রোগটার। সেদিন এ রোগের চিকিৎসা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। সোনা পিসির মুখে শুনেছে সে-সময়ে এ-রোগে যত না বাঁচত তার থেকে ঢের বেশি মরত। যমুনা নাকি মরতে মরতে বেঁচেছে। তারপর সেই রোগের নানা উপসর্গ নাকি ওকে ছেঁকে ধরেছিল। পিসি বলে, সব থেকে বেশি খেয়ে দিয়েছিল যমুনার মাথাটা। কি করত কি বলত তার ঠিক নেই। বাবা তখন ওকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। শ্যামনগরের ডাক্তার বলেছে, মাথা জখম হয়ে গেছে, ঠিক হওয়া শক্ত—তাই। যমুনার অবশ্য এত কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে ও অ আ ক খ পড়া শুরু করেছিল সাত বছর বয়সে—যে বয়সে মেয়েরা ক্লাস টু-তে অন্তত পড়ে। অমন বেশি বয়সে পড়া শুরু বলেই এখন তেরো বছরের ধিঙ্গি মেয়ের ক্লাস ফাইভে পড়ার খোঁটা সকলের। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে ও উৎসাহ পেত কেবল দাদার কাছে। বেশি বয়সে একেবারে ছোট মেয়েদের সঙ্গে পড়ছে, দাদা ওর এই লজ্জা আর দুঃখটা বুঝত। একেবারে হেসে উড়িয়ে দিত। বুড়ো বয়সে কত লোকের কত কি পড়াশোনার গল্প করত। পড়ে পড়ে একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়ে কত মানুষ কত কি আবিষ্কার করেছে সেই গল্পও করত। দাদা নিজে আগ্রহ করে ওকে পড়াতো, পড়া না পারলেও কক্ষনো বকত না।....মারা যাবার ক'দিন আগেও কি মনে যেন বলেছিল, মেয়েদের পড়াশুনা না করে ঘরে বসে থাকার দিন আর নেই, তোকে খুব কম করে এম. এ. পর্যন্ত পাশ করতে হবে মনে রাখিস। দাদা তখন বি. এ. পড়ে—সেটাই পাহাড়ের মতো মস্ত ব্যাপার ভাবত যমুনা।

···সেই দাদা এখন কি দেখছে? ও পড়াশুনা বন্ধ করে, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে বসে আছে! দাদার শোকে দু'বেলা ভাত খাওয়া তো বন্ধ হয়নি? দাদা কষ্ট পাচ্ছে না—দুঃখ পাচ্ছে না?

পরদিন থেকেই স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। বই নিয়েও বসছে। স্কুলের দিদিমণিরা আর উঁচু ক্লাসের মেয়েরা কিছুদিন বেশ সদয় ব্যবহার করে ওর সঙ্গে। অঙ্ক না পারলেও অঙ্কের টিচার বকেনি। সকলকেই ওর দুঃখে

ভাগিদার মনে হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই যে-কে সেই। যমুনার মনে হয়েছে কেউ বেশি দিন শোক মনে রাখে না। ··এমন যে পানুদা, যার শোক যমুনার থেকে একটুও কম মনে হয় না সে-ও কি আবার বেশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে না? দিনে দিনে তার দুরন্তপনা আর অবুঝপনা বাড়ছে না? দাদার কথা উঠলে অবশ্য ওর চোখে জল আসে মেজাজ বিগড়য়, খুনের বদলা নেবে বলে হম্বিতম্বি করে—কিন্তু যমুনার দুঃখ কি ও সব সময় মনে রাখে? রাখলে এমন জ্বালাতন করে?

যমুনার সেই নিজের জগৎটা ধূসর পাণ্ডুর হয়ে গেছে। বাগানের ফুল-গুলি ওকে দেখে আগের মতো আকুলি বিকুলি করে না, শান্ত পুকুরের দিকে চেয়ে এখন আর রূপকথার রাজপুত্র আর দীঘির গভীরে রাক্ষসের প্রাণ ভোমরা-ভোমরির চিন্তায় তন্ময় হতে পারে না, গাছগুলোও সব বিমর্ষ, ফুলের ভারে নুয়ে পড়লেও ওরা আর যমুনাকে সে-ভাবে ডাকে না. কাঠবেড়ালি আর প্রজাপতির পিছনে ছোটা বন্ধ হয়ে গেছে, বসন্তের কোকিলের ডাক শুনে হঠাৎ হঠাৎ কান্না পায়, মাথার ওপরে নীল আকাশটাও যেন ওর জগৎ থেকে দূরে সরছে, মেঘে-মেঘে জোড় লাগিয়ে আগের মতো আর পাহাড় দৈত্য-দানব ময়ূর কিছুই বানাতে ইচ্ছে করে না। তবু যমুনা এই বিবর্ণ জগতের মধ্যেই সেঁধিয়ে থাকতে চায়। তা না হলে ওর আর ঠাঁই কোথায়?

কিন্তু ওর এতটুকু শান্তির মধ্যেও সব থেকে বেশি হামলা করে চলেছে পানুদা। এমন এক একটা কাণ্ড করে যে মনে মনে যমুনা নিষ্ঠুর বাস্তবের ওপর আছড়ে পড়ে। অকারণে কেউ এমন নির্দয় হতে পারে কি করে যমুনা ভেবে পায় না। নিষ্ঠুর হয়ে এমন আনন্দ পায় কি করে? ··সেদিন একটা রাস্তার কুকুরকে তিন-চারটে ছেলেকে নিয়ে ও আর ফণীদা কি-ভাবে ঠেঙিয়ে একেবারে মেরেই ফেলল। ওটা নাকি পাগলা হয়ে যাচ্ছে, লোকজনকে তেড়ে যায়। সকলে মিলে কুকুরটার মাথা ফাটিয়ে চৌচির করে দিল। মেরে ফেলে সকলের চোখে মুখে সে কি উল্লাস। কেউ জানে না, ওই দৃশ্য দেখে যমুনা দু'তিন দিন মুখে ভাত তুলতে পারেনি। কেবলই গা ঘুলিয়েছে। এই বাগানে এসেও হামলা করা বেড়েছে পানুদার।

গাছের পাখির বাসা ঢিল মেরে ভেঙে দেয়, হাতের টিপ খুব—পাথর ছুঁ
গাছের কোকিল আর রঙ বেরঙের পাখি মারতে চেষ্টা করে। সে-দি
কোন এক বস্তিতে একটা জ্যান্ত শূয়োর পোড়ানো দেখে এসে হেসে-হে
যখন কতক্ষণ ধরে কি ভাবে মারা হল বলছিল—যমুনার বমিই পাচ্ছিল
এই সব নিষ্ঠুর ব্যাপারগুলোই হামলার মতো, যমুনাকে যেন চুলের মু
ধরে ওর জগৎ থেকে টেনে এনে অন্য মাটিতে আছড়ে ফেলার মতো হয়
বোবা যন্ত্রণায় ও ছটফট করতে থাকে।

…অথচ এই পানুদার ভিতরে দয়া মায়া একেবারেই নেই, বিশ্বা
করে কি করে? এই তো গেল বারের মানে তেতাল্লিশ সালের কথা
রাজ্য জুড়ে কি দুর্ভিক্ষটাই না হয়ে গেল। ঘরে ঘরে হাহাকার। আর তখ
শ্যামনগরে এত ভিখিরি কি কেউ কখনো দেখেছে! মাঝরাতেও তাদে
আর্তনাদ শোনা গেছে—কিছু খেতে দিয়ে প্রাণ বাঁচাও গো! ভাত দাও—
ফ্যান দাও।

…এই পানুদা তখন কম করেছে? ওর বয়সী ছেলেদের নিয়ে বাড়িতে
বাড়িতে গিয়ে ভিখিরিদের জন্য ভিক্ষে করেছে, প্রত্যেককে বলেছে বাসি
ভাত ডাল তরকারি কেউ ফেলে দেবে না—ভাতের ফ্যান রেখে দেবে,
আমরা এসে নিয়ে যাব। নিজে একবেলা খেয়ে আর এক বেলার খাবার
ওদের দিয়ে দিয়েছে—যমুনা নিজের চোখে দেখেছে, খেতে বসেও খাওয়া
হয়নি, উপোসি বাচ্চা-কাচ্চার কান্না শুনে থালার সব ওদের ঢেলে দিয়ে
এসেছে।…আর একবার ওর চোখের মণি নিমুদার ছোট মেয়ে সুমু
তখনো জন্মায়নি, রাণু তখন সাড়ে তিন চার বছরের। মেয়ে একদিন পড়ে
গিয়ে মাথা ফাটিয়ে বসল। নিমুদা তখন কলকাতার অফিসে। পানুদা ছুটে
এসে ওকে খবরটা দিয়েই আবার তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। খবরটা
দিয়েছে রাণুকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্টিচ করিয়ে আনার পর।
যমুনা গিয়ে তার চোখে মুখে যে ত্রাস দেখেছে তা ভোলার নয়। তার
মধ্যেই কি ভীষণ রাগ। হাসপাতালে স্টিচ করতে দেরি হয়েছে নাকি—
গর্জন করে ওর বউদিকে বলছিল, রাণুর যদি এতটুকু ক্ষতি হয়, হাস-
পাতালের দু'জন ছোকরা ডাক্তারকে দু'দুমাসের জন্য ও হাসপাতালে

শুইয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে। আর সমস্ত রাত সে দিন নাকি রাণুর মাথার কাছে বসে কাটিয়েছে।

···একই ছেলের এমন নিষ্ঠুর আবার এ-রকম দয়া-মায়ার শরীর হয় কি করে যমুনা ভেবে পায় না।

পাঁচ ছ'মাস ধরে ওকে জ্বালাবার আর এক নতুন রসদ পেয়েছে ওই বিচ্ছু। কোত্থেকে ও এ-রকম একটা গা জ্বালানো ছড়া-পাঁচালি খুঁজে পেল যমুনা জানে না। ওই ফণে হারামজাদাই শিখিয়েছে কিনা কে জানে। প্রথম যেদিন ওই ছড়ার হুল ফোটালো—ওই পাজিও তো পাশে দাঁড়িয়ে তালে তালে তালি বাজাচ্ছিল আর হ্যা-হ্যা করে হাসছিল। ছড়াটা কিন্তু এমনি শুনতে বেশ মিষ্টি কিন্তু ওটা শুনে যমুনার হাড়-পিত্তি জ্বলার যথেষ্ট কারণ আছে।

···সেদিন বিকেলের দিকে যমুনা পুকুর ঘাটের উঁচু ধাপে বসেছিল। দুই পাজি কখন চুপিচুপি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি। হঠাৎই চেনা-গলায় টেনে টেনে ওই ছড়া—

যমুনাবতী সরস্বতী
　　কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনা যাবে শ্বশুর বাড়ি
　　কাজি-তলা দিয়ে।
কাজি-ফুল কুড়োতে
　　পেয়ে গেলাম মালা,
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম
　　সীতারামের খেলা।
নাচ তো সীতারাম কাঁকাল বাঁকিয়ে
আলো চাল খেতে দেব কোঁচড় ভরিয়ে।

যমুনা একেবারে হাঁ হয়ে গিয়ে ঘুরে বসে ওদের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। এটা কোনো ছড়া কবিতা, না ওর জন্যেই বানানো হয়েছে ভেবে পায়নি। তাই দেখে দুই পাজির মুখেই সে কি হাসি—প্রত্যেকটা লাইন ওর মাথায় গেঁথে দেবার [illegible] ায় সুর করে পানুদা আবার ওটা বলেছে,

আর ফণীদা তালে তালে হাত তালি দিয়েছে।···যমুনার প্রথমে মনে হয়েছিল, ওকে রাগাবার জন্য শলা পরামর্শ করেই দুই পাজিতে মিলে এটা বানিয়েছে। কিন্তু একটু পরেই তা আর মনে হয়নি। ওই ফণে তো সর্ব বিষয়ে দিগ্‌গজ, সব বিষয়ে ফেল করতে করতে পাশ করে। আর একজনও অর্থাৎ পানুদাও সংস্কৃততে যেমন পণ্ডিত বাংলায়ও প্রায় তেমনি। তার মগজেও এমন ছড়া গজাতেই পারে না।···তাহলে এটা অন্য কারো মানে কোনো কবি-টবির ছড়া-টড়া হবে। কিন্তু ওর নাম নিয়ে ওকে জ্বালাবার জন্য কে আবার এমন ছড়া বানাতে গেল।

বলার পরেই কি জ্বালাতন করার শেষ! দ্বিতীয় দফা বলার পর দু'নম্বর পাজি মানে পানুদা (ফণীদাকে যমুনা বরাবরই পাজির শিরোমণি ভাবে) চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, যমুনাবতীর কবে বিয়ে রে ফণে? ফণীর জবাব, যমুনাবতীর কাল বিয়ে। আবার প্রশ্ন, যমুনা কোথা দিয়ে শ্বশুর-বাড়ি যাবে রে? জবাব, যমুনা কাজিতলা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। কেন— তারপরই প্রশ্ন—কেন, যমুনা কাজিতলা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন? কাজিতলায় কার বাড়ি? জবাব, কাজিতলায় তোর বাড়ি।

সত্যিই পানুদারা যেখানে থাকে সেই জায়গার নাম কাজিতলা। তাহলে কি দাঁড়ায়? ওই শয়তানের বাড়িই যমুনার শ্বশুরবাড়ি।

যমুনা যদি রাগে গজরাতে গজরাতে চলে না আসত, তাহলে হয়তো ওই ছড়ার পরমায়ুও কম হত। কিন্তু শোনামাত্র রাগে ওর চোখ মুখ লাল হয় আর ওই পাজিও ওটা ততো বেশি বলে।··এক রোববারের দুপুরে তো ওকে বাগানেই পুঁতে রাখতে ইচ্ছে করছিল যমুনার।

এক টোপর জামরুল নিয়ে যমুনা মাটিতে বসে চিবুচ্ছিল আর এলো-মেলো কি সব ভাবছিল হঠাৎ—

যমুনাবতী সরস্বতী
কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনা যাবে শ্বশুরবাড়ি
কাজিতলা দিয়ে।

পিছনে ওই গলা আর ছড়া শোনামাত্র যমুনা ছিটকে উঠে দাঁড়ালো।

টোপরের জামরুল ঝরঝর করে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পা বাড়ানোর আগেই পাজিটা খপ করে ওকে ধরে ফেলল। হাত ছাড়িয়ে যাবার জন্য ধস্তাধস্তি। যমুনার গায়ে জোর একেবারে কম নয়—কিন্তু ওই দস্যির সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

ওকে শক্ত করে ধরে রেখেই আপোসের সুরে পানুদা বলল, আচ্ছা, সীতারামের মতো তুই একবার কাঁকাল বাঁকিয়ে নেচে দেখা—তাহলে ছেড়ে দেব।

রাগ হলেও যমুনার কৌতূহল তো একটু মনের তলায় আছেই।—কাঁকাল কি?

এ মা, তুই কাঁকাল কি তা-ই জানিস না—কাঁকাল বাঁকিয়ে নাচাও বুঝিস না! খপ করে কোমরের একটু নিচের দু'দিক শক্ত করে ধরে বার-কয়েক এ-দিক ও-দিক করল। এই হল কাঁকাল বাঁকিয়ে নাচা—কাঁকাল মানে কোমর।

যমুনা পরে ডিকশনারিতে দেখেছে, কাঁকাল মানে কোমর বটে। দেখে রাগ আরো বাড়া ছাড়া কমে কি করে? বাংলায় যে-ছেলে টায়েটোয়ে পাশ করে সে এমন একটা শব্দের মানে জানল কি করে? ওকে জ্বালাবার জন্যই আর এ-রকম অসভ্যতা করার জন্যই জেনে নিয়েছে তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে!

···যমুনার জগৎ তো ধূসর হয়ে গেছেই, সর্বদা এ-রকম হামলা আর খোঁচাখুচির ফলে জীবনও অসহ্য হয়ে উঠছিল। অল্পেতেই ক্ষেপে যায়। সময় সময় বাবা বা পিসির ভালো কথা শুনলেও রাগ হয়। কিন্তু তেতে উঠলে বা রাগ হলে আরো কষ্ট। চিৎকার করতে পারে না, বকাবকি চেঁচামেচি করে রাগ সে-ভাবে প্রকাশ করতে পারে না। নিজের ভিতরে গুমরোতে থাকে। সব থেকে বেশি অসহ্য হয়ে উঠছিল অঙ্কের মাস্টারির নামে অত্যাচার আর উৎপীড়ন।

···শেষে এই একদিন সহ্যের শেষ। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে খান-খান। পানুদার এত ভালো ম্যাট্রিক পাশ করার রাতে যমুনার এই মূর্তি, এই বিদ্রোহ।

…এই বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল যমুনার জানা নেই। আরো বছর দুই পরে শুনেছিল অবশ্য। শুনে যত আনন্দ ততো লজ্জা।

অন্ধকার রাতে পানু বাতাস সাঁতরে বাড়ি ফিরেছে। সদ্য সদ্য এই আনন্দটা পাশ করার আনন্দ মোটেই নয়। এর স্বাদ আলাদা, রস আলাদা। এ যে এত সুন্দর ওর কোনো কল্পনার মধ্যে ছিল না।…সেটা এত দেখা যমুনাব মধ্যেই বড় আশ্চর্য আর এক যমুনাকে আবিষ্কার করার আনন্দ।…ফণেটা একটা শয়তান হারামজাদাই বটে। পাশ করার আনন্দে যমুনাকে নিয়ে আজও কি কদর্য কথাই না বলেছে। ও যমুনাকে যে-টুকু বলেছে, ফণী তার থেকেও অনেক রসালো ঠাট্টা আর ইঙ্গিত করেছে। …যমুনার শরীরটাকে নিয়ে ওর মধ্যে একটা লোভই কেবল উসকে দিতে চেয়েছে। যার ফলে ভিতরে ভিতরে পানুরও লোভী হতে সাধ গেছে। আজ কেন, অনেক দিন ধরেই ফণে হারামজাদা এই লোভের ইঙ্গিত ইশারা করে আসছে।

কিন্তু যমুনার মধ্যে আজ যাকে দেখল যাকে আবিষ্কার করল তাকে কি ফণী কল্পনাও করতে পারবে? পানু এই একটা রাতের আগে নিজেই কি পেরেছিল? আজ বিকেল আর সন্ধ্যা থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি পানুর মনে গেঁথে আছে।…বিকেলে মিষ্টির ডালি নিয়ে গেল যখন মেয়ের চোখে মুখে কি রাগ আর কি ঝাঁঝ—রাগের চোটে স্কুলে পর্যন্ত যায়নি।…গত সন্ধ্যায় ওর মাথায় ও-ভাবে মেবে বসার পরেও পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে শুনে পানু সব ভুলে স্বার্থপরের মতো কালীর কাছে প্রার্থনা করার জন্য যমুনার কাছেই ছুটে এসেছিল। কিন্তু অমন ঠাণ্ডা মেয়েটার মধ্যে ও-ভাবে ঝলসে ওঠার মতো সত্তা আছে, এ কি পানু কোনদিন জেনেছে? এখন মনে হচ্ছে, থাকবে না কেন, কার বোন? সত্যিই তো, এত অত্যাচার করার সময় জিতুদার কথা ওর কোনো সময় মনেই হয়নি।… এই রাতে যমুনা ফুঁসে উঠে বলেছে, আজ দাদা বেঁচে থাকলে তোমার এত সাহস হত?

অন্ধকারে হাসতে হাসতে পথ চলেছে পানু। ঘরে ফেরার তাড়া নেই। ভাবতে অদ্ভুত ভালো লাগছে, সব কথা ফের মনে আনতে ভালো লাগছে।

রাগের চোটে যমুনা কালীর কাছে প্রার্থনা করেছিল, এবারে যেন ও ফেল করে, ওকে ফেল করিয়ে মা কালী যেন ওর অহংকার চূর্ণ করে, একবার অন্তত ভালো করে শিক্ষা দেয়।···পানু নিজের কান ছুটোকে বিশ্বাস করেনি, বলেছিল, এখনো রাগের চোটে তুই বাজে কথা বলছিস। ···জবাবে কি স্পষ্ট অথচ বিষণ্ণ গলায় যমুনা বলেছিল, মা কালীর নাম নিয়ে আমি মিথ্যে কথা বলি না, যা করেছি তাই বললাম।

কিন্তু রাগের মাথায় অমন প্রার্থনা করার পর সমস্ত রাত আর সকাল থেকে কে সব থেকে বেশি কষ্ট পাচ্ছিল ? ও নিজেই।···তারপর থেকে নিজের ওপরেই রাগে জ্বলছিল, তবু জোর দিয়ে নাকি বার বার বলেছে বেশ করেছে—একবার ওর বজ্জাতির শিক্ষা হওয়া উচিত। রাতে ঘুমোতে পারেনি, ভোর রাতে স্বপ্ন দেখেছে জিতুদা হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, এই মেয়ে, কি বোকার মতো করলি বল তো ? ··আর সকালে পট তুলে মনে হয়েছে, মা কালীও ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে আর জিতুদার মতো করেই মিষ্টি করে বকছে আর সেই থেকে রাগে, নিজের ওপরেই রাগে, ওই মেয়ের মাথার ঠিক ছিল না।

পানুর এখনো বদ্ধ বিশ্বাস যমনাকে ডবল আনন্দ আর ডবল শাস্তি দেবার জন্যই মা কালী ওকে অত ভালো পাশ করিয়ে দিয়েছে। ফেল করিয়ে দিলে অনুশোচনায় পরে যমুনাই জ্বলে পুড়ে মরত, এ মা কালীর থেকে ভালো আর কে জানে ?

পানুর ভালো পাশ করার আনন্দে দাদাও আজ উদার। সন্ধ্যার দিকে গঙ্গার ধারে গিয়ে একটা বড় ইলিশ মাছ কিনে এনেছে। বউদিকে বলেছে, পেনোকে বেশি করে দাও।

খেতে খেতে পানুর মনে হয়েছিল, এমন স্বাদের গঙ্গার ইলিশ যমুনাকে ছু-টুকরো খাওয়াতে পারলে বেশ হত। পানুর মজাই লাগছে, এই গোছের চিন্তাও তো আগে কখনো করেনি।

অনেকক্ষণ ধরে মনে যা ছিল, রাতে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে আগে তাই করল। এই ঘরেই জিতুদার আর একখানা ফোটো টাঙানো। বিকেলে আজ এখানেও মালা পরিয়েছে। কিন্তু তখন নিজের ভালো

পাশের আনন্দটাই কেবল উপলক্ষ ছিল। এখন মনের তলায় অন্য তাড়না সামনে এসে দাঁড়ালো।

দু'হাত জোড় করে বলল, জিতুদা, এতদিন ধরে তুমি সব দেখে যাচ্ছ সব লক্ষ্য করে যাচ্ছ, কিন্তু আমি এত পাজি যে তোমার কথা ভাবিইনি। তুমি যমুনাকে কত ভালবাসতে জেনেও তোমার চোখের সামনে বসেই ওকে অঙ্ক শেখাবার নাম করে আমি কত শয়তানি করেছি, মেরেছি, কত কষ্ট দিয়েছি। যমুনা ঠিকই বলেছে, তুমি দেখে গেছ আর ওর থেকেও বেশি কষ্ট পেয়েছ।...এই শেষ বারের মতো তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও জিতুদা। এবার থেকে তোমার যমুনার সব ভাব আমার—সব সব সব —আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ জিতুদা?

বোঝাতে গিয়ে পান্নুর নিজেরই মুখ লাল।

পরিবর্তনটা অনুভব করতে যমুনার বেশিদিন লাগল না। পরদিন তো ও অঙ্ক নিয়ে বসতেই চায়নি। মুখ ঝামটা দিয়েছে, তোমার কাছে আর আমি পড়ব না বলেই তো দিয়েছি।

পান্নু হেসে বলেছে, আচ্ছা, আজ অঙ্ক থাক তাহলে, তোর রাগ পড়ুক।

—রাগ পড়বে না আরো কিছু, তুমি তো সব সময়েই রাগাও।

—কিন্তু রাগটা এতদিন তুই আমাকে বুঝতে দিসনি কেন? কালকের মতো অমন কালীমূর্তি ধরলেই দেখতিস আমি টিট হয়ে গেছি।

যমুনা লজ্জা পেয়ে বলেছে, কালীর নাম নিয়ে ইয়ারকি ভালো লাগে না বলে দিলাম।

এরপর প্রথম দিনকতক যমুনা মনে মনে একটু অবাকও হয়েছে। দেখিয়ে আর বুঝিয়ে দেবার পরে দু'বার করে ভুল করলেও এই ছেলে হাসে যে! তারপর দিন ভুল করতে হেসে-হেসে আরো অবাক কথা বলল। —এখন থেকে তুই যত ভুল করবি আমার ততো লাভ হবে।

—কি লাভ?

—আমি ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করে যাব।

আশ্চর্য, এক সপ্তাহের মধ্যে যমুনার অঙ্ক ভালো না লাগুক এই

ছেলের মাস্টারি ভালোই লাগছে। ভুল করলে আরো সহজ করে বোঝানো যেন তার দায়। সেদিন খুব মন দিয়ে একটা অঙ্ক কষে পদ্ধতি সব ঠিক করে শেষে চার আর তিন যোগ করে আট বসিয়ে ফল নামাতে ভুল করে বসল। পানুদা হেসে উঠল। লজ্জা পেয়ে যমুনা বলল, সত্যি এবারে আমার পিঠে তুমি বসাও তো এক ঘা।

পানুদা হঠাৎ গম্ভীর একটু। বলল, ফের তোর গায়ে হাত তুললে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়।

যমুনা চমকেই উঠেছিল। তারপর রেগে গেছল। বোকার মতো কিছু বলে ফেললেই হল—না? সত্যি যদি হাত তুলে বসো তখন?

-শাস্তি পাব, কুষ্ঠ হবে।

রাগের কারণ ভয়। কিন্তু এই মতি যমুনার ভালোও কম লাগেনি। এরপর ডবল মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক ঠিক করতে চেষ্টা করে। ওর এই ছেলেমানুষি নিবিষ্টতা পানু চেয়ে চেয়ে দেখে। আর মনে হয়, ক'দিন আগে পর্যন্ত ওর কি দেখার চোখও ছিল না? দেখতে সব থেকে ভালো লাগে যমুনা যখন পেন্সিলের উল্টো দিকটা একটু একটু দাঁতে কামড়ে অঙ্কের খাতার দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে, এই জটিলতা থেকে কোন রাস্তা দিয়ে বেরুবে। সুন্দর দাঁতের সারির কয়েকটা ঝিকমিক করে ওঠে।

কিন্তু যমুনার নিজেকে নিয়েই যন্ত্রণা। দারুণ মন দিয়ে কষে ওর কাছে বেশ একটা কঠিন অঙ্কও হয়তো ঠিক রাস্তা ধরে বাগে এনে ফেলেছে, শেষে সামান্য যোগ বিয়োগ গুণ বা ভাগে একটা বিচ্ছিরি ভুল করে বসে। যতক্ষণ ঠিক ততক্ষণ পানু খুশি মনে দেখতে থাকে। কিন্তু ও-রকম ভুল করতে দেখলেই ধৈর্য খুইয়ে আর প্রতিজ্ঞা ভুলে মারার জন্য হাত আপনি উচিয়ে ওঠে।

—এই! যমুনা চোখ পাকায়।

—এতটা ঠিক এগিয়ে শেষে এমন বাজে ভুল করবি!

—ভুল হয়ে গেলে কি করব—তোমাকে অমন বাজে প্রতিজ্ঞা করতে কে বলেছিল?

—কি প্রতিজ্ঞা করলাম?

—গায়ে হাত তুললে হাতে যেন ওই ইয়ে হয় বলোনি ?

পান্নু চেয়ে থাকে। হাসে। কান মন ভরে যায়।···মার খেতে আপত্তি নেই মেয়ের, যে মারবে তার হাতে কুষ্ঠ হবার ভয়েই অমন চোখ পাকাচ্ছে।

এরপর দিনে দিনে দু'জনের মধ্যে যেন একটা অলিখিত শর্ত ক্রমে পাকা হয়ে উঠছে। পান্নু ওর গায়ে হাত তুলবে না, আর যমুনাও প্রাণপণে চেষ্টা করবে একবার ভালো করে বুঝিয়ে দিলে সে-অঙ্ক আর যেন ভুল না হয়।

পান্নু কলকাতার কলেজে আই-এসসিতে ভর্তি হয়েছে।···রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। যমুনা জানে, ওর দাদা মানে নিমুদা বলেছিল, কলকাতায় না পড়ে হুগলি কলেজে গিয়ে ভর্তি হতে। সে-ও নাকি ভালো কলেজই। নিমুদার আপত্তি টাকার জন্যে নয়। আগের থেকে তার দিন অনেক ফিরেছে। বিলিতি তেলের অফিসে সামান্য কেরানির চাকরি করত। কাজের গুণে বড় কর্তাদের চোখে পড়েছে। পর পর দু'দুটো প্রমোশন পাবার পরে মাঝারি গোছের পদস্থ এখন। তার আপত্তির কারণ, যুদ্ধ যদিও থেমেই এসেছে, কিন্তু স্বদেশীঅলাদের গণ্ডগোল বেড়েই চলেছে, কলকাতার ছাত্ররাও এই নিয়ে খুব মাতামাতি করেছে—কলকাতার কলেজে পড়াশুনা তেমন হচ্ছে না।

কিন্তু এই মাতব্বর বাবু সেই কলকাতার কলেজে গিয়েই ভর্তি হয়েছেন। যমুনার ওটা একটুও পছন্দ হয়নি। হবে কি করে, স্বদেশী করতে গিয়ে দাদার ওই মৃত্যু সে ভুলবে কি করে ? যমুনার ধারণা, কলকাতায় পড়ার আসল টান কলেজ নয়, আসল টান প্রাণের বন্ধু ফণী শিকদার। দু'জনে দুজনকে চোখে হারায়। কলকাতায় না পড়া মানেই তো অনেকটা ছাড়াছাড়ি। যমুনা দু'চক্ষে দেখতে পারে না ওই ফণী শিকদারকে। এই বয়সেই ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে মেয়েছেলের গা চাটে, আরো বড় হলে কি হবে! মা কালী যে কি জন্যে এই পাজীর সঙ্গে পান্নুদার এত বন্ধুত্ব পাতিয়ে

ছিল।

ভর্তি হয়ে যাবার পরেও যমুনা মুখ ঝামটা দিতে ছাড়েনি, কেন দাদার কথা শুনে হুগলী কলেজে পড়লে হত না? যে টাকা খরচা করে পড়াবে তার কথা শুনবে না কেন?

পানুর জবাব, তুই একটা বোকা, শ্যামনগর থেকে সেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে নৈহাটি যেতে হবে, নৈহাটি থেকে গঙ্গা পার হলে তবে কলেজ।

—হলেই বা, কলকাতার কলেজে ছেলেরা পড়াশুনা করে না, কেবল স্বদেশী করে—হাঙ্গামা লেগেই আছে, তার মধ্যে যাবার কি দরকার ছিল?

পানুর প্রশ্ন, জিতুদা স্বদেশী করে কি খারাপ কাজ করত?

একটু মিইয়ে গিয়ে যমুনা জবাব দিয়েছে, প্রাণটা তো খামোখা গেল।

এই বাবু কথায় কম যাবে কেন? অমনি বলে উঠেছে, খামোখা প্রাণ তো ঝড়জলের দিনে গঙ্গা পার হতে গিয়েও যেতে পাবে—স্বদেশী করে প্রাণ গেলে তার থেকে ভালো না খারাপ?

যমুনা খুব দমে গেছল। তবু বলে উঠেছে, যাও যাও···আসলে কলকাতা পড়তে যাচ্ছ প্রাণের বন্ধু ফনী শিকদারের টানে, আমার বুঝতে বাকি নেই।

পানু হেসে উঠেছে। বোঝার কি দারুণ ক্ষমতা তোর···কিন্তু তুই এ-কথা বলছিস কেন, দাদা বউদি কিছু বলেছে?

—তারা আবার কি বলবে?

—কিছু না বললেও শুনে রাখ, এ শর্মা আর দাদার টাকায় না পড়তেই চেষ্টা করবে—যে ভাবে হোক, নিজের সব খরচা আমি নিজেই চালাব।

যমুনা এই জোরের রাস্তাটা কি ভেবে পায়নি। জিজ্ঞেস করেছে, কি করে?

—দেখিস 'খন··· ।

দেখেছে! দু'মাস না যেতে একটা ভালো টিউশনি যোগাড় করেছে। শ্যামনগরেই। এখানকার এক জুট মিলের বড় চাকুরে ওদের ক্লাবের প্রেসি-

ডেণ্ট। ভালো ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে পানুদার তার কাছেও খাতির কদর ছিল। এত ভালো পাশ করতে সেই ভদ্রলোকই তার আরজি মঞ্জুর করেছে। পানুদা তাকে একটা ভালো টিউশনি যোগাড় করে দেবার কথা বলেছিল। ভদ্রলোক নিজেই তার দুই ছেলের জন্য ওকে বহাল করেছে। ক্লাস ফাইভ আর ক্লাস সেভেন-এ পড়ে দুই ছেলে। পানুদার বরাত জোরে তারাও অঙ্কে কাঁচা। ঠিক হয়েছে, শনিবার বিকেলে রবিবার দুপুরে আর অন্য একদিন সন্ধ্যার পর পানুদা তাদের অঙ্কের মাস্টার হবে। মাইনে মাসে চল্লিশ টাকা। সেই দিনে কম নয়। এতে কলেজের মাইনে, ডেলিপ্যাসেঞ্জারির টিকিট আর টুক-টাক খরচ ছাড়াও মাসে দশ পনেরো টাকা বেঁচে যাবে।

যমুনা গাল ফুলিয়ে বলেছে, ঠিক আছে, বাঁচা গেল, আমাকে আর অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

—কেন, তোর কোথায় অসুবিধে হচ্ছে?

—অসুবিধে কেন, সুবিধেই হচ্ছে—টিউশনি করে নিজের কলেজের পড়া পড়ে তুমি আর আমার ওপর মাস্টারি করার সময় পাচ্ছ কোথায়?

—হুঁ, তোর সঙ্গে কোথাও ক্ল্যাশ করছে না—টিউশনির কি রুটিন করে নিয়েছি শুনলি না?

যমুনা মনে মনে নিশ্চিন্ত একটু। এখন উল্টে সপ্তাহের ক'দিন উদগ্রীব হয়েই থাকে কখন আসবে, অঙ্ক নিয়ে বসবে। এই ক'টা মাসের মধ্যেই অঙ্কের বিভীষিকা মন থেকে সরে যাচ্ছে। সবই যে পারে তা নয়, অনেক ভুল হয়, কিন্তু কঠিন অঙ্ক নিয়েও লড়ে যাবার মনোভাব এসেছে। এটুকুই ষোল আনা লাভ। স্কুলের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় ও বাষট্টি নম্বর পেয়েছে। বাবা সুদ্ধু অবাক। যমুনার ধারণা এর সবটুকুই ওই ছেলের মাস্টারির হাত-যশ নয়। সেটা অবশ্য অনেকখানিই বটে। কিন্তু এ ছাড়াও কিছু আছে। নিজের ভিতরের আগ্রহ উদ্দীপনা আর আনন্দ। আনন্দের এমন স্বাদ আগে কখনো পায়নি। এই আনন্দের ফলেই ভয় কমেছে. নিজের ওপর আস্থা বেড়েছে। ভয়ের যম সাহস এটা অনুভব করতে পারছে।

পরের দু' বছরে যমুনার জগতে আবার শুধু রঙই ধরেনি, কারণে

অকারণে সেই রঙ উছলে ওঠে, উপচে পড়তে চায়। সামনের এই ফুলের বাগানটুকু আগের থেকে আবো বেশি কথা কয়, বেশি কানাকানি করে। পুকুর-পারের বাগানে গিয়ে এখন আর অবশ্য জামরুল বা পেয়ারা গাছের ডালে উঠে বসে থাকে না, প্রজাপতি আর কাঠবেড়ালির পিছনে ছোটা-ছুটিও করে না। ইচ্ছে করে কিন্তু লজ্জাও করে। শরীরটার ছাঁদ ছিরি যে-হাবে বদলেছে আর এখনো বদলাচ্ছে তাতে নিজেরই মনে হয় ধিঙ্গি মেয়ের আব বাচ্চা-কালের মতো ছুটে কাজ নেই। ছোট ছোট মেয়েগুলোর সঙ্গে এখন ক্লাস সেভেন-এ গিয়ে ঢুকতে কেমন লজ্জাই করে। যদিও ওদের ক্লাসে পনেরো বছরের মেয়ে আরো কয়েকটা আছে জানে, কিন্তু ওদেব যা গড়ন ওরা অনায়াসে অন্য মেয়েগুলোর সমবয়সী হয়ে পড়ে। তার ওপর যমুনার যা চাল-চলন আর ধীর স্থিব স্বভাব, উঁচু ক্লাসের বড় মেয়েরাও ওর থেকে বেশি উচ্ছল, বেশি ফটফটে। অল্প-বয়সী দুজন বোগাটে টিচারও ওকে এক-একসময় আড় চোখে লক্ষ্য করে আর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে যমুনা ঠিক বুঝতে পারে। কিন্তু ক্লাসে এসে তারাই আবার ওর ওপর বেশি মেজাজ দেখায়।

...যমুনার আগের সেই শান্তির জগতের সঙ্গে এই জগতের একটা বড়রকমের তফাৎ ও নিজেই অনুভব করতে পারে। সেটা ছিল ওর একলার জগৎ, দোসর কেউ ছিল না। দোসবের নামে ববং উৎপাত ছিল। আগের সেই জগৎটা যমুনাকে একলাই ভরাট করে রাখতে হত...সে-দিনের সেই উৎপাতই আজ ওর এই জগতের দোসর। এই দোসর ঠাট্টা বিদ্রূপ যে করে না তা নয়, সময় সময় ক্ষেপাতে আর রাগাতেও চেষ্টা করে। কিন্তু সুর আলাদা। এই দুষ্টুমি বরদাস্ত করতে যমুনার বরং ভালোই লাগে। মনে মনে মনে এটুকু স্বীকার করতে হয় বলে লজ্জাও পায়। ছুটির দিনের দুপুরে দুজনে ঘাটে বসে কত রকমের গল্প করে, নয়তো গাছের ফাঁক দিয়ে-দিয়ে পুকুরের চারদিকে চক্কর খায়। ঘাটে বসে পানুদার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে দেখলে সোনাপিসির চোখে আবার কাঁটা বেঁধে। বাবাকে শুনিয়ে পর্যন্ত বলেছে, অতক্ষণ ধরে অত কি গল্প তোদের। বাঁচোয়া যে বাবা ওই বকুনির কোনো সূক্ষ্ম অর্থ ধরতে পারে না। এই নিয়ে আবার যমুমা আর

পানুদা হাসাহাসি করে। যমুনা বলে, বুড়ী হলে কি হবে, মাথায় কেবল জিলিপির প্যাঁচ।

পানুদা প্রস্তাব করেছিল পিসি যখন চানের পর পুকুরে কোমর জলে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে আধ ঘণ্টা ধরে জপ-তপ করে, চুপি চুপি তখন একদিন জলে নেমে পা ধরে টেনে মাঝ-পুকুরে নিয়ে ছেড়ে দেব?

দৃশ্যটা কল্পনা করে যমুনা খুব হেসেছিল।—তোমার অত সাহস হবে?

—হয় কিনা দেখবি—বাজি ধরবি?

যমুনার অত সাহস নেই। আজকাল মনে মনে ধারণা, উসকে দিলে ওকে খুশি করার জন্যেই এই দস্যি অনেক কিছু করে বসতে পারে।

ছুটির দিনের আড্ডাটা পরীক্ষার আগেও প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজের পড়ার নাম করে রবিবার দুপুরের টিউশনির পাট সকালেই সেরে আসত।

যমুনা মনে মনে খুশি হলেও মুখে বলত, তোমার পরীক্ষা এসে গেল, পড়াশুনা কখন করো?

পানুদা ছদ্ম রাগে চোখ পাকায়, তুই আমার মাস্টার না আমি তোর মাস্টার?

এ-কথার উত্তরে যমুনা সেদিন নিরীহ মুখ করে বলেছিল, তোমার পরীক্ষার জন্য আমাকে তো মা-কালীর কাছে প্রার্থনায় বসতে হয়, তোমাকে তো আর তা করতে হয় না।

পানুদা হেসে উঠেছিল। বলেছিল, রেজাল্ট বেরুনোর আগে কিন্তু আমি তোকে ধরে খুব মারব—রেগে গিয়ে মা-কালীর কাছে তুই ফেলের প্রার্থনা করবি—ফলে আমি দারুণ ভালো পাশ করে যাব।

হেসেছিল যমুনাও। ও জানে সেই ছেলেমানুষের দিন চলেই গেছে।

আরো একটা ব্যাপার যমুনা লক্ষ্য করেছে আর মজাও পেয়েছে। ওর প্রাণের বন্ধু ফণী শিকদার এই দু' বছরে কতবারই তো শ্যামনগরে এসেছে, পানুদার বাড়িতে রাত কাটিয়ে গেছে। পানুদা তাকে গোড়ায় গোড়ায় কয়েকবার এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ওই পাজি এলে যমুনা মনে মনে

খুব বিরক্ত হয়। ওর চাউনি আর মুখের হাসি আগের থেকেও বিচ্ছিরি লাগে। আর যে-সব ইয়ারকি ঠাট্টা করে যমুনাকে, না বোঝার ভান করে বাঁচতে হয়। একবার হেসে হেসে পানুদাকে বলেছিল, তোব যমুনা একটু বোকাই থেকে গেল রে—তোর এত অঙ্কের মাথা, ওকে একটু চালাক চতুর করে তুলতে পারলি না!

তখন অবশ্য পানুদার হাসি দেখেও যমুনার গা জ্বলেছিল। 'তোর যমুনা' শুনে কান ভরে গেছল বোধহয়—যমুনার বয়ে গেছে কারো যমুনা হতে! সেই রাগের মাথায় এই রকমই ভেবেছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, ফণী শিকদার এলেও পানুদা তাকে আর এখানে নিয়ে আসে না। এসেছিল খবরটা পানুদাই বলে, আর হেসে জানায়, তোর সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিল, আমি এটা সেটা বলে এড়িয়ে গেছি।

বন্ধুব ওপর বিশ্বাস কমছে বুঝে যমুনা দারুণ মজা পায়। কয়েকবার এরকম শোনার পর যমুনা একদিন বলেছিল, কতদিন দেখা হয় না, আসতে চেয়েছিল যখন আনলেই পারতে।

শুনে পানু ধমকেছিল একটু।—তুই ওকে একটুও পছন্দ করিস না আমি বুঝি না?

যমুনাও হেসে বলেছে, ওই শয়তানটাকে তুমি পছন্দ করো কি করে আমি একটুও বুঝি না।

পানুও হেসে বলছে, ওর মতো সাহস খুব কম ছেলেরই হয়, কত বকমের প্ল্যান খেলে ওর মাথায় জানিস না।

- ওর প্ল্যান তুমি ধুয়ে খাবে?

আরো হাসি।—আচ্ছা ওর ওপর তোর এত রাগ কেন বল তো?

—কেন তুমি জানো না? তা হলে আনো না কেন? কি রকম করে তাকায় আর হাসে আর কথা বলে তোমার বুঝতে বাকি আছে?

পানুর আরো বোকা বোকা অবাক মুখ।—তোর দিকে তাকাতে, তোর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে তো সব ছেলেরই ভালো লাগে··· আমারও তো লাগে।

লাগে যে এটুকু যমুনা খুব ভালো করেই বুঝতে পারে আজকাল।

ঠারে ঠোরে তাকায়, চুরি করে একটু আধটু অন্য রকম চোখে দেখেও— যমুনা তখন ইচ্ছে করেই লক্ষ্য না করার ভান করে। আসলে যমুনারও তা একটুও খারাপ লাগে না। কিন্তু ওই পাজির চোখ দেখলে আর হাসি দেখলে গা জ্বলে। তফাতটা কোথায় যমুনা বোঝাবে কি করে? রাগ দেখিয়ে উঠে আসতে যাচ্ছিল। খপ করে হাত ধরে বাধা দেবে জানা কথাই।

এবারে যমুনার ওকে জব্দ করার মতলব। চোখ পাকালো।—এই! তুমি না আমার গায়ে হাত দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছিলে?

—এটা গায়ে হাত দেওয়া হল?

—গায়ে হাত দেওয়া হল না তো কোথায় হাত দেওয়া হল হাতটা গা না?

পানু হেসে ফেলেছে।—তুই একটু দুষ্টু হয়ে যাচ্ছিস যমুনা। কিন্তু দুষ্টুমিতে নিজেও কম যায় না। মেনে নেওয়ার সুরে আবার বলেছে, ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি যখন হোক আমার হাতে কুষ্ঠ।

এবারে যমুনা জব্দ। নিষ্কৃতির রাস্তা বার করেছে। হুঁঃ, খুব মনে আছে তোমার, তুমি গায়ে হাত তুলবে না প্রতিজ্ঞা করেছিলে—গায়ে হাত তোলা মানে হাত ধরা নয়।

শুনে এই দুষ্টু নিশ্চিন্ত হবার মুখ করে নরম গলায় পারমিশন চেয়েছে, তা হলে হাতটা আর একটু ভালো করে ধরি?

পানুর আই-এসসি পরীক্ষা শেষ। এবারে আরো অখণ্ড অবকাশ। যমুনারও গ্রীষ্মের ছুটি। শেষ পরীক্ষার পরেই রাতে যমুনা বাবার সামনেই জিগ্যেস করেছে, পরীক্ষা কেমন হল, আমাকে আবার প্রার্থনায় বসতে হবে না তো?

পানু হেসে জবাব দিয়েছে, বসতে পারিস, ফার্স্ট ডিভিশনও হবে কিনা বুঝছি না। তারপর সাফাই গেয়েছে, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে টিউশনি করে, বাড়িতেও আধঘণ্টা করে রাণুকে পড়িয়ে নিজে পড়ার আর বেশি সময় পেলাম কোথায়—

যমুনা হেসে উঠেছে, সপ্তাহে তিন দিন বিনে পয়সায় আমার ওপর

মাস্টারিটা বাদ দিলে কেন ?

পানুদার নিজের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে যমুনাই আবার সপ্তাহে চার দিনের জায়গায় তিন দিন করে দিয়েছিল। মেয়ের কথার জবাব তার বাবাই দিয়েছে। বলেছে, ঠাট্টা করছিস কি, ছ' বছর ধরে অঙ্কে পঞ্চাশ-ষাট পেয়ে গটগট করে পাশ করে যাচ্ছিস তো ওরই জন্য—এটা কম স্যাক্রিফাইস!

পানু মন্তব্য কবল, একটু মন দিলে পঞ্চাশ-ষাটেব জায়গায় আশী নব্বুই অনায়াসে পেতে পারে।

জবাবে যমুনা ফসফস কবে যা বলে বসল, শুনে পিসি হঠাৎ কিছু বুঝলই না, বাবা ভাবল পাকা মেয়ে, আর পানুর চোখে মুখে আবার কিছু আবিষ্কারের বিস্ময়। যমুনা বলল, আমাব মনটা কি একটা অফুরন্ত ভাণ্ডার যে যেখানে যতটা করে খুশি ঢেলে দিলেই হল।

পরে একলা পেয়ে পানু জিগ্যেস কবতে ছাড়েনি, যা বললি তার অর্থ কি ?

—কি আবার, যা মুখে এলো বলে দিলাম, অঙ্কে যেটুকু মন দিয়েছি তার বেশি আর হবে-টবে না।

পানুর তবু মনে হয়েছে শোনাব মতো কথা, ভাবার মতো কথা।

সকালের কাজ আব একটু পড়া সেবে ছুটির এ সময়টায় যমুনাও মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি চলে আসে। রাণু-সুমুর টানও কম নয়। বিশেষ করে সুমুটার। আড়াই বছরের ফুটফুটে মেয়ে—কি পাকা কি পাকা! পানুদা আর সুমু ছজনে ছজনকে চোখে হারায়। পানুদাকে কোথাও বেরুতে হলে ওকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে হয়। সুমুকে নিয়ে পানুদার সঙ্গে যমুনার কাড়াকাড়ি চলে। ওর তুলনায় রাণুটা একটু ঠাণ্ডা গোছের আর কমজোরি। তাই ছোটটাকে নিয়েই হৈ-হুল্লোড় বেশি হয়। বউদি দেওরকে বলে, মেয়েটাকে তুই একটা দস্যি বানিয়ে তুললি—হাড়গোড় যে সব শক্ত হয়ে গেল।

—যাবেই তো, ও কি তোমার মতো ঘরে বসে খুন্তি নেড়ে ছেঁচকি বাঁধবে নাকি—ও হবে বীরাঙ্গনা।

কাকা-ভাইঝির আনন্দের হুল্লোড় দেখলে যমুনার চোখ জুড়োয়। এই ছেলেই ঠেঙিয়ে কুকুর মারে কি করে ভাবতে পারে না।

ক'দিনের মধ্যে ভাবতে না পারার মতো আরো একটা বড় কাণ্ড ঘটে গেল। পনেরো বছরের যমুনার ভিতরটা আবেগে তোলপাড় করে দেবার মতোই কাণ্ড।

বেলা তখন তিনটে। বেশ গরম। যমুনা তার ঘরে অঙ্ক নিয়ে বসেছিল। মুখে যাই বলুক, ছুটির দিনের দুপুরে প্রায় রোজই খানিকক্ষণের জন্য অঙ্ক নিয়ে বসে। কোনো কঠিন অঙ্ক একবারে রাইট করে ফেলতে পারলে কল্পনায় পানুদার মুখখানা চোখের সামনে এনে দাঁড় করায়। চ্যালেঞ্জের চোখ—কি? হল কি হল না?

সোনা পিসি মেঝেতে শীতল পাটি বিছিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। যমুনা অঙ্কটাকে ঠিক বাগে আনতে পারছে না বলে নিজের ওপরেই বিরক্ত।

—এই যমুনা···কি করছিস?

জানলায় ওই মূর্তি। অপ্রত্যাশিত আদৌ নয়। যমুনা অঙ্কের বইখাতা আড়ালে সরালো। মন দিয়ে অঙ্ক করছে জানতে দিতে আপত্তি।—কিছু না, এসো।

—এখানে আসব কি, বাগানে যাব, তুই বেরিয়ে আয়।

—বেজায় গরম যে, আর একটু বিকেল হোক না।

—বাগানের গাছের ছায়ায় ঘরের থেকে বেশি ঠাণ্ডা—দড়ি আর কাটারিটা নিয়ে আয়, আগে মনের সুখে ডাব খেয়ে তারপর ঠাণ্ডা হয়ে বসিস।

যমুনা সরু অথচ শক্তপোক্ত ডাব-নারকেল পাড়া দড়ি আর কাটারি নিয়ে বেরুলো। বলল, কতদিনের মধ্যে গাছে ওঠো না, সাবধান বাপু—

ওর হাত থেকে কাটারিটা নিয়ে পানু হেসে জবাব দিল, পড়লে চেষ্টা করে তোর ঘাড়েই পড়তে চেষ্টা করব—ফাঁড়াটা তোর ওপর দিয়েই কাটবে।

যমুনা হাসতে লাগল। পাশাপাশি যেতে যেতে বলল, ধরো আমার ঘাড়েই পড়লে, কিন্তু আমি না মরে হাত-পা ভেঙে সারা জীবন ঠুঁটো

হয়ে থাকলাম—তখন ?

—সেটা মুশকিলের কথাই···তখন আবার আমাকেই সারাজীবন ঘাড়ে নিয়ে বেড়াতে হবে।

পুকুরের ও-ধারের বড় বড় ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছে দুজনে। এ-দিকে পর পর কয়েকটা খুব ভালো নারকেলের গাছ আছে, ডাবের জলও খুব মিষ্টি। কোন্ গাছটার ওপর চড়াও হওয়া যেতে পারে দেখতে দেখতে পানু পাঁচ সাত গজ আগে আগে চলেছে।

—ও-মা! গেলাম—গেলাম—কি কামড়ালো আমাকে!

পানু বিষম চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘাসের ভিতর দিয়ে একটা সাপই তো সড়সড় করে চলে যাচ্ছে! লেজের দিকটা শুধু দেখা গেছে, কি সাপ ঠিক বোঝা গেল না। যমুনা মাটিতে বসে পড়েছে, হাঁটুর নিচটা দু' হাতে চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, জ্বলে গেল···জ্বলে গেল···!

ভয়ে আর যন্ত্রণায় সমস্ত মুখ নীলবর্ণ। পানুর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে হুঁশ ফিরল।

সাপে কেটেছে! বিচ্ছিরিভাবে কেটেছে। হাঁটুর পিছনে আর গোড়ালির মাঝামাঝি নরম মাংসর ওপর ছোবল বসিয়েছে। যমুনা এমন করছে কেন? বিষাক্ত সাপ নাকি? পানু কি করবে এখন—কি করবে?

যমুনা মাটিতে শুয়ে পড়ে কাতরে উঠল, জ্বলে যাচ্ছে—এ কি-রকম লাগছে আমার···!

পানু দু হাতে ক্ষত-চিহ্নর ওপরের মাস্‌ল প্রাণপণ জোরে চেপে ধরেছিল। ওর পাশে ডাব কাটার দড়িটা দেখে চোখের পলকে ওটা তুলে নিয়ে কষে তিন চার প্যাঁচ দিয়ে বাঁধল। এত জোরে যে যমুনা আবার ককিয়ে উঠল। ···ওর মুখ আরো নীল দেখাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে বাকি দড়িটা কাটারি দিয়ে কেটে নিয়ে হাঁটুর চার আঙুল ওপরে আর একপ্রস্থ কষে বাঁধল। বাকি দড়ি আবার কেটে নিয়ে উড়ুর কাছে আবার এক প্রস্থ বাঁধতে যেতেই ওই অবস্থায় যমুনা একহাতে শাড়িটা টেনে নামাতে চেষ্টা করল। ও কেমন নিস্তেজ হয়ে আসছে। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে পানু দিশেহারার মতো উরুতে আর একটা কষে বাঁধন দিল। বাকি

দড়িটা কাটারি দিয়ে কেটে ফেলেই যমুনাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে ছুটল। এখন কি করবে পান্নু ঠিক করেই ফেলেছে। জলের কাছের চওড়া ধাপে ওকে শুইয়ে দিয়েই উপুড় হয়ে ক্ষত জায়গায় মুখ লাগালো। খুব জোরে দাঁত বসিয়ে জিভ আর ঠোঁটে করে যতটা সম্ভব রক্ত টেনে তুলল। সমস্ত মুখ আর জিভ বিচ্ছিরি রকম চিড়বিড় করে উঠল পান্নুর। রক্তটা ফেলে পুকুরের জলে মুখটা ধুয়ে নিয়েই আবার ছুটে এসে ক্ষতরজায়গায় মুখ লাগালো। রক্ত তুলে ধুয়ে এসে আবার মুখ লাগালো। এরকম চারবার করার পর আর পারল না। মাথাটা ভয়ংকর ঘুরছে, গাছপালা পুকুর সব দুলছে।·· একবার পান্নু অনেকটা কড়া জরদা মুখে পুরে দিয়েছিল কি হয় দেখার কৌতূহলে। একটুও ঢোঁক গেলেনি, কিন্তু মাথাটা কেমন ঘুরে গেছল আর মুখটা ভীষণ চিড়বিড় করে উঠেছিল। এখন তার থেকেও খারাপ লাগছে, মাথা আর সোজাই রাখতে পারছে না পান্নু।

···কারা যেন ওকে তুলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? ···যমুনার যেন কি হয়েছিল? ঠিক মনে করতে পারছে না। আসলে পান্নুর দারুণ ঘুম পেয়েছে। চোখ মেলেই তাকাতে পারছে না।

···পারল একসময়। কিন্তু চোখ তাকিয়ে অবাক। এ কোথায় শুয়ে আছে? এ তো একটা হাসপাতাল। চার দিকে তাকিয়ে আরো অবাক, এ-তো শ্যামনগরের হেলথ সেণ্টার নয়—মস্ত হাসপাতালই হবে মনে হচ্ছে!

উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ···কি কাণ্ড, এখন তো সকাল মনে হচ্ছে! তা হলে কি কাল সেই বিকেল থেকে সমস্ত রাত এই হাসপাতালে ঘুমিয়ে কেটেছে? হঠাৎ মগজে বিদ্যুতের ঘা পড়ল বুঝি। ···কালপুকুরের ধারে যমুনাকে সাপে কেটেছিল। যমুনার কি হল? যমুনা কোথায়?

দু'জনকেই ব্যারাকপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্যামনগর হেলথ সেণ্টারের অ্যাম্বুলেন্স সোজা ওদের এখানে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার-

দের জেরার উত্তরে পান্নু ঠিক মনে করে বলতে পারেনি, শেষ বার মুখ লাগিয়ে রক্ত টেনে তোলার পর ভালো করে মুখ ধোয়া হয়েছিল কিনা— বা আগেও খুব ভালো করে মুখ ধুয়েছিল কিনা।

…যমুনাকে ছ'দিন ইনভেস্টিগেশনে রেখে তারপর ছাড়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ই সুস্থ এখন, কিন্তু ত্রাসের শক্ যেন তার পরেও মনে লেগে আছে। এমনিতে বেশ আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বাড়ির আঙিনায় ঘুরেও বেড়াচ্ছে। কিন্তু থেকে থেকে এক সময় কি ভীষণ কান্না পায় ওর, আবার সেই কান্নার তলায় এক-ধরনের অজানা আনন্দও উপছে ওঠে। কখন পান্নুদা আসবে সেই অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে আবার এলে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে।

যমুনা সবই জেনেছে, সবই শুনেছে। কি সাপে কেটেছে সঠিক করে কেউ বলতে পারেনি। ও-জায়গায় দাঁত বসিয়ে পান্নুদা চামড়ার যা দশা করে ছেড়েছে, কোন্ সাপে ছুবলেছে ঠাওর করা শক্ত। তবে জাত সাপ মানে গোখরো বা শঙ্খচূড়ের মতো অত মারাত্মক বিষাক্ত নয়। সে-রকম বিষাক্ত হলে দু'জনের কাউকেই আর বাঁচতে হত না। তবু বিষাক্ত সাপই যে তাতে কারো সন্দেহ নেই। নিমুদা কোথা থেকে এক অভিজ্ঞ বুড়োকে ধরে এনেছিল। সে-ও এই কথাই বলেছে। মারাত্মক বিষাক্ত সাপ হলে দু'জনেরই জীবন সংকট হত। ওই লোকের মতে ও-ভাবে তিন তিনটে বাঁধন দিয়ে মুখ দিয়ে বিষ টেনে নেওয়ার ফলে যমুনা যদিও বা প্রাণে বেঁচে যেত, পান্নুদার বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। নইলে যে ছিটে ফোঁটা পেটে গেছে তাতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? সে-রকম সাজ্ঘাতিক সাপের বিষ হলে কি রক্ষা ছিল!

এসব কথা মনে হলে যমুনার গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে ওঠে। রাগ হয়। কান্না পায়। আবার দুজনেই বেঁচে গেল বলে যে-রকম আনন্দ হয় সেটা যমুনার ঠিক চেনা আনন্দ নয়।

এই ছেলেকে নিয়ে আর এক বিপদ হয়েছে যমুনার। গত পনেরো দিনে ওদের বাগান থেকে ন'টা সাপ মেরেছে। সব ক'টাই ভীষণ বিষাক্ত। বারণ করলে বলে, মারবই, আমি জনমেজয়ের সর্প নিধন যজ্ঞ করে

ছাড়ব।

যমুনা তক্ষুনি জিগ্যেস করেছে, জনমেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞ কি?

—তা তো জানি না, বউদি সেদিন এ-কথা বলে ঠাট্টা করছিল।

জনমেজয়ের সর্প-নিধন যজ্ঞ কি ব্যাপার যমুনা তার বাবাকে জিগ্যেস করে জেনে নিয়েছিল। বাপকে সাপে কেটেছিল বলে জনমেজয় এই যজ্ঞ করেছিল। আর পানুদা সাপ মারছে যমুনাকে সাপে কেটেছে বলে। জন-মেজয়ের বাপ মরে গেছল। আর যমুনা বেঁচেই আছে।

রাগারাগি করে যমুনা অবশ্য সাপ মারা বন্ধ করেছে। বলেছে, সাপের কামড়ানো স্বভাব তাই কামড়েছে, তুমি কি সাপ?

পানুর জবাব, আমি সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর।

—ফের সাপ মারতে গেলে আমি তোমাকে দেখাব মজা!

—কি মজা দেখাবি?

—ফের মারলে আমি রোজ বাগানে গিয়ে চেষ্টা করব আমাকে আবার যাতে খুব বিষাক্ত সাপে কামড়ায়।

—আমি কামড়ে রক্ত টেনে নিয়ে বিষ বার করে নেব।

—তোমাকে সঙ্গে থাকতে দিচ্ছে কে?

পানুদা হেসে হার স্বীকার করল। আচ্ছা যা, সাপেরা তোর দয়ায় বেঁচে গেল।

এসব কথা মনে হলেই যমুনার চোখে জল আসতে চায়। …সাত সাড়ে সাত বছর বয়সে ও জলে ডুবে মরতে বসেছিল। সেই দম-ফেটে মরার যন্ত্রণা যমুনার আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেবারে নিজে ডুবতে বসেও পানুদা ওকে বাঁচিয়েছিল। …এবারে সাপের কামড়ের বিষ নিজের মুখ দিয়ে টেনে ওকে রক্ষা করতে চেয়েছে। কি না হতে পারত পানুদার, কোন্ সাপ কি বিষ কিছুই তো জানত না।

…দুটো বছর আগেও যমুনার রাগের অন্ত ছিল না। সব সময়েই মনে হত এই নিষ্ঠুরের হাতেই কোন্ দিন ওর প্রাণটা যাবে। সেই মনে হওয়ার জবাব একবার নয়, দু' দুবার পেল।



পূজোর ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যমুনার কথা বলা ইদানীং আরো একটু বেড়েছে। পাছে দ্বিতীয় কান হয় তাই সতর্কও কম নয়। দরজা জানালা বন্ধ করে তবে পুজোর কাজে বসে। পিসির কানে গেলে চিত্তির! এমনিতেই ফাঁক পেলে বাবার কান বিষোচ্ছে, মেয়ে বড় হয়ে গেল, এখন থেকে চেষ্টা-চরিত্র না করলে কবে দিন আসবে কে জানে। বাবা অবশ্য খুব কান দেয় না, বলে দিন কবে আসবে মা-ই ঠিক করে দেবে—মেয়ের কত ভক্তি মা কি দেখছে না!

পিসি অবুঝ তাই ওই রকম বলে বাবাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। বাবার সঙ্গতির কথা ভাবে না। মায়ের ওপর নির্ভর করা ছাড়া বাবার আর করার কি আছে? যমুনা মিটি মিটি হাসে আর মা কালীর পটের দিকে তাকায়। ওর এই হাসির অর্থ কেবল ওই মা ছাড়া আর কে বুঝবে? …পিসির কথা আর বাবার কথা শোনার পর যমুনার মুখে এই হাসি দেখলে আর একজন অবশ্য তক্ষুনি বুঝে ফেলত। পানুদা। তা তার সামনে হাসছেই বা কে, বুঝতেই বা দিচ্ছে কে। যমুনা যে কত নিশ্চিন্ত তা ও নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। …চুপি চুপি বাবাকেও যদি একটু নিশ্চিন্ত করতে পারত তাহলে বেশ হত। ধেৎ, লজ্জায় যমুনা মরেই যাবে —বাবার অদৃষ্টে কিছুকাল পিসির গজর গজর শোনা আছে তার আর কি করা যাবে।

…ক'টা দিন মাত্র আগের কথা। পুজোর কাজ করতে করতে যমুনা মা-কে বলছিল, বছরের গোড়ার দিকটা ভালো গেল না মা, আমাকে তো সাপের কামড় খাইয়ে ছাড়লে, আর ওই ছেলের মাথায় এমন ভূত চাপালে যে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে পায়ে মুখ লাগিয়ে বিষ টেনে ছাড়ল—ওর কিছু হয়ে গেলে বেঁচে থেকে জীবনে আর কাউকে আমি মুখ দেখাতে পারতাম! যাক, দয়া ধম্ম করে দু'জনেরই ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়েছ—এখন শুরু ভালো না হোক শেষ যেন ভালো হয়। আর একটা কথা, আমার যা-ই হোক, ওই ছেলের মাথায় আর কখনো যেন তুমি অমন দুর্বুদ্ধি চাপিও না—

ওকে ভালো রেখো, ওর ভালো কোরো।

দিন কয়েকের মধ্যেই এই ভালো করার নজির দেখল। পানুদা ফার্স্ট ডিভিশনে আই-এসসি পাশ করেছে। এটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, কিন্তু যা আশা করেছিল তার থেকে অনেক ভালো ফলই হয়েছে। পানুদার আনন্দ অবশ্য ষোল আনা পূর্ণ হয়নি। হবে কি করে, তার প্রাণের বন্ধু ফণী শিকদার ডাহা ফেল মেরেছে, আর নাকি পড়বেও না ঠিক করেছে।

যমুনার নিজের কাছে স্বীকার করতেও আপত্তি যে বন্ধুর ফেলের কথা শুনে ওর একটুও দুঃখ হয়নি। না, কারো খারাপ সত্যিই ও কখনো চায় না। কিন্তু পানুদার সঙ্গে ওই দজ্জাল ছেলের এর পর আর অত মাখামাখি থাকবে না ভেবে যে একটু স্বস্তি বোধ করেছিল সেটা নিজের কাছে গোপন করবে কি করে ?

·· যাক, এই পাশের উপলক্ষেও ওদের বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। পানুদার দাদা বউদি যমুনাকেও তাদের বাড়িতে খেতে বলেছিল। দুপুর পড়ে আসতে দু'জনে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে দুজনে নিজেদের বাগানে এসেছে। এই বাগান পানুদাকেও খুব টানে এখন, কিন্তু এলেই সাপের কামড়ের কথাও মনে পড়ে যায়। বলে, চার দিকে ভালো করে নজর রাখিস, আবার বিপদ বাধিয়ে বসিস না।

ওর বিপদের কথা ভেবেই যমুনার আবার এমন বিপদে পড়ার নামে বেশি আতঙ্ক।

ইদানীং পানুদাই নিজের মনের মতো একটা বসার জায়গা বেছে নিয়েছিল। পুকুরের ও-ধারে চার-পাঁচটা ছোট খেজুর ঝোপের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা—সেইখানে। দু' বছর আগে হলে যমুনা কি সাহস করে এই ছেলের সঙ্গে এমন নিরিবিলিতে এসে বসতে পারত। যখন কথায় কথায় গা খিমচাতো, গাল ধরে টানত, আর দু'দিকের কোমরে হাত দিয়ে কাঁকাল বাঁকিয়ে নাচতে বলত—না, সেই সব ভয়ের দিন যেন মন্ত্রে উবে গেছে। এখন কেবল লজ্জা আছে, ভয়-ডরের লেশ মাত্র নেই। এই লজ্জার ধকলেই গোড়ায় গোড়ায় এখানে বসতে আপত্তি, ঝাঁঝিয়ে বলত,

কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে!

—লোকের ভাবাভাবিকে গুলি মারি। তারপরেই হেসে ফেলেছিল। —ভাববে তোর সঙ্গে আমার বেজায় ভাব···সেটা তো মিথ্যে নয়।

যমুনা জিভ ভেঙচে উঠেছিল, আবার লজ্জা ঝেড়ে ফেলে বসেও পড়েছিল। পানুদা নিজেও জানে না এই নিরিবিলি জায়গাটুকু ওর কত প্রিয় এখন। দুজনে এখানে এসে বসলে যমুনার জগৎ এক অদ্ভুত আনন্দে কানায় কানায় ভরে যায়।

তবু ভবতে কতটা বাকি ছিল সেদিন যমুনা সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব অনুভব করল। এখানে বসেই পানুদা খোশ মেজাজে বলেছিল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করব ভেবেছিলাম কিন্তু এমন হাই ফার্স্ট ডিভিশন হবে আশা করিনি।

ঠোঁট উল্টে যমুনা বলে বসেছে, পরীক্ষার ব্যাপারে তোমার তো বরাবরই ওই রকম হয়, আমি ঠিক জানতাম ভালো করবে, মা-কে বলাই ছিল—

—কি বলা ছিল? কৌতূহলে টইটুম্বুর।

—তোমার ভালো করার কথা, আর তোমার মাথায় যেন কখনো অমন দুর্বুদ্ধি না চাপে সেই কথা।

—অমন দুর্বুদ্ধি মানে? আমার মাথায় আবার কবে কি দুর্বুদ্ধি চেপেছে?

—আর মুখ নেড়ে কথা বোলো না, আমার পায়ের এখানে মুখ লাগিয়ে তুমি বিষ টেনে নাওনি?

হেসে উঠেছে, তারপর জবাব দিয়েছে, এটা দুর্বুদ্ধি হল? তোর গায়ে বিষ ঢুকলে হাজার বার আমি সে বিষ টেনে নেব—আমি বেঁচে থাকতে তোর গায়ে আমি বিষের ছিঁটে-ফোঁটাও থাকতে দেব না।

কান জুড়িয়েছে কিন্তু উদ্বেগে রাগও কম হয়নি।···কেন, আমার জন্য তোমার অত কি, নিজের প্রাণটা কম হল?

হাসতে লাগল।—দু' বছর আগে সেই ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরুবার রাতে জিতুদার ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জানিস?

মাথা নাড়ল, জানে না। — কি প্রতিজ্ঞা ?

—প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোর গায়ে হাত তুলে আর তাকে কোনদিন কষ্ট দেব না···আর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এবার থেকে যমুনার সব ভার আমার—সব সব সব—। আবার হাসি। —জিতুদা আমার কথা ঠিক বুঝেছে কিন্তু তোর মাথায় কিছু ঢুকল ?

বুকের ভিতরে এ কি অদ্ভুত আনন্দের কাঁপুনি বে বাপু ! যমুনা বোকা মুখ না করে করে কি ? ওর সাদা-সাপটা জবাব, ঢুকবে না কেন, ভার নিয়েছ বলেই তো অঙ্কে ঠিক ঠিক পাশ করে যাচ্ছি।

—খুব বুঝেছিস। হাসছেই। —তোর সব ভার নিলে ভবিষ্যতে তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি দাঁড়ালো।

ছলা-কলা ছেড়ে যমুনাও হেসেই ফেলেছিল। — আর বোঝাতে হবে না—সম্পর্ক দাঁড় করাতে হলে তুই-মুই করে কথা বলা ছাড়তে হবে—বুঝলে মশাই ?

—তাই তো রে—অ্যাঁ ! এখন থেকেই তো আমার প্র্যাকটিস করা উচিত ! কিন্তু বড় লজ্জা করছে, তবু এখন থেকেই প্র্যাকটিস করি দাঁড়া। ···যমুনা, এবার থেকে তোর সঙ্গে আমার তুমি তুমি সম্পর্ক···আমি তোমাকে তুমি বলব—

—ধেৎ, আমারই লজ্জা করছে। ·· বাবা আর পিসি শুনলে তো হয়েছে।

—তা-ও তো বটে ! আচ্ছা, সম্পর্কটা হোক, তারপর আপনিই ঠিক হয়ে যাবে— কি বলিস ?

পুজোর সাজ করতে করতে এসব কথাই যমুনার মনে হচ্ছিল। তাই মা-কালীর পটের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছিল। মনে হচ্ছিল মা-ও মজা পেয়ে হাসছে।

···কিন্তু যমুনার বুকের তলায় আবার এক অজানা আতঙ্ক জমাট বাঁধছে। ওটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেও থিতিয়ে থাকে। এটা ছেচল্লিশ সাল। বছরের গোড়া থেকে ওর যেমন ভালো যায়নি, দেশের অবস্থাও তেমনি ঘোরালো হয়ে উঠছে। যুদ্ধ থেমেছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের ফলে মানুষ-

গুলো কেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। ও-ছেলেকে রোজ কলকাতায় যেতে আসতে হয়। ফিজিক্স অনার্স না কি বলে তাই নিয়ে কলেজে পড়ছে। সপ্তাহে চার দিন সকালে যায় আর বেশ রাতে ফেরে। এখানকার টিউশনি ছেড়ে খুব ভালো মাইনেয় কলকাতাতেই একটা টিউশনি জুটিয়ে নিয়েছে। এক বড়লোকের বাড়ির ক্লাস নাইন আর টেনে-পড়া দুই ভাইকে অ্যাডিশনাল আর কম্পালসারি অঙ্ক শিখিয়ে তারপর ট্রেন ধরে বাড়ি আসে। একশ পঁচিশ টাকা মাইনে। এত ভালো টিউশনি এখানে আর কোথায় পাবে। ওই চার দিন শ্যামনগরে ফিরতে রাত ন'টা। এক-একদিন আরো রাত হয়। ফেরার সময়ে অবশ্য এ বাড়িতে হাঁক দিয়ে যায়, একটু আগে ফিরলে দু' দশ মিনিট বসেও যায়। গলা শুনলে তবে যমুনা নিশ্চিন্ত। চিন্তা হবে না, কলকাতায় হৈ-হল্লা ধর-পাকড় তো লেগেই আছে। যেন ছাত্ররাই এই দেশটা উদ্ধার করে ছাড়বে। নিজেই গল্প করে, কয়েকটা টিকটিকি নাকি তার পিছনে লেগেই আছে। টিকটিকি মানে স্পাই। যমুনা মনে মনে সেই অদেখা টিকটিকিদের মুণ্ডুপাত করে। কিন্তু তাতে কি আর ভয় যায়! দাদার কথা ভোলা যায়, না তার মুখ ভোলা যায়?

জিগ্যেস করে, তুমি তো আর ও-সবের মধ্যে নেই, তা হলে তোমার পিছনে টিকটিকি লেগে থাকে কেন?

ওর ভয় দেখে পানুদা হাসে। বলে, লেগে থাকাই ওদের ধর্ম, আমাদের বয়েসটাই ওদের চোখে দোষের।

খবরের কাগজ পড়ে পড়ে যমুনার কেবলই মনে হয়—দেশের আকাশে একটা ঘন-ঘটা ছেয়ে আসছে। যমুনার বুকের তলায় সেই অজানা দুর্যোগের ছায়া।

জুলাই মাস কেটে গেল। আগস্টের মাঝামাঝি। সেদিন রাতে পানুদা এলো না। কোনদিন ফিরতে বেশি দেরি হয়ে গেলে অবশ্য ডাকা-ডাকি করে না। যমুনা ভাবল তাই হবে। তবু একটু অশান্তি নিয়েই রাতটা কাটল। পরদিন সকাল সাতটা না বাজতে পাড়া ঘুরে পিসি যে-খবর নিয়ে এলো যমুনা ভয়ে দিশেহারা। গত দিন বিকেল থেকে সমস্ত

কলকাতায় আর আশপাশের অনেক জায়গায় নাকি রক্ত-গঙ্গা বয়ে গেছে। দিকে-দিকে আগুন জ্বলছে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। তখন দেশও স্বাধীন হয়নি, বাংলাও ভাগ হয়নি। এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব। পিসির খবর, তাইতেই সুবিধে পেয়ে মুসলমানরা নাকি হিন্দুদের কচু-কাটা করছে, ছেলে বুড়ো এমন কি মেয়েছেলেকেও বাদ দিচ্ছে না। ছুরি চালাচ্ছে, গুলি করে মারছে, আগুনে পুড়িয়ে মারছে।

…পানুদা কাল রাতে আসেনি। কেন আসেনি? যমুনা ঊর্ধ্বশ্বাসে কাজিতলার দিকে ছুটল।

দূর থেকে পানুদাকে তাদের বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুকের তলার হিম-স্রোত বন্ধ হল। কিন্তু কাছে আসতে আসতে মনে হল পানুদার মুখ বেজায় শুকনো। ওকে দেখে হাসল না পর্যন্ত। কাছে আসতে ফিস ফিস করে জানান দিল, কাল ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে কলকাতায়, কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই, সে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে, কিন্তু দাদা রাতে বাড়িই ফেরেনি·· খুব সম্ভব দাঙ্গার জন্য কোথাও আটকে পড়েছে। তারপর বলল, বউদির সামনে একটাও দুশ্চিন্তার কথা বলিস না, কলকাতার খবর বউদি এখনো কিছু জানে না, আমি বলেছি বিশেষ কাজে-টাজে আটকে পড়েছে, এমন তো আগেও এক-আধ সময় হয়েছে।

এক চিন্তা গিয়ে যমুনা আর এক চিন্তার মধ্যে পড়ল। পানুদার চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ভীষণ উতলা। সমস্ত রাতে বোধহয় একটুও ঘুমোয়নি।

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা কাকে বলে জানলেও যমুনা ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে পারে না। পূর্ববঙ্গে মারামারি কাটা-কাটির খবর কাগজে অবশ্য অনেক বারই পড়েছে। কিন্তু এটা কেমন দাঙ্গা? কোনরকম শত্রুতা না থাকলেও হিন্দু হলেই সে মুসলমানদের মারবে আর মুসলমান হলেই সে হিন্দুকে মারবে? এমন অসম্ভব কাণ্ড হয় কি করে! ভালো মানুষ নিমুদার গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে পারে এ যমুনা ভাবতেও পারে না। কাজে আটকে না পড়ুক, গোলমালের জন্যই হয়তো স্টেশনে এসে ট্রেন ধরতে পারেনি।

কিন্তু পানুদার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতেও পারছে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দারুণ দুশ্চিন্তা চেপে একটা খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো সে ছটফট করছে। কলকাতায় ভীষণ কিছু দেখে এসে না থাকলে এই বেপরোয়া ছেলের এত দুর্ভাবনা হবার কথা নয়।

ওকে বলল, তুই বাড়ি যা, তোর চোখ-মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে —তোকে দেখলেই বউদির সন্দেহ হবে।

যমুনা চলে এসেছে। কিন্তু বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাত আবার না এসে পারেনি। ততক্ষণে কলকাতায় দাঙ্গার তাণ্ডবের কথা আরো ছড়িয়ে পড়েছে। আরো মুশকিল, কলকাতা থেকে এত বেলা পর্যন্তও কোনো কাগজই আসেনি। কেবল এক-একজনের মুখের কথা চার গুণ হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরছে। রেডিওর খবর যারা শুনেছে তা-ও নাকি মারাত্মক। রেডিওর খবর মানেই তার দশ গুণ বেশি ধরে নাও।

এবারে পানুদার বাড়িতে এসে দেখে বউদির মুখও শুকনো। পানুদা সকাল সাড়ে ন'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে শুনে যমুনা ভিতরে ভিতরে আঁতকেই উঠল।

—কলেজে গেল নাকি?

—না, বই খাতা নিয়ে তো বেরুতে দেখলাম না, কেবল বলে গেল ফিরতে দেরি হলে চিন্তা কোরো না—হ্যাঁ-রে যমুনা, আমাদের কাজের মেয়েটা বলে গেল কাল কলকাতায় নাকি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খুব মারামারি কাটা-কাটি হয়েছে—এ-দিকে মানুষটা রাতে বাড়িই ফিরল না, আমার চিন্তা হচ্ছে—কি হয়েছে তুই শুনেছিস কিছু?

যমুনার প্রাণপণে সহজ থাকার চেষ্টা। —তেমন তো কিছু শুনিনি, তবে ট্রেন-টেন ঠিক-মতো চলেনি শুনলাম, সেই জন্যেই হয়তো নিমুদা আটকে গেছে—আজ অফিস করে ফিরবে···

—কি জানি বাপু, আগে ক্বচিৎ এ-রকম হলে পরদিন ভোর হতে না হতে চলে আসত। এই ছেলেটাই বা কিছু না বলে কয়ে কোথায় আবার চলে গেল—

কথা বলতে গলা যাতে না কাঁপে যমুনার সেই চেষ্টা। —পানুদা কি ভাত খেয়ে বেরিয়েছে ?

—তাকে খাওয়া বলে না, নাকে-মুখে কোনবকমে চারটে গুঁজে গেছে —অবশ্য বলে গেছে দাদা খুব সম্ভব অফিস করে বিকেলে ফিরবে, কিছু ভেবো না—কিন্তু যা শুনছি আমার ভয়ই করছে বাপু।

···সেই দিনটা আর সেই রাতটা আর তার পরদিন সমস্ত দিনটা আর সমস্ত রাতটা কি অসহ্য যন্ত্রণা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে কেটেছে যমুনাই জানে। দু'দিনের মধ্যে না ফিরছে দাদা না পানুদা। এই দু'দিনও কোনো হকার কাগজ বিলি করেনি। লোকের মুখে মুখে একটা ভয়াবহ ত্রাস কেবল জমাট বেঁধেছে। বাবা অবশ্য অন্য মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে অনেক খবর জেনে এসেছে আর কলকাতা-ফেরত কার কাছ থেকে খবরের কাগজও পড়ে এসেছে। যা হয়ে গেছে আর হচ্ছে ইংরেজি কাগজে তার নাম নাকি দেওয়া হয়েছে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। শুধু কলকাতা আর তার আশ-পাশ নয়, একই সঙ্গে সমস্ত পূর্ববাংলা জ্বলছে, পাঞ্জাব জ্বলছে।

যমুনা দুঃসংবাদটা শুনেছে পানুদার বন্ধু ফণী শিকদারের মুখে। ·· নিমুদা আর পানুদা দু'জনেই ফিরেছে। না, নিমুদা ফেরেনি, ছোট ট্রাকে নিমুদার দেহ ফিরেছে। হাসপাতালে পরশু ভোর রাতে নিমুদা মারা গেছে। পোস্ট মর্টেমের পর তার দেহ খালাস করে আনতে পুরো একটা দিন গেছে। আধমরা অবস্থায় পুলিশের গাড়ি তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে হাসপাতালে দিয়ে গেছিল। কোথায় কোথায় ছোরা বসানো হয়েছে ফণী শিকদার সেই ফিরিস্তি শুরু করতেই যমুনা ঊর্ধ্বশ্বাসে কাজিতলার দিকে ছুটেছে।

···নিমুদা দাওয়ায় শুয়ে। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা বলেই কোনো আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়ছে না। ঠাণ্ডা ঘুমন্ত মূর্তি। বউদি মাথার কাছে পাথরের মতো বসে। কাঁদছে না, গলা দিয়ে শব্দ বার করছে না। নিমুদার ছয় সাড়ে ছয় বছরের বড় মেয়ে রাণু শব্দ না করে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আড়াই বছরের ছোট মেয়ে খুমু কাকার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। দাওয়ায় আর দাওয়ার নিচে পাড়া-

পড়শীদের ভিড়।

কারো বুকের তলার কান্না ভেঙে পড়ছে না, আছড়ে পড়ছে না। যমুনা শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজে শক্ত করে কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে থেকে থেকে দু'চোখ পানুদার দিকে যাচ্ছেই। শোক ছাড়িয়ে কি-রকম একটা ভয় উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে যমুনার মনে। কেবলই মনে হচ্ছে এই মুখ বড় নিষ্ঠুর রকমের ভাবলেশ-শূন্য। পানুদা চিৎকার চেঁচামেচি করলে, শাসালে বা গর্জে উঠলে সেটা বরং স্বাভাবিক মনে হত।

প্রায় একটা বছর ধরে এরপর এই শ্যামনগরে বসেই নরক দেখছে যমুনা। উদ্বাস্তুর ঢেউ কোথায় না আছড়ে পড়ছে! কোথায় না তাদের আর্তনাদ, নালিশ আর তর্জন গর্জন শোনা যাচ্ছে। এখানেও মস্ত ক্যাম্প হয়েছে, সরকারি সাহায্যও নাকি আসছে। কিন্তু কি সাহায্য কতটুকু সাহায্য যমুনা ঠাওর করতে পারে না। এক-একটা ক্যাম্পে ঘর-ছাড়া মানুষ মেয়েমানুষ বাচ্চা কাচ্চা পোকামাকড়দের মতো কিলবিল করছে। পানুদা বলে, শিয়ালদা স্টেশনে নাকি পা ফেলার জায়গা নেই। উদ্বাস্তু আসছে তো আসছেই। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসার পর নতুন বয়সের কত মেয়ে-বউ আবার হারিয়ে যাচ্ছে ঠিক নেই। সকালের কাগজ খুলতেও ভয় করে যমুনার। দাঙ্গা মৃত্যু আগুন উদ্বাস্তুর দুর্দশা ছাড়া আর কোনো খবর নেই।

যমুনার বুকের তলায় একটা অজানা ভয় পানুদাকে নিয়ে। কেবলই মনে হয় পানুদা বদলে যাচ্ছে। বাগানের খেজুর ঝোপের আড়ালে সেই নিরিবিলি জায়গায় আর বেশি বসা হয় না। হলেও মনের কথা কমই হয়। আগে যে-সব নেতাদের নামে জিভে জল আসত, তাদের চোখের দেখা দেখার জন্য কলকাতায় ছুটত, ধকল পোহাতো—এখন তাদের সম্পর্কেই এমন বিচ্ছিরি এক-একটা কথা বলে বসে যে যমুনার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। পানুদা যেন দিনে দিনে মানুষের ওপর বিশ্বাস খুইয়ে বসছে।

ওর দাদা চলে যাবার পরে পড়া ছেড়েই দিতে চেয়েছিল। দাদা নেই, টাকা রোজগার না করলে চলবে কি করে? কিন্তু চলার ব্যবস্থা মা-ই করে

দিয়েছে। মা-কালীর কাছে কম প্রার্থনা করেছে যমুনা ? ঠাকুর ঘরে ঢোকার আগে থেকেই মনে মনে বলা শুরু করত, মা-গো, ওর পড়া বন্ধ কোরো না, কি করে চলবে আমি জানি না—কিন্তু ওর পড়া বন্ধ হলে আমি তোমার সামনে এই মেঝেয় মাথা খুঁড়ব।

পড়া বন্ধ হয়নি। যমুনা যা কল্পনাও করেনি তাই হয়েছে। বাদ সেধেছে বউদি, নিমুদার বউ। বলেছে এই দেড় দুটো বছর আমি যা-হোক করে চালিয়ে নেব, তুই দু'পায়ের ওপর শক্ত হয়ে না দাঁড়ালে আমার সব-দিক অন্ধকার—রাণু-সুমুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিছু গয়না আছে, আর তার কি দরকার—লাইফ ইনসিওরেন্স প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে কি পাস দেখ, একভাবে না একভাবে ঠিক চলে যাবে—তুই পড়া ছাড়লে আর আমি তোর মুখ দেখব না—তোর দাদা নিজের কথা মেয়ে দুটোর কথা না ভেবে তোকে মানুষ করার কথা ভেবেছে।

বিলিতি তেল-কোম্পানিতে নিমুদা ভালো চাকরিই করত, আরো দশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্স ছিল, ওই অঘটনের বছর দুই আগে আরো দশ হাজারের ইনসিওরেন্স করেছিল। সেই বিশ হাজার টাকার কিছু বেশিই পেয়েছে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকেও একেবারে মন্দ টাকা পায়নি। ভালো মানুষ তো বটেই, সৎ আর পরিশ্রমী কর্মচারী হিসেবেও সুনাম ছিল তার। অসময়ে অঘটনে মৃত্যুর জন্য কোম্পানির সাহেব আর হোমরা-চোমরারা দশ হাজার টাকার একটা বাড়তি ফাণ্ড তুলে দিয়েছে। সব মিলিয়ে হাজার চল্লিশ টাকা এসেছে বউদির হাতে। এত বউদি কখনোই আশা করেনি। পানুদাকে বলেছে, শুধু বি. এসসি. কেন—যতদূর ইচ্ছে তুই পড়, ঠিক চলে যাবে। পড়ার খরচ অবশ্য নিজেই আগের মতো চালিয়ে যাচ্ছে। টিউশনি ছাড়েনি। মাস গেলে কিছু টাকা বরং তাই থেকে বউদির হাতে তুলে দেয়।

তার অনুপস্থিতিতে প্রায় টিটকারির সুরেই পানুদা যমুনাকে বলেছে, পাশ করে বেরুলে একেবারে লাট সাহেবের চাকরি এগিয়ে আসবে আমার সামনে—যত সব আনপ্র্যাকটিকাল চিন্তা।

পানুদার এই রকমই হয়েছে। কিছুই ভালো দেখে না, ভালো আশা

করে না।

…দেশ স্বাধীন হল।ইংরেজ সরে দাঁড়ালো। পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রথম রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। কাগজে কাগজে দু'জনেরই প্রশংসার ছড়াছড়ি। দেশের ম...ের দুঃখ আর দুর্দশা এতটুকু কমেনি বটে—কিন্তু এবারে কমবে এ আশা কে না করে? যমুনা তো ধরেই নিয়েছে, দু'শ বছরের গোলামির শেকল ছিঁড়ে সমস্ত ভারত সোনার যুগে পা ফেলল।

ভাবের কথা শুনে পানুদা হেসেই উঠেছিল। যমুনার মনে হয়েছিল তেতো হাসি। কথাগুলো আরো বিচ্ছিরি। —যেমন বুদ্ধি তোদের তেমনি ভাবিস, চোখে দেখেও কিছু বুঝিস না—আস্তাকুঁড়ে পা ফেলল বল্— দেশটা দু'টুকরো হয়ে লক্ষ লক্ষ ভিখিরি তৈরি হল। কমিউনিস্টরা তো এখনই স্লোগান দিচ্ছে, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাৎ!

যমুনা থমকেছিল। —ঝুটা মানে তো মিথ্যে…কিন্তু ইংরেজ তো সত্যি-সত্যি সরে গেছে।

—সরে যাবার পরেও দাঙ্গা থেমেছে, উদ্বাস্তু আসা কমেছে? স্বাধীনতার নামে দগদগে দুটো ঘা তৈরি করে দিয়ে তারা সরে পড়েছে —বুঝলি? এ-রকম স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর ডাকে জিতুদারা তাজা-তাজা প্রাণ হাতে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল?

যমুনা ভয়ে ভয়ে চুপ মেরে গেছে। কিন্তু পানুদার কথা সত্য বলে একটুও মেনে নিতে পারেনি। ওর খুঁটিয়ে কাগজ পড়া আরো বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন, গরিবের অবস্থার উন্নতি হবে, পুঁজি-পতিদের শাসিয়েছে গরিবের সাহায্যে এগিয়ে না এলে তাদেরও অস্তিত্ব থাকবে না। এই তো সেদিন নিজে এক ময়দা-কলে হানা দিয়ে তেঁতুল বিচির বস্তা ধরলেন—গুঁড়ো করে ময়দার সঙ্গে মেশাবার জন্য মজুত করা হয়েছিল।

কিন্তু সাড়ে পাঁচ মাস না যেতে এমন লোককেও মন্ত্রিত্ব ছেড়ে সরে যেতে হল। টিটকিরির সুরে পানুদা বলেছিল, যেতে যে হবে এক তুই ছাড়া বোধহয় সবাই জানত।

—কেন, জানত কেন ? যমুনা অবাক।

—কড়াকড়ি করতে গেলে যারা তাকে গদিতে বসিয়েছে তারা আবার টেনে নামাবে জানা কথাই। তাই হল। তাদের এক দলের বায়না, পার্টির দোষীদের ছেড়ে দিতে হবে—তাদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে হবে—রাজি না হবার ফল—দেশ কেমন স্বাধীন হয়েছে ভালো করে বোঝ তাহলে।

কিন্তু যমুনা এই রকমই হবে এই রকমই চলবে মানতে রাজি নয়। প্রফুল্ল ঘোষের জায়গায় যে এলো সে আরো জাঁদরেল লোক—বিধান রায় নামখানা কে না শুনেছে—এমন ডাক্তার ভূ-ভারতে আর কটা আছে। নিশ্চয় দেশের অবস্থা আরো ভালো করার জন্য তাকে আনা হয়েছে—গান্ধীজী পর্যন্ত তাকে কত ভালবাসে কত খাতির করে—গান্ধীজীর সব উপোসের সময়েই তো তাঁর পাশে বিধান রায় একপায়ে দাঁড়িয়ে।

···কিন্তু বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসার সাত দিনের মধ্যেই কি কাণ্ড হয়ে গেল! দিল্লীর প্রার্থনা-সভাতে গান্ধীজীকেই গুলি করে মেরে দিল কে একজন নাথুরাম গডসে। সে ধরা পড়ল, তার ভাই গোপাল বিনায়ক ধরা পড়ল—আর আপ্তে বলে আর একজন ধরা পড়ল। কাগজে লেখা হল, তিরিশে জানুয়ারি ভারতের ইতিহাসের সব থেকে কালোদিন। তাই যে তাতে আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু বছর কয়েক আগে এমন ভয়ংকর খবর শুনলে পানুদা কি করত ? দাদা বেঁচে থাকলে যা করত তা-ই করত নিশ্চয়। মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদত। কিন্তু এখন চোখ দুটো খরখরে, ঠোঁটে কি-রকম হাসি। যমুনাকে বলেছিল, শুনেই তুই অমন হয়ে গেলি কেন, অত অবাক হবার কি আছে ?

যমুনার চোখ মুখ গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। —তার মানে তুমি একটুও অবাক হওনি ? এ-রকমও হতে পারে তুমি ভেবেছিলে—এ-কাজ যে করেছে সে খুব ভালো কাজ করেছে ?

আরো মজা পেয়েছে। হেসে হেসে বলেছে, তুই দেখছি দিনে দিনে

াদা হয়ে যাচ্ছিস—যে এ-কাজ করেছে সে খুব মন্দ কাজ করেছে—নইলে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এমন আঁতকে উঠবে কেন—কিন্তু এর থেকে কি প্রমাণ হল, আমাদের স্বাধীনতার এই চেহারা দেখে কিছু মানুষ ক্ষেপে গেছে কিনা ? ক্ষ্যাপা মানুষের ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে !

যমুনার এ-সব কথা শুনতে একটুও ভালো লাগেনি। কতটুকুই বা স্বাধীনতার বয়েস ? মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস। এরই মধ্যে স্বাধীনতার কি চেহারা দেখবে আশা করে লোকে ? যারা এমন কাজ করতে পারল তারা উন্মাদ ছাড়া আর কি ? ··কাগজে ছবি দেখে-দেখে গান্ধীজীর চেহারা সেই ছেলেবেলা থেকে মনের পটে আঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু চোখে কখনো দেখেনি। আর দেখবেও না। যমুনা বায়না ধরল সে ব্যারাকপুরের ঘাটে গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জন দেখতে যাবে। সতেরো বছরের যমুনার এই শ্রদ্ধাটুকুই যেন শেষ সম্বল। শ্যামনগর থেকে ব্যারাকপুর কতটুকুই বা পথ—ইচ্ছে করলে হেঁটেও যাওয়া যায়। ও এমন গোঁ ধরে বসল বলেই পানুদা নিয়ে গেল। নিজের সে-রকম আগ্রহ নেই, মনের টান নেই।

···ব্যারাকপুরের গঙ্গাঘাটের সে দৃশ্য যমুনা জীবনে ভুলবে না। এক-সঙ্গে এত মানুষ দেখা দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারে না। পরে কাগজে দেখেছে গঙ্গা-ঘাট এলাকায় সেদিন দশ লক্ষ মানুষ জড় হয়েছিল। কত মানুষকে যমুনা বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখেছে ঠিক নেই। লক্ষ লক্ষ লোকের মতো সেদিন ওরও মনে হয়েছিল মহাত্মার এই চিতাভস্ম থেকেই দেশে শান্তি আর শক্তি আসবে। আসবেই। আবেগের আর বিশ্বাসের এ-কথাটা পানুদাকেই সব থেকে আগে বলার কথা, কিন্তু কেন যেন তাকে বলাই গেল না।

এদিকে বিধান রায়ও ঘোষণা করেছেন, দেশের মানুষের খাওয়া-পরার সমস্যা দূর করতেই হবে, দশ লক্ষ ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের গতি করতেই হবে—আর ঘন ঘন এই দাঙ্গার আতঙ্ক মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতেই হবে। কিন্তু পানুদা আর যেন কোনো বিশ্বাসেই বুক বাঁধতে পারছে না। বিদ্রূপের সুরে বলে, ভদ্রলোকের সদিচ্ছা আছে কেউ অবিশ্বাস করে না, কিন্তু এই কাঠামো বদলানোর আর দেশ ভাগের বিষ ঝাড়ার সাধ্যি

আছে কারো ?

পানুদার এত তিক্ততার কারণ বুঝতে পারে যমুনা। সেই আটচল্লিশ সালের গোড়ায় বি. এসসি পাশ করেছে, অনার্স অবশ্য ছেড়ে দিয়ে বসেছিল, কিন্তু পাসকোর্সে ডিস্টিংশন পেয়েই পাশ করেছে। তারপর থেকে প্রায় দু'বছর ধরে চাকরির চেষ্টায় হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। ছোট কাজ অবশ্য দুই-একটা পেয়েছিল, কিন্তু তাতে মন ওঠেনি। তাকে অনেক রোজগার করতে হবে, বউদির দুঃখ ঘোচাতে হবে, রাণু সুমুকে মানুষ করে তুলতে হবে, ভালো ঘরে বড় ঘরে বিয়ে দিতে হবে। কেরানিগিরি করে এ-সব হবে ? যে রেটে বেকার বাড়ছে, ভবিষ্যৎ আছে এমন মাঝারি গোছের চাকরিই বা পাচ্ছে কোথায় ? পানুদার মনে মনে খুব ইচ্ছে ব্যবসা করে বড় হবে। কিন্তু পুঁজি কোথায় যে ব্যবসায় নামবে ? তার বন্ধু ফণী শিকদার নাকি ব্যবসা করে বেশ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার চালচলন দেখলেই নাকি বোঝা যায় টাকার মুখ দেখছে। সে-ও তো গরিবের ছেলে, পুঁজির জোর নেই—সে কি করে ব্যবসায় নেমে গেল ? জবাবে সে বুক ফুলিয়ে পানুদাকে বলেছে, হিম্মত আর বুকের পাটা তার আসল পুঁজি, এ দুটো থাকে তো চলে আয় আমার সঙ্গে।

কিছু না হলেও পানুদা ওই ফণী শিকদারের দলে গিয়ে ভিড়বে, এ-চিন্তাও যমুনা বরদাস্ত করতে পারে না। রেগে গিয়ে বলেছিল, খবরদার, তুমি ওর ছায়া মাড়াবে না বলে দিচ্ছি।

রাগ দেখে পানুদা হেসেছে। হাসির কারণ অবশ্য আছে। তবু যমুনার গা জ্বলেছে।···যমুনার বয়েস এখন আঠারো, ক্লাস টেনে পড়ছে। কিন্তু মনের বয়েস তো সেই কবে থেকে দুড়দাড় করে এগিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে শরীরের কাঠামো যেন পাল্লা দিয়ে লোকের চোখ টেনে টেনে ওকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলছে। এরও মাস ছয় আগের কথা। এক ছুটির দিনের বেলা এগারোটা নাগাত ফণী শিকদারের গলা, পানু এখানে আছিস নাকি ?

হাঁক শুনে যমুনাকে দাওয়া ছেড়ে নেমে আসতেই হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বুকে যেন দুটো চোখের ছোবল পড়েছিল। তারপরেই ধূর্তের

মতো মুখে ভালো মানুষের খোলস। —কি-রে, কেমন আছিস, কতদিন পরে দেখলাম তোকে—

ওর চোখ দুটো গেলে দিয়ে যমুনার দেখা ঘুচিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল।

—পানু কোথায়, এই দিনটা ওর সঙ্গে কাটাবো বলে এলাম—

যমুনার তখনই মনে হয়েছিল, পাজিটার দিন ভালো যাচ্ছে। ঝকঝকে পোশাক-আশাক, চকচকে দামী জুতো, দু'হাতে দুটো সোনার আংটি, শার্টে সোনার বোতাম, কব্জিতে সোনালি ব্যাণ্ডের ঘড়ি।

—কলকাতায়।

—আজ ছুটির দিনে আবাব কলকাতায় কেন ? চোখে আবার লোভ চিকিয়ে উঠছে।

যমুনা জবাব দিয়েছে, তাব তো সব দিনই ছুটির দিন।

—ও ··এখনো চাকবি-বাকবির কিছু সুবিধে হল না বুঝি—ছোঁড়াটা চাকরি-চাকবি করেই গেল। কিন্তু আমি এখন কি করি, ভাবলাম একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কবব একসঙ্গে একটু আনন্দ করে কাটাবো···এখন এখান-কার কোনো ঘোড়ার ডিমেব হোটেলের ডাল-চচ্চড়ি কপালে আছে দেখছি—

যমুনা একবার সাপেব ছোবল খেয়েছিল। আর সেই দিন মনে হয়েছিল, এই পাজি ওই দুটো চোখ দিয়ে সর্ব-অঙ্গ ছুবলোচ্ছে। এ-কথার পরেও চুপ মেবেই রইলো।

—তা রোদেব মধ্যে এলাম, তুই তো তোর ইয়ের বন্ধুকে ঘবে ডেকে একটু বসতেও বলছিস না।

নির্লিপ্ত গলায় যমুনা বলেছে, বাবা এক্ষুনি খেতে বসবে, আমাকে এখন অনেকক্ষণ ধরে তার কাছে বসে থাকতে হবে।

যমুনা ভালোই জানে একবার ঘরে এসে বসতে পেলে সহজে আর তোলা যাবে না, বেহায়ার মতো সেধে খেতেও চাইবে। কিন্তু এমন তাচ্ছিল্য বরদাস্ত করার ছেলে নয় ফণী শিকদার। ক্রূর লোভাতুর দুই চোখ ওর মুখে বিঁধছে, বুকে বিঁধছে। তপ্ত গলায় বলল, তুই আমাকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচিস আমি বুঝি না ? এত দেমাক কিসের তোর ?

ভিতরে তেতে উঠছে যমুনাও। —দেমাকের কি দেখলে, বলেছি তোমার সঙ্গে বসে কথা বলার এখন আমার সময় নেই।

চোখের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে উঠছে ফণী শিকদারের। —আমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই তোর ? এক-হাত এগিয়ে এসে চাপা হিসহিস গলায় বলল, নেহাত বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না বলেই বেঁচে গেছিস, নইলে কবেই আমি তোকে খেয়ে দিতাম—

যমুনার মাথায়ও রক্ত চড়ে গেছল। ঝাঁঝালো জবাব দিয়েছে, অত সোজা নয়।

তক্ষুণি জবাব দেয়নি। দেখছিল। যমুনার মনে হচ্ছিল, সাপটা ওকে শুধু ছুবলোচ্ছে না, পাকে পাকে জড়াচ্ছেও। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল কেন জানে না। ফণী শিকদার দেখছিল আর হাসছিল। কারো হাসি এত কুৎসিত হয় ! গলার স্বর আর কথার সুরও বদলেছে। —আমাকে চিনলে এমন চ্যালেঞ্জ করতিস না, যার জোরে তোর এই দেমাক দরকার হলে তাকে আমি ছারপোকার মতো পিষে মারতে পারি জেনে রেখে দিস—তোর পানুকে আমার ওপর খাপ্পা করে তুলতে চেষ্টা করে ছাখ ফলখানা কি হয়—তোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারি কিনা দেখে নিতে পারিস।

চলে গেছে। যমুনার সর্ব-অঙ্গে জল-বিছুটি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। বিষ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। ···সে দিন বাগানে বসে পানুদা জোর দিয়ে বলেছিল, তোর গায়ে বিষ ঢুকলে হাজার বার আমি সে বিষ টেনে নেব—তোর গায়ে আমি বিষের ছিটে-ফোঁটাও থাকতে দেব না। ···পানুদার সঙ্গে দেখা হলেই বলবে, তোমার বন্ধু চোখের ছুরি বসিয়ে বিষ ঢেলেছে, কথার ঘায়ে বিষ ঢেলেছে—কি করবে তুমি এখন ?

না, যমুনা কিছুই বলেনি। এই ফণী শিকদারকে ওর ভীষণ লোলুপ ভীষণ হিংস্র মনে হয়েছে। মনে হয়েছে আজ যমুনাকে দেখার পরে যে-কোনো ছলে ও পানুদার ওপর হিংস্র হয়ে উঠতেই চায়। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারার মতো সুযোগ পেতে চায়। সে-জন্যই অমন শাসিয়ে গেল।

কিন্তু এ-দিকের অবস্থা দেখে যমুনাও ভিতরে ভিতরে দমেই যাচ্ছে। কাগজে দেখছে বিধান রায়ের দেশের ভালো করার চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু দেশ স্বাধীন হতে না হতে এই ভাগ-করা বাংলার ওপর কত যে অভিশাপ নেমে আসছে তারও ঠিক নেই। নানা জায়গায় নাকি পঞ্চাশটার ওপর উদ্বাস্তু শিবির করা হয়েছে। কিন্তু এখানকার এই একটা শিবির দেখেই যমুনার দম বন্ধ হবার দাখিল। মানুষ উপচে পড়ছে তো পড়ছেই। কি ভীষণ দুরবস্থার ছবি! চুরি ডাকাতি লেগেই আছে, মারামারি কাটা-কাটি বেড়েই চলেছে। পানুদা বলে এদের রুখবে কে, বিদেশীদের যুদ্ধের অস্ত্র শস্তায় এখন সাধারণ মানুষের হাতে চলে এসেছে না?

যমুনার বুক কেঁপে ওঠে। তক্ষুণি ফনী শিকদারের কদর্য কুৎসিত হাসি চোখে ভাসে আর তার শাসানি মনে পড়ে।

…এত সমস্যার ওপর প্রায়ই কাগজে দেখে খাবারের পুঁজি কমে আসছে। হু হু করে বাজার চড়ছে। সবেতে ভেজাল বাড়ছে। কালোবাজারীরা ওষুধপত্র শিশুর মুখের দুধ পর্যন্ত গায়েব করে বসে থেকে মুনাফা লুটছে। বেকারের পাহাড় গজিয়ে উঠছে।

পানুদার মুখের দিকে তাকালে সময় সময় দারুণ ভয়ই করে যমুনার। সে-দিন হেসে হেসে বলেছিল, রানু একবেলা আর সুমু দু'বেলা দুধ খেত, এখন ওরা কেবল সকালে আধ-পেয়ালা চায়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খায়। …বউদির হাতে ওদের দুধ খাওয়ানোর মতো টাকা আছে, কিন্তু আমার ওপর আর ভরসা করতে পারছে না বলেই এখন থেকে টেনেটুনে চলে সাবধান হচ্ছে।

পানুদার মুখের এই হাসি যমুনার বুকের ভিতরে কেটে কেটে বসছিল।

…যমুনার যদি এমন মন্ত্র জানা থাকত যার জোরে পানুদার এক্ষুণি একটা ভালো চাকরি হয়ে যেত।

সেদিন বলল, রোজ তুমি কলকাতা চষে বেড়াচ্ছ, এমন একজনকেও

ধরতে পারছ না যে চেষ্টা করলে একটা ভালো কাজ হতে পারে ?

পানুদা তেতো গলায় জবাব দিয়েছে, হুঁঃ, রোজ হাজার হাজার বেকার ছেলে বিধান রায়ের কাছে হত্যা দিচ্ছে—তার দ্বারাই কিছু হচ্ছে না, অন্য লোকে করবে।

কিন্তু ক'দিনের মধ্যে এক শস্তার সাপ্তাহিকীতে বিধান রায়ের দরদের কথা পড়ে আশায় আর আনন্দে যমুনার বুকের ভিতরটা ভরে গেল। বি-এ পড়া এক মেয়ে বিধান রায়কে সরাসরি একটা চিঠি লিখেছিল। সেই মেয়ে ভালবেসে গরিব ঘরের এক ম্যাট্রিক পাশ ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। সেই ছেলে বেকার। একে ম্যাট্রিক পাশ তায় বেকার—বাড়িতে তাই ভীষণ বাধা। মেয়ে চিঠিতে লিখেছে, এখন তার জীবন-সংশয়—ওই ছেলেকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে হলে তার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। লিখেছে, এই ছেলেটিকে একটা চাকরি দিয়ে আমাকে বাঁচাতে পারেন না।

বিধান রায় বাঁচিয়েছেন। সেই ছেলেটিকে চাকরি দিয়েছেন।

যমুনা তক্ষুণি ঠিক করে ফেলেছিল, সে-ও বেশ গুছিয়ে একটা চিঠি লিখবে। ম্যাট্রিক পাশ ছেলের চাকরি হলে ডিস্টিংশনে বি-এসসি পাশ ছেলের চাকরি হবে না কেন ? তারপর নিজের মনেই হেসেছে আর চিন্তা বাতিল করেছে। ও মিথ্যের আশ্রয় নেবে কি করে, ওর কি জীবন সংশয় ? কিন্তু আশার আলো দেখেছে। যে মুখ্যমন্ত্রীর বুক-ভরা এত দরদ, সে এই দেশটাকে টেনে তুলবেই—দুর্দিনের কালো ছায়া সরে যাবেই।

ভেবেছিল, ব্যাপারটা পানুদাকে বলবে। বলেনি। বলবে কি, যে মেজাজ ! হয়তো এমন কিছু বলবে, ওর আশাটুকুই গুঁড়িয়ে যাবে। এই স্বাধীনতা নিয়ে যখন যা বলেছে তার কিছুই তো এখন পর্যন্ত মিথ্যে হয়নি।

হঠাৎ সেদিন ছেলের মন-মেজাজ একটু ভালো দেখল যমুনা। আজ-কাল ওর অঙ্কের মাস্টারি করার ব্যাপারেও অত উৎসাহ নেই। যমুনাই বরং অনুযোগ করে, আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা যত এসে যাচ্ছে, তুমি ততো ঢিলে দিচ্ছ—এরপর ফেল করলে একটি কথাও বলতে পাবে না।

কিন্তু সেদিন গম্ভীর মুখে চেয়ার টেনে বসেই বলল, যমুনা, এখন থেকে নিজেই যতটা পারো মন দিয়ে অঙ্ক করো—এবার থেকে আমি আরো একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ব।

তুমি করে বলাটা খট করে কানে লেগেছে। জিগ্যেস করেছে, ব্যস্ত হয়ে পড়বে কেন?

—একটা কাজে লেগেছি, সে-কাজের মেহনত আর ঝুট ঝামেলা খুব—কোথায় ক'দিনের জন্য সরে পড়ব কেউ বলতে পারে না।

যমুনা যত খুশি ততো উৎসুক। —কি কাজ? ভালো চাকরি?

—চাকরি না বলে এক ধরনের ব্যবসাই বলতে পারো।...কিন্তু বিনা মূলধনের ব্যবসায় দায় আর স্টেক্ অনেক বেশি—কাজ করে ফল পেলে ভালো টাকা, না পেলে...

—ও কনট্রাক্টারির কাজ বুঝি?

জবাবে আবারও তুমি। —কনট্রাক্টারিও বলতে পারো। খুব হিসেব কষে এক-একটা অভিযানে নামতে হবে—সফল হলে ভাগে মোটা টাকা আসতে পারে—না হলে ডুবতেও পারি। ...যাক, যে অঙ্কটা ধরেছ, মন দিয়ে কষে ফেলো।

কিন্তু যমুনার অঙ্ক মাথায় উঠল। —সফল না হলে ডুবতে পারো মানে কি?

হঠাৎ অসহিষ্ণু। —তুমি অঙ্কে মন দেবে? ছেলেদের ব্যবসাপাতি রোজগার নিয়ে মেয়েদের কৌতূহল আমি পছন্দ করি না—এটা পার-মানেন্ট কাজ কিছু নয়—হাতে কিছু টাকা এলেই অন্য ব্যবসায়—মন দেব—গো অ্যা-হেড!

বলাবাহুল্য অঙ্কটা ভুল হয়ে গেল।

—যমুনা, তোমার মাথায় একটা গাঁট্টা মারা উচিত।

—তুমি এ-রকম করে কথা বলছ বলেই তো আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে।

ঠোঁটের কোণে হাসি। —কি-রকম করে কথা বলছি?

—আনন্দে তুমি করে বলছ।

—সেটা আনন্দে নয়, কাকার সঙ্গে মানে তোমার বাবার সঙ্গে একটু

আগে বাইরে দাঁড়িয়ে যে-কথা হয়ে গেল, এরপর আর তুই-তুকারি অচল।

যমুনা দারুণ উৎসুক। —বাবার সঙ্গে কথা!···কি কথা?

—তোমাকে পার করার কথা। তোমার পিসি বলে আঠারো গড়িয়ে উনিশ হতে চলল, তোমার দিকে আর তাকানো যায় না—তোমার বাবাও তাই চিন্তায় পড়েছে—আমাকে বলছিল কোনো ভালো ছেলের খোঁজ পেলে যেন দেখি।

মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে কিনা যমুনা জানে না।—তুমি কি বললে?

—যা আমাদের মধ্যে অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে তাই বললাম।

—আঃ, কি বললে শুনি না?

—বললাম, যমুনার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না, যমুনার সমস্ত ভার আর সব দায়িত্ব আমার।

—তারপর? যমুনার বুক দুরু দুরু।

—তারপর আরো ভালো করে কথাটা বুঝিয়ে দেখার জন্য তাঁর পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণামও করে ফেললাম।

—তারপর? যমুনা বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না।

—তারপর আর কি—হাঁ করে খানিক চেয়ে থেকে উনি দু'হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—অনেক আশীর্বাদ করলেন।

বাজে কথা যে নয় যমুনা সেই রাতেই বুঝেছে। ও চলে যাবার পর হাসি-হাসি মুখে বাবা কাছে এসে বলেছে, তোদের এই ঠিক হয়ে আছে আমাকে বলিসনি কেন, আমি তো বরাবর জানি পানু খুব ভালো ছেলে—যাই, তোর পিসিকে বলে নিশ্চিন্ত করি, সে তো তোর বিয়ে-বিয়ে করে আমাকে ঘরে তিষ্ঠোতে দেয় না।

লজ্জার মাথা খেয়ে যমুনা বলেছে, না বাবা না, পিসি জানলে শ্যাম-নগরে কারো আর জানতে বাকি থাকবে না—তুমি এখন কাউকে কিচ্ছু বলবে না।

এরপর থেকে পানুদা সত্যি ওকে আর কখনো তুই করে কথা বলেনি।

এমন কি বাবা আর পিসির সামনে দিব্বি তুমি-তুমি চালিয়েছে। ছেলে-গুলোর যদি লজ্জা-সরম বলে কিছু থাকত।

যমুনার জগৎ আবার রঙে রঙে ছেয়ে গেছে। যে-দিকে তাকায় যা দেখে—রঙের ছড়াছড়ি। এ-ও জানে এই রঙ ওরই ভিতবের রঙ। · মনে হয় মা সব-দিকেই মুখ তুলে চেয়েছে। নিজেই কাজের কথা মুখে বলেই না, দু'কথার বেশি তিন কথা জিগ্যেস কমলে বিরক্ত-ভাব দেখায়, বলে, দেখো যখন তোমার কাছে আসি আমার কাজের কথা মনে করিয়ে দিও না —এ কাজ থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাই ততো আমার ভালো তোমার ভালো সকলেব ভালো—

যমুনা এটুকু শুনেই উতলা হয়। কি কাজ? তাহলে এমন কাজ করছ কেন?

—করছি—করছি, ব্যস। আরো বিরক্ত। আমার রক্তে আগুন লাগে, তাই করছি। হাতে পুঁজি কিছু জমলেই ছেড়ে দেব—শান্তির ব্যবসা করব। তোমাকে বলে দিয়েছি না, ছেলেদের কাজ রোজগার এ-সব নিয়ে মেয়ে-দের কৌতূহল আমার ভাল লাগে না!

যমুনা চুপ মেরে যায়। কিন্তু মনে মনে বলে, আহা কি বুদ্ধি, মোটা রোজগারের কথা শোনার লোভে যেন জিগেস করি। ওব উতলা হবার আরো কারণ, যে কাজ করছে তার ধকল খুব সন্দেহ নেই—কলকাতায় বসে কাজ নয়, নানা জায়গায় চলে যেতে হয়—তিন চার বা পাঁচ দিনেব মধ্যে আর ফেরেই না! চোখ মুখ বসে যাচ্ছে, চোখেব কোলে কালি পড়ছে। কিন্তু শরীরের কথা তুললেও আবার রেগে যায়। সেদিন রেগে গিয়ে এমন বে-খাপ্পা কথা বলল, যে যমুনা হতভম্ব। বলল, তোমার মা কালীকে বলো না সব কালি মুছে দেবার ব্যবস্থা করুক—তা না হলে কালির বহর দেখে তুমিই একদিন ঘেন্নায় সরে যাবে।

যমুনা ভাবে, থাক বাবা, কাজের কথা তুললেই যখন এত বিরক্তি, না তোলাই ভালো। কিন্তু রোজগার যে এদিকে ভালো হচ্ছে যমুনা ভালোই টের পায়। ওর বউদির মুখে এখন হাসি দেখা যাচ্ছে। এখন মেয়ে দুটো দুবেলা দুধ পায়। বড় মেয়ে রানুর জন্য মাস্টার রাখা হয়েছে। ওদের জন্য

নতুন নতুন জামাকাপড় আসছে। এক-একদিন এত বাজার করে আনে যে রান্নায় সাহায্য করার জন্য আর খেয়ে যাওয়ার জন্য বউদি যমুনাকে ডেকে পাঠায়।···এর মধ্যে একদিন তো ইলাহি কাণ্ড করে বসল পান্নুদা। পুজোপার্বণ কিছুই নেই, হঠাৎ সক্কলকে জামাকাপড় দেবার ঝোঁক চাপল মাথায়। নিজের বাড়িতে তো সবাইকে দিয়েইছে—যমুনার জন্য নিজের পছন্দের ত্বখানা চমৎকার শাড়ি এনেছে। এত ভালো শাড়ি যমুনা এ পর্যন্ত ছুঁয়েও দেখেনি। লেবেলে দাম লেখা। একটা একশ দশ অন্যটা নব্বুই টাকা দামের শাড়ি! সেই দিনে এত দামের শাড়ি পাওয়ার চিন্তাও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো। শুধু এই নয়, বাবার জন্য তাঁতের ভালো ধুতি, সিল্কের চাদর, আর গরদের পাঞ্জাবির কাপড়—পিসির জন্য একজোড়া মিহি থান।

যমুনার আনন্দ কত হয়েছে সে-ই জানে কিন্তু রাগও কম হয়নি। বলেছে, এ-ভাবে ত্ব'হাতে খরচ করে তুমি নিজের ব্যবসার পুঁজি বাড়াবে?

হেসে হেসে জবাব দিয়েছে, আমার আসল পুঁজি তুমি—মা-কালীকে বলো যতো শিগগির পারে আমাকে নিজের রাস্তা দেখিয়ে দিক।

টান-ধরা মুখের ওই হাসি দেখে আর কথা শুনে যমুনার সমস্ত আনন্দ-টাই মাটি। সন্ধ্যায় আসবে বলে চলে গেছে। ওদিকে বাবা আর পিসির আনন্দও কম কিছু নয়। বাবা তৃতীয় দফা ওর ঘরে এসে বলেছে, ও একটা পাগল, বুড়ো মানুষের জন্য এত খরচ করে এসব আনে। জীবনে আমি এমন ধুতি-পাঞ্জাবি চাদর পরেছি! শেষের বারে এসে বলল, হ্যাঁ রে, পান্নু রোজগারপতি এখন ভালই করছে তাহলে?

—ভালো করছে, কিন্তু এ-কাজ নিয়ে খুব অশান্তিতে আছে।

বাবা বলল, চাকরি মানেই অশান্তি, এ আর কার ভালো লাগে, তবু পুরুষ মানুষের লেগে থাকতেই হয়।···তা হ্যাঁরে, তোর ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে বিয়েটা চুকিয়ে ফেললেই তো হয়···সেই রকমের ইচ্ছে কিনা কিছু বলে?

যমুনা মাথা নেড়েছে। কিছু বলে না। তারপর নিজে যেমন বুঝেছে বাবাকেও তাই বলেছে। তার কিছু দেরি আছে বোধহয়···হাতে কিছু টাকা

জমলে নিজে ব্যবসা করবে বলছে—তুমি এখন ওর কাছে এ-সব কথা তুলো না বাবা।

স্কুলমাস্টার বাবার এ-কথা ভালো লাগবে না জানা কথাই। লাগে-গুনি। বাবার মতে যা করেছে, যা পাচ্ছ তাতেই সন্তুষ্ট থাকো।

সন্ধ্যার পর পানুদা এলো। খুশিতে ডগমগ সোনাপিসি নিজের হাতে আজ তার জন্য জলখাবার নিয়ে এলো। সোনার ছেলের মাথায় আবার একপ্রস্থ আশীর্বাদ বর্ষণ করল। এ ছেলেই যে এ বাড়ির জামাই হবে সেটা আঁচ করে বাবাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে। বাবা মিথ্যে বলতে পারেনি। কিন্তু তার কড়া নিষেধ শুনে এখন পর্যন্ত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বেড়াচ্ছে না। রোজগারপাতি কেমন পিসির তখনো ধারণা ছিল না, সেই ছেলেবেলা থেকে দেখা দুষ্টু-দামাল ছেলে পিসির পেছনেও কত লেগেছে, কত জ্বালিয়েছে ঠিক নেই—সে জামাই হবে শুনে পিসির আনন্দে আট-খানা হবার কি আছে! উল্টে বাবার বুদ্ধি বিবেচনা দেখে তার মেজাজ বিগড়েই ছিল। বোধহয় মিহি থানের জোড় পেয়ে আর সকলকে অত দামী জামাকাপড় দিতে দেখে আজ একদিনেই এই ছেলে পিসির চোখে সোনার ছেলে হয়ে গেছে।

—খাও বাবা, আজ আমার আর দাদার বড় আনন্দের দিন—যমুনা কত ভাগ্য করেছিল ঠিক নেই।

যমুনা আড়চোখে লক্ষ্য করেছে পানুদার মুখে খুশির বদলে বিরক্তির ছায়া। তাড়াতাড়ি বলেছে, ওসব রেখে তুমি চটপট এখন সরে পড়ো তো —তোমার সোনার ছেলের রাগ তো জানো না—ম্যাট্রিকে অঙ্কে ফেল করলে আমার ভাগ্য ভেসে যাবে।

পিসি যেতে যেতে মন্তব্য করে গেল, ফেল করবি কেন, যার হাতে পড়েছিস ফেল করার তোর সাধ্যি আছে ?

লজ্জা পেয়ে যমুনা মন দিয়ে খোলা বই থেকে অঙ্কটা ভালো করে পড়ে নিতে আর বুঝে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু ছাইয়ের মন যে কোথায় উড়ছে নিজেই ভালো জানে। পানুদা একটু চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার আর কত দেরি···?

দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে যমুনা মনে মনে একটু হিসেব করে নিল। মাঝে আর মাত্র এক মাস ছাব্বিশ দিন বাকি, পুরো দু'মাসও নয়।

—আমি তো আর সে-রকম দেখতে-টেখতে পারছি না, নিজেই যতটা পারো মন দিয়ে করো।

বেশি দেখতে পারছে না বলে যমুনার এতটুকু অভিযোগ নেই। যখনই আসে মানুষটাকে খুব ক্লান্ত মনে হয়। তাই এলে যমুনার অঙ্ক নিয়ে বসতেও ইচ্ছে করে না। একলা যখন থাকে অঙ্কেতেই সব থেকে বেশি মন দেয়। তাছাড়া অঙ্ক নিয়ে আর একটুও ভাবনাচিন্তা নেই। পানুদা যে ভিত গড়ে দিয়েছে তা কত শক্তপোক্ত নিজেই অনুভব করতে পারে। এমন হবে জানলে স্বচ্ছন্দে ও অ্যাডিশনাল অঙ্ক নিয়ে বসতে পারত। পানুদা তাহলে কত না খুশি হত। বলতে ইচ্ছে করল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমার অঙ্ক নিয়ে আর তোমাকে ভাবতে হবে না। তাও বলা গেল না।

বেশ একটা কঠিন অঙ্কই ধরেছে কিন্তু যমুনা সেভাবে মন দিতে পারছে পারছে না। মুখ না তুলেও থেকে থেকে মনে হচ্ছে অঙ্কের দিকে নয়, পানুদা চুপচাপ ওর দিকেই চেয়ে আছে, ওকেই দেখছে। শেষে মুখ না তুলে পারল না।

—কি দেখছ ?

—তোমাকে।

যমুনা ফিক করে হেসে ফেলল একটু ! কি ভাবছ ?

—তোমার কথাই।

খাতার ওপর কলমটা নামিয়ে রাখল। চাউনিটা গভীর অথচ বিষণ্ণ কেন ভেবে পাচ্ছে না। তবু তরল গলাতেই যমুনা বলল, বাবার মতো কিছু ভাবছ না তো ?

এবারে একটু আত্মস্থ মনে হল তাকে। নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, কাকা কি বলেছে ?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে যমুনা বলল, অত ভালো জামাকাপড় চাদর পেয়ে বাবা মুখে বার বার অনুযোগ করলেও মনে মনে দারুণ খুশি।

আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, তোমার কি ইচ্ছে ··আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে হবে কিনা।

যমুনা কি ঠিক দেখছে না চোখের ভুল। মনে হল সমস্ত মুখখানা পাংশু বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যমুনার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, কি হল? বাবা কথার কথা জিজ্ঞেস করেছে, তোমাকে কোনরকম তাগিদ দেয়নি··· ।

জোর করেই কিছু একটা যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলার মতো মুখ পান্নুদার। বলল, না ওঁর আর দোষ কি, উনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন। ···কিন্তু যে কলে পড়ে গেছি তার থেকে বেরিয়ে এসে একটা কিছু না করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

যমুনা তাড়াতাড়ি জানান দিল, আমিও বাবাকে সে-কথাই বলেছি। ··কিন্তু পা-পান্নুদা—ধেৎ আমারও এখন সামনাসামনি পান্নুদা বলতে লজ্জা করে—

পান্নু সতৃষ্ণ চোখে খানিক চেয়ে রইলো ওর দিকে।

—কি বলছিলে ?

—বলছিলাম যে কাজে লেগেছ সেটা এতই যখন খারাপ লাগছে, এক্ষুণি ছেড়ে দাও না ? এখানে এত টাকা রোজগার করেও তো তোমার শরীর মন ভেঙে পড়ছে—

জবাব দিতে সময় নিল। তারপর বলল, ইচ্ছে করলেই সব কাজ যখন-তখন ছাড়া যায় না ·এক ধরনের অলিখিত চুক্তি থাকে, সেটা ভাঙলে বিপাকে পড়তে হয়···সাংঘাতিক ঘাটতি দিতে হয়—তখন প্রাণসঙ্কট বলতে পারো।

যমুনা ঘাবড়েই গেল। কত দিনের চুক্তি ?

—আরো বছরটাক···। যাক, আমার কাজকর্ম নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না তো, মন দিয়ে পড়াশুনা করে যাও।

যমুনা মন ঢেলেই পড়াশুনা করছে : কিন্তু একজনকে এত ক্লান্ত এত বিমর্ষ দেখলে সেই মন স্থির থাকে কি করে? দেখতে দেখতে ওর পরীক্ষা এসেই গেল। খুব আশা করেছিল পরীক্ষার কটা দিন অন্তত পান্নুদাকে কাছে পাবে, সে সাহস দেবে, উৎসাহ দেবে। যমুনার সাহসের অভাব নেই, কিন্তু

ওই একজনের অভাবে উৎসাহে ঘাটতি। অঙ্ক পরীক্ষার দিন আসবেই ধরে নিয়েছিল। এই এক পেপারে যমুনার থেকে তার আগ্রহ ঢের বেশি। পরীক্ষা শেষে প্রশ্নপত্র হাতে উৎসুক চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে যমুনা গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পরীক্ষা বেশ ভালো হয়েছে, কিন্তু যতটা সম্ভব মলিন মুখ করেই আসছিল, যাতে দূর থেকে দেখামাত্র ভাবে ধেড়িয়ে বসেছে। কিন্তু এই দিনেও ওই মুখ অনুপস্থিত।

···কাজের তাড়ায় নিশ্চয় কলকাতার বাইরে কোথাও চলে গেছে। তবু দুশ্চিন্তায় ভিতর ছেয়ে যায়। কলকাতার যা অবস্থা এখন। হাঙ্গামা ডাকাতি দাঙ্গা গোলাগুলি রক্তারক্তি লেগেই আছে। পরীক্ষা থাক আর যা-ই থাক, কাগজে রোজ একবার চোখ না বুলিয়ে পারে না। কাগজে কি কোনো ভালো খবর থাকতে নেই? কোথায় কোন্ সোনার দোকানে ভয়ঙ্কর ডাকাতি হয়ে গেল, কোথায় দাঙ্গায় কি নৃশংসভাবে কত লোক খুন হয়ে গেল, কোন উদ্বাস্তু মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচাব করে মেরেই ফেলেছে, আজ অঙ্ক পরীক্ষার দিনে বড় বড় হরফে কাগজের প্রথম খবর, পুরী প্যাসেঞ্জারে ডাকাতি এবং নৃশংস খুন—তার রোমহর্ষক বিবরণ। এরই মধ্যে কলকাতায় আবার জোর দাঙ্গা শুরু হয়েছে। কলকাতায় আবার আগুন জ্বলছে, ঘাতকের অস্ত্র রক্ত খাচ্ছে। বরিশালে রটে গেছে কলকাতার এই দাঙ্গায় ফজলুল হক সাহেব নিহত হয়েছে—ফলে বরিশালে রক্তগঙ্গা বইছে।

কাগজওয়ালারা এমনভাবে লেখে যেন সমস্ত দৃশ্যের আগাপাছতলা তাদের স্বচক্ষে দেখা।···পানুদা এই সন্ত্রাসের দিনে কলকাতায় নেই ধরেই নিয়েছে, তবু দুশ্চিন্তায় যমুনার মন ছেয়ে যায়। ঘরপোড়া গোরুর মতো দু' দুবারের সেই অঘটন আর ত্রাস ভুলবে কি করে?·· বিয়াল্লিশে দাদা গেল, আর ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নিমুদা! ধেৎ ছাই! পানুদা কলকাতায় নেই জানে, তবু চিন্তা করাটা যেন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

পরদিন শেষ পরীক্ষা অর্থাৎ ইতিহাস পরীক্ষাও হয়ে গেল। এইদিনেও তার দেখা নেই। এবারে কোথায় কতদিনের জন্য চলে গেল অথচ কিছুই বলে গেল না এটাই আশ্চর্য। এখন যমুনা করবে কি! এতদিন পরীক্ষার

চাপ মাথায় ছিল, একভাবে কেটে গেছে। এখন ফাঁকা মাথায় যেন রাজ্যের দুশ্চিন্তা ঠেসে বসার জন্য ওঁত পেতে ছিল।

পরদিন। সন্ধ্যা হয় হয়। যমুনা সকালে একবার পানুদার বাড়িতে খোঁজ নিতে গেছল। সেখানে বউদিও বেশ চিন্তায় আছে দেখে এসেছে, সে-ও এর মধ্যে কোনো খবর বা চিঠি পায়নি। যমুনা এখন আবার একবার যাবে কিনা ভাবছিল। হঠাৎ জানলার কাছে পরিচিত গলার মৃদু ডাক শুনে কেন যেন ভয়ানক চমকে উঠল।

—যমুনা!

যমুনা জানলায় ছুটে এলো। এখন পর্যন্ত অন্ধকার দিনের সবটুকু আলো একেবারে চেটেপুটে খায়নি। মুখ দেখা যাচ্ছে!

—বাইরে থেকে ডাকছ কেন? ভিতরে এসো।

—না, তুমি চুপচাপ বেরিয়ে এসো, ঘরে ভালো লাগবে না, বাগানের সেই জায়গায় গিয়ে বসি।

যমুনা থমকালো, চোখমুখ খুব স্পষ্ট নজরে আসছে না। এমন প্রস্তাব আগে কখনো শোনেনি। বাগানের ওই খেজুরগাছ ঘেরা নিরিবিলি বসার জায়গা থেকে সাপ আর পোকামাকড়ের ভয়ে দিনের আলো মুছে যাবার আগেই উঠে এসেছে। আর আজ এতদিন পরে এসে সন্ধ্যার মুখে সেখানেই গিয়ে বসতে চাইছে!

—এই অন্ধকারে এখানে ওখানে গিয়ে বসবে কি! আর তুমি এত আস্তেই বা কথা কইছ কেন?

—কাকা টের পেলে আবার ডাকাডাকি করবে এই জন্য, মাথাটা এত ধরেছে যে ফাঁকা জায়গা ছাড়া ভালো লাগবে না, কিচ্ছু ভয় নেই, আমার সঙ্গে টর্চ আছে—

যে ডাকছে তার সঙ্গে অন্ধকারে যেতেও যেন একটু ভয় যমুনার। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সোনাপিসির দুধ জাল দিচ্ছে, অর্থাৎ বাবার আর নিজের রাতের আফিমের জন্য তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কিছু জানান না দিয়ে বেরুলে একটু বাদেই তো খোঁজ পড়বে। রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পিসিকে বলল, একটু ঘুরে আসছি, ঘরে না দেখে আবার ডাকাডাকি শুরু

কোরো না।

মুখ না ফিরিয়েই পিসি শুধলো, এই ভরসন্ধ্যায় আবার কোথায় বেরুচ্ছিস ?

জবাব না দিয়ে যমুনা নিঃশব্দে সরে পড়ল। মাটিতে টর্চের আলো ফেলে দুজনে পাশাপাশি বাগানের দিকে পা বাড়ালো। যমুনা মৃদু গলায় বলল, এতদিনের মধ্যে তোমার একটা খবর নেই বার্তা নেই, এত বড় পরীক্ষাটা হয়ে গেল তার মধ্যেও একটা বার এলে না—আমি ভেবে অস্থির—অনেক দূরে কোথাও গেছলে নাকি ?

—বলছি। পরীক্ষা কি রকম হল ?

—ভালোই··· ।

—অঙ্ক পরীক্ষা ?

—খুব ভালো হল। পরীক্ষা-টরীক্ষার কথা এখন ভালো লাগছে না—নিজের কথা বলো। ঘরে বসলেই হত, অন্ধকারে ছাই মুখও দেখতে পাচ্ছি না।

শব্দ করে হেসে উঠল একটু। এ মুখ কি দেখার মতো !

যমুনা বলল, খুব হয়েছে—পরে নিজেও হেসে বলল, এই মুখ দেখেই সমস্ত জীবন কাটাতে হবে, দেখার মতো না হলে চলবে কেন !

গাছগাছড়ার দরুন এখানে অন্ধকার আরো বেশি। টর্চের আলো মাটি থেকে তোলার উপায় নেই। খেজুর ঝোপের আড়ালে সেই নিরিবিলি জায়গায় এসেই যমুনা বলল, ছাখো তো এ সময়ে এখানে কেউ আসে, সাপ না হোক বিছেটিছে তো কামড়াতে পারে—

টর্চটা তার মুখের ওপর উঠে এলো। কয়েক সেকেণ্ড বাদে নামল। এ সময়ে ছেলেবেলায় তুমি অনেক এসেছ, জ্যোৎস্না রাতে আরো ভয়, তখন আরো বেশি এসেছ—তোমার সাপ বিছেটিছের ভয়, না আমাকে ?

যমুনা খপ করে টর্চটা হাত থেকে টেনে নিল। ওটা জ্বালাই আছে, তার মুখের ওপর ফেলল। তারপরেই ভীষণ আঁতকে উঠল। উস্কোখুস্কো চুল, মনে হয় পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে চান করেনি. সমস্ত মুখে আলগা কালির ছোপ, চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে গর্তে ঢুকে গেছে, কেমন

উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি।

যমুনা আঁতকে উঠে কাছে সরে এলো। খুব কাছে। এ কি। এ ক'দিনের মধ্যে এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? কি অসুখ হয়েছে? এতদিন কোথায় ছিলে?

—টর্চটা নামাও, অসুবিধে হচ্ছে···

সামান্য নামালো। দুই শুকনো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে দেখতে পাচ্ছে। জবাব দিল, কাছেই ছিলাম, প্রাণপণে কাজ করে চুক্তির মেয়াদ শেষ করব বলে এক দিন এক রাতও বিশ্রাম নিইনি—এবারে নিশ্চিন্ত।

—ছাড়া পেয়েছ?

—বরাবরকার মতো।

—তাহলে এখন টানা বিশ্রাম করো, ডাক্তার দেখাও!

এ কি অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে তার দিকে যমুনা ভেবে পাচ্ছে না। দুই ঠোঁট আর জিভ এত শুকনো সাদা যে কথা আটকে যাচ্ছে। টেনে টেনে জবাব দিল, ডাক্তার দেখাবার দরকার নেই, শুধু বিশ্রাম নিলেই হবে।···আমাদের খোদ মুরুব্বি বাদে আর সকলেই নিরাপদ বিশ্রামের আশায় এদিক ওদিকে চলে গেছে।···আমিও চেঞ্জে যাব, কিন্তু ওদের মতো চেঞ্জে নয়····।

যমুনা নিজের অগোচরে প্রায় তার বুক ঘেঁষেই দাঁড়িয়েছিল। সহজ কথাগুলো কি ভীষণ দুর্বোধ্য লাগছে, চাউনিও এ কি অদ্ভুত! ঠোঁট দুটো অত কাঁপছে কেন, খুব জ্বরটর এলো? ডান হাতে জ্বলন্ত টর্চ, বাঁ হাত তার কপালে তুলতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে ওকে টেনে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরল। যমুনার হাতের টর্চের মুখ আপনিই সোজা ওপর দিক হল। দুজনেই দুজনের মুখ দেখতে পাচ্ছে।

—যমুনা, তোমার মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করো আমার বিশ্রামে আর যেন ব্যাঘাত না ঘটে—খুব নিশ্চিন্ত আর খুব ঠাণ্ডা বিশ্রাম হয়। করবে? করবে?

নিজের বুকের সঙ্গে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে হঠাৎ পাগলের মতোই চুমু খেতে লাগল। ঠোঁটে গালে মুখে। কিন্তু এমন ভয়াল বিড়ম্বনার

মধ্যেও যমুনার মনে হল কি ভীষণ দুটো শুকনো ঠোঁট, শুকনো খড়খড়ে জিভ। নিজেই বলে উঠল, যমুনা আমার বুকের ভিতরটা জমা-পাথর হয়ে গেছে টের পাচ্ছ? পাচ্ছ?

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই ঠেলে সরালো ওকে। যমুনা সরে যাও, প্রার্থনার বদলে আমাকে তুমি অভিশাপ দিয়ে দূরে সরে যাও! আমার মধ্যে শয়তান মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। একটুখানি জীবনের তাপের লোভে সত্যিই আমি তোমার সর্বনাশ করে বসতে পারি—সরে যাও সরে যাও!

এবারে টর্চসুদ্ধ দু'হাতে যমুনাই তাকে বুকে জাপটে ধরল। অনভ্যস্ত ব্যগ্রতায় কয়েক পলকের জন্য তার শুকনো ঠোঁট দুটো সিক্ত করে দিতে চাইলো, তাপ ছড়াতে চাইলো। বলে উঠল, তুমি এমন করছ কেন? আমি যে বড় ভয় পাচ্ছি--এর থেকে বেশি সর্বনাশ তুমি কি আর করতে পারো? তোমার কি হয়েছে বলো—বলো?

এই আকুতিতে বুঝি কাজ হল একটু। আস্তে খুব দরদ দিয়ে দু'হাতে ওর বাঁধন ছাড়িয়ে নিল। ঠাণ্ডা গভীর চোখে দেখছে। ঠোঁটের কাঁপুনি থেমেছে। এইটুকু ভালবাসার স্পর্শে জীবনের তাপে বুকের তলার জমা পাথর আর্দ্র উষ্ণ হয়েছে। এই দ্বিতীয়বার শব্দ করে হাসল একটু। জবাব দিল, কি বলব, আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে বুঝছ না···আর কিছু না হোক তোমাকে এত ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই আমার ফাঁসি-টাসি হওয়া উচিত। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, চলো, ঢের পাগলামি হয়েছে, এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে, মাথাটা এমন ধরেছে দাঁড়াতে পারছি না।

আগে আগে পা বাড়ালো। তার টর্চ এখনো যমুনার হাতে। তাড়াতাড়ি এসে তার সঙ্গ নেবার আগেই গলা শোনা গেল, টর্চ নিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও—পরে দেখা হবে।

হনহন করে অন্ধকারে মিশে গেল। যমুনা সেই দিকে হাতের ছোট টর্চটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো খানিক। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ওর ওপর দিয়েই যেন আচমকা ঝড় বয়ে গেল একটা।

বাবা আর পিসি ঘুমনো পর্যন্ত নিজের ঘরে চুপচাপ বসে রইলো। ও-বাড়িতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ এ কি হয়ে গেল কিছুই বুঝছে

না। কেবল মনে হচ্ছে লোকটা দারুণ অসুস্থ। এই রাতে আর ও-বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়, কাল খুব সকালে উঠেই চলে যাবে।

নিঃশব্দে শিকল খুলে পুজোর ঘরে এসে দাঁড়ালো। প্রদীপের আলো জ্বালল। মা কালী এখন শয়ানে। পটের বুক পর্যন্ত ছোট কাপড়ে ঢাকা। উপুড় হয়ে বসে যমুনা একাগ্র দৃষ্টিতে মা কালীর মুখের দিকে তাকালো।

···প্রসন্ন মুখই তো মায়ের। হাসি হাসি মুখ।

যমুনা অনেক নিশ্চিন্ত। সব ঠিক আছে। · এক নাগাড়ে অত কাজের চাপ আর অত দুশ্চিন্তায় মাথাটা এ রকম হয়ে গেছে। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

···পরদিন খুব ভোরে বাবার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। যমুনার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। ঘুমিয়ে থাকলে বাবা এ রকম কখনো ডাকে না। মেঝেয় শুয়ে পিসি এখনো ঘুমোচ্ছে। শাড়ির আঁচল আদুড় গায়ের বুকে পিঠে জড়াতে জড়াতে যমুনা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো।

বাবা বলল, পানুদের পাড়ার কে একটা ছেলে ডাকছে তোকে, নিমুর বউ নাকি তাকে পাঠিয়েছে— বলছে বিশেষ দরকার, তুই ঘুমোচ্ছিস শুনেও ডেকে দিতে বলল—

যমুনার বুকটা আবার ছাঁৎ করে উঠল। গায়ে ব্লাউস-টাউস কিছু নেই তাও মনে থাকল না। ছুটে দাওয়ায় নেমে এলো। বেড়ার গেটের ওধারে ও পাড়ার অল্পবয়সী চেনা মুখ ছেলেই একটা। যমুনা এগিয়ে গেল।

ছেলেটি জানান দিল, পানুদার বউদি তোমাকে এক্ষুনি একবার যেতে বল···খুব বিপদ···

যমুনার দু'চোখ তার মুখের ওপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। —কি হয়েছে?

ঢোঁক গিলে ছেলেটি জবাব দিল, কাল মাঝরাতে কলকাতার পুলিশ এসে পানুদাকে ধরে নিয়ে গেছে—

যমুনার গলা দিয়ে ছুটো আর্তনাদের মতো শব্দ বেরিয়ে এলো। —কেন? কেন···?

—কিছুই জানি না, তুমি তাড়াতাড়ি এসো—বউদি পাগলের মতো করছে।

যমুনা ছুটেই ফিরে এলো। বাবা জিজ্ঞেস করল, কি রে হঠাৎ কাবে অসুখ-বিসুখ হল নাকি ?

—জানি না। ঘুরে আসছি—

মুখ-চোখে জল দেবারও ফুরসৎ হল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামা-কাপড় বদলে বেরিয়ে এলো। ছেলেটা চলে গেছে! যমুনা ঊর্ধ্বশ্বাসে চলল। পথে এখনো জনমানব নেই। যমুনা হাঁটছে না, প্রায় ছুটছে। তবু মনে হচ্ছে কাজিতলা অনেক দূরে।

বউদির আলুথালু বেশ উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি। ও যেতেই ছুটে কাছে এলো।
—ওরে যমুনা, এ কি হল ? পানুকে যে ওরা রিভলভার উঁচিয়ে হাত-কড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলে গেল। পানু নাকি বেল ডাকাতির খুনের আসামী! পানু খুন করেছে—পানু খুনী ? ওরা কি পাগল হয়ে গেল—কার দোষ কার ঘাড়ে চাপিয়ে ওরা পানুকে ধরে নিয়ে গেল—অ্যাঁ ? আমি কি করব এখন ?

যমুনা হঠাৎ পাথরের মতো স্থির একেবারে। নিস্পন্দ। চেয়ে আছে।

—তুই কথা বলছিস না কেন ? কাল রাতে পানু এসে বলল, অনেকক্ষণ এসেছে, তোর ওখানে ছিল, আর বলল, শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বে। সুমু ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে টেনে তুলে সে কি আদরের ঘটা—তার মধ্যে এ কি হয়ে গেল! তোকে কিছু বলেছে ?

যমুনা মাথা নাড়ল। কিছু বলেনি। হঠাৎ বড় আশ্চর্য স্থির সে। বউদি কাঁপছে। দু'হাতে তাকে ধরে ঘরে এনে বসালো। ঠাণ্ডা হয়ে বোস, কি হল বুঝতে দাও। পুলিশ কখন এসেছে ?

—রাত তিনটে-টিনটে হবে। দরজায় ধাক্কা পড়তে খুলে দেখি পুলিশে-পুলিশে বাড়ির চারদিক ছেয়ে আছে—কয়েকজনের হাতে রিভলভার। সে কি মূর্তি সব, হুড়মুড় করে সাত-আটজন ঘরে ঢুকে পড়ল। এত কাণ্ড পানু তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আমার কাছ থেকে ওর নাম জেনে তারাই ওকে ঠেলে তুলল। তারপর রিভলভার উঁচিয়ে হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বাঁধল—

যমুনা প্রায় চেঁচিয়েই জিজ্ঞেস করল, সে কিছু বলল না ? তাকে ধরার

কারণ জানতে চাইলো না ?

—না···না তো ? হয়তো করেছে, এত পুলিশ আমি তো ভিতরে ঢুকতেই পারছিলাম না—কিংবা অতজনের হাতে রিভলভার দেখে ছেলেটা হকচকিয়ে গেছল। বাড়ির সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে প্রায় সকাল পর্যন্ত সার্চ করে ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছে যখন—আমিই পাগলের মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—তাইতেই একজন বলল, রেল ডাকাতির খুনের আসামী হিসেবে ওকে নিয়ে যাচ্ছে—

যমুনা আবার বাধা দিয়ে উঠল, তখনো পানুদা কিছু বলল না—কোনো কথা বলল না ?

—না ··ওর প্রাণে তখন কি হচ্ছিল কে জানে···কিন্তু তুই এ-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

যমুনার সমস্ত মুখ শুধু নয়, সমস্ত সত্তা আরো ঠাণ্ডা। এত সার্চ করে ওরা কি পেল ?

—কেবল আট না ন'হাজার টাকা, এত টাকা ঘরে রেখেছিল আমিও জানতাম না।···আর রানু স্মুর নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই, ও-তে তেরো হাজার কত টাকা ছিল—আমিই ওদের গার্জেন তবু পাশ বই ওরা নিয়ে গেল—টাকা পাবে না কেন, ব্যবসার অংশীদার হিসেবে পানু তো ইদানীং খুব ভালোই রোজগার করছিল! আমার পাশ বইও ওরা খুঁটিয়ে দেখেছে—কিন্তু অনেক বছর আগের টাকা দেখে আর তোর দাদার পাওনার টাকা শুনে সেটা নেয়নি।

—ঘুমনোর আগে তোমার সঙ্গে তার কি কথাবার্তা হয়েছে ?

—কি আবার কথা হবে, ওর শরীর সত্যি খুব খারাপ ছিল—হ্যাঁ, খেতে খেতে একবার বলেছিল, তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে, রাতেই হয়তো ওকে নিতে লোক আসবে—

বলতে বলতে থমকালো। সমস্ত মুখ মুহূর্তের মধ্যে কাগজের মতো সাদা। হ্যাঁ রে যমুনা, তুই এসব জিগ্যেস কি করছিস—সত্যিই কি ওই সোনার ছেলেটা ডাকাতের দলে ভিড়ে অত টাকা আনছিল ভাবছিস নাকি ? না—না, তা হতে পারে না!

যমুনা বাড়ি না এসে কোথায় পালাবে কোথায় লুকোবে ? ঘরে পা দিতেই বাবার মুখোমুখি। এত সকালে কেন ডেকেছিল—কি হয়েছে ?

—ভোর রাতে পানুদাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

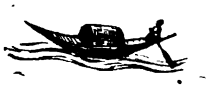
সোনাপিসি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। বাবা আঁতকে উঠল—কেন? পানু কি কোনো পোলিটিক্যাল দলে ভিড়েছিল নাকি ?

—জানি না। যমুনা ঘরে ঢুকে গেছে।

কিন্তু পরদিনের মধ্যে জানতে শ্যামনগরের কারোই বোধহয় বাকি থাকল না। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় পাশাপাশি দুটো ছবি। প্রথমটা ফণী শিকদারের, পরেরটা পূর্ণ ঘোষের। পুরী প্যাসেঞ্জার ডাকাতির প্রধান আসামী আর তার প্রধান সাগরেদের। কাকতালীয়ভাবে ধরা পড়েছে ফণী শিকদার। কোনো গোপন এলাকার এক রূপসী প্রেয়সী বারবনিতার ঘর থেকে ট্রেন ডাকাতির অনেক বমাল সমেত পুলিশ তাকে তুলে এনেছে। তাকে জেরার ফলে সব আসামীদের নাম প্রকাশ হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের শ্যামনগরের বাড়িতে ধরা পড়েছে কেবল একজন—পাণ্ডা ফণী শিকদারের প্রধান সাগরেদ পূর্ণ ঘোষ। বাকি আসামীরা ফেরার। তদন্ত-জেরায় পূর্ণ ঘোষ স্বীকার করেছে, পুরী প্যাসেঞ্জারে ডাকাতি আর খুন ছাড়াও কিছুদিন আগের সোনার দোকান লুঠ এবং পেট্রোল পাম্পের ডাকাতিও তাদের কীর্তি। পুলিশের আশা বাকি আসামীরাও শিগগিরই ধরা পড়বে। এই দুই আসামীর বিরুদ্ধে আদালতে সোনার দোকান, পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি, ষড়যন্ত্র এবং ট্রেন ডাকাতি ও খুনের কেস।

···বাবার মুখ কালিবর্ণ। সোনাপিসি আবোল তাবোল বকে চলেছে. এই ছেলে কতবড় শয়তান, কত ভয়ংকর এ কেবল সে-ই জানত, আর কেউ জানত না—ওই মিষ্টি মুখ দেখে সকলেই ভুলেছে।

দু'দিনের মধ্যে যমুনাদের বাড়িতেও পুলিশ এলো। সার্চ করল যমুনা আর তার বাবাকে অনেক জেরা করল। পাড়ার লোক হকচকিয়ে গেল।



একটা করে দিন যায়। যমুনা নিস্পন্দ পাথর। কাগজ আসে। যমুনা কাগজে চোখ বুলোয়। পুরী প্যাসেঞ্জারে ডাকাতি আর খুনের আরো ছুজন ধরা পড়েছে। বাকি আছে আরো ছুজন। পুলিশ আদালতে কেস চালান করেছে। কেবল একজনই নিজের তরফের কোনো উকিল দেয়নি। সে পূর্ণ ঘোষ। এটা খুনের মামলা, তাই সরকারের তরফ থেকেই তাকে উকিল দেওয়া হয়েছে। ট্রেনে যে লোকটিকে হত্যা করা হয়েছে তার ছবি আর পরিবারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।···স্ত্রী বুড়ো বাবা-মা আর একটি শিশুসন্তানকে নিয়ে ভদ্রলোক পুরী যাচ্ছিল, তার সংসার এখন কানা। রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কোনোরকম সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, রেল কর্তৃপক্ষও কতটা কি করবে এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত, ইত্যাদি।

বাবার ধমক খেয়ে পিসির মুখ বন্ধ হয়েছে। যমুনা নিজেদের বাগানে বা পুকুরঘাটে পর্যন্ত যায় না। মনে হয় চেনাজানা সব লোক তাকে আঙুল দিয়ে দেখায়, কিছু জটলা করে। যমুনার জগৎ শূন্য হয়ে গেছে, সব রং মুছে গেছে। যমুনা নিঃস্ব হয়ে গেছে। বাবা তাকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, এত ভাবিস কেন, মা তো দয়া করেছে, একেবারে সর্বনাশ তো এখনো হয়নি—বিয়েটা হয়ে যাবার পর ওকে এভাবে চেনা গেলে কি হত?

···যমুনা পূজোর ঘরে যায়। মুখ বুঁজে বাবার পূজোর ব্যবস্থা গুছিয়ে দেয়। মায়ের সঙ্গে তার কথাবার্তা বন্ধ। মায়ের দিকে তাকানো বন্ধ। তবু থরথরে চোখ এক-একবার তার দিকে পড়ে না এমন নয়। সেই প্রসন্ন মুখ। সেই হাসি হাসি মুখ। এই মুখে যেন আরো বেশি কৌতুকের ছোঁয়া লেগেছে। ওকে দেখছে আর মজা পাচ্ছে। সেদিন যমুনার অসহ্য লাগল। ঘরের দরজা জানলা খোলা তা-ও খেয়াল থাকল না। পটের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, কেন এভাবে আমাকে ছাখো, কেন এরকম করে হাসো? কি ভাবো তুমি, আবার আমি প্রার্থনা করব—ওর জন্য ভিক্ষে চাইব? যা খুশি করো—যত খুশি প্রায়শ্চিত্ত করাও—আমি আর কখনো কিছু চাইব না—কিছু না—কিছু না।

বাবা আর সোনা পিসি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। যমুনার জ্বলন্ত চোখ মুখের দিকে চেয়ে তারা ঘাবড়ে গেছে।

সেই রাতেই একটা ব্যাপার হল। যমুনা এমন শান্তিব ঘুম অনেক দিন ঘুমোয়নি। ঘুমের মধ্যে দু'বার মায়ের সেই হাসি হাসি মুখখানা স্বপ্নে দেখল। তারপর আরো একবার। এত সুন্দর আর এত দরদ ভরা যে ঘুমের মধ্যেও যমুনার মনে হল তার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে। শেষের বারে মা যেন বলছে, কি বোকা মেয়ে রে তুই, এত কষ্ট পাস কেন, আমার ওপর এত রাগ কবিস কেন, ভালোই তো হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হয়ে ওকে তোর কাছে আসতে হবে না? কিছুই ফুরিয়ে গেল না, সবুর কর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘুম ভেঙে যমুনা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। ঘুমের মধ্যে মা-কি সত্যি এসেছিল? সত্যিই এই কথাগুলো বলে গেল? না কি ওর মন যা চায়, ভিতরটা নিজেরও অজ্ঞাতে যা চায়, স্বপ্নে তাই দেখল? তাই হবে বোধহয়। কিন্তু বুকের ভিতরটা তো এখনো অদ্ভুত ঠাণ্ডা, এখনো কোনো যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই—এমন শান্তি জীবনে আর কি অনুভব করেছে।

খুব সকালে স্নান সেরে পূজোব ঘরে এলো। শয়ান থেকে মায়েব পটখানা তুলে নির্নিমেষে দেখল। দেখতে লাগল। একই রকম। ···কিন্তু মন বলছে ঠিক এক রকম নয়। অনেক প্রসন্ন।

সমস্ত দিনই যমুনার মনে হতে লাগল কিছু ভাবার আছে। কিছু চিন্তা করার আছে। কি ভাবার থাকতে পারে, কি চিন্তা করাব থাকতে পারে?

কখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে শুরু করেছে জানে না। আগের সেই দামাল ছেলে পানুদা, নিজের প্রাণের ভয় ছেড়ে জলে ডোবা থেকে ওকে এই ছেলেই বাঁচিয়েছিল,···তারপর আবার সেই অত্যাচাবী পানুদা··· তারপর ম্যাট্রিক পাশের পর একেবারে আর এক রকমের পানুদা···আই এসসি পরীক্ষার পর নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পায়ের ছুবলোনো জায়গায় মুখ লাগিয়ে সাপের বিষ টেনে নিয়ে শেষে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, পরে খ জোর দিয়ে বলেছিল, তোর পায়ে বিষ ঢুকলে হাজার বার আমি সে-কি

টেনে নেবো—আমি বেঁচে থাকতে তোর গায়ে আমি বিষের ছিটে-ফোঁটাও থাকতে দেব না।···তারপর খেজুর ঝোপের নিরিবিলিতে ওদের দু'জনের নতুন জগৎ 'তুই' থেকে পানুদার 'তুমি'তে আসা।···কাজ শুরু করার পর থেকেই উপার্জনের শুরু থেকেই তার সেই মানসিক যন্ত্রণা, এলোমেলো কথা, উপার্জন যত বেড়েছে ততো যন্ত্রণা ততো অশান্তি। পুলিশে ধরার আগে ভর সন্ধ্যায় বাগানে আসা, সেই উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি, আচরণ, আকৃতি, কথা-বার্তা।···চুক্তির কাজ শেষ, এখন বিশ্রাম, বলেছিল, তার খোদ মুরুব্বি ছাড়া আর সকলেই নিরাপদ বিশ্রামের আশায় এদিক-ওদিকে চলে গেছে, সে-ও চেঞ্জে যাবে, কিন্তু ওদের মতো চেঞ্জে নয়।·· এর একটাই অর্থ দলের পাণ্ডা ফণী শিকদার ধরা পড়েছে খবর পেয়েই অন্য সকলে যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। কেবল এই একজনই ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিজের বাড়িতে অপেক্ষা করেছে। এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। নইলে তার বউদিকে বলত না, তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে, রাতেই হয়তো ওকে নিতে লোক আসবে।

এই সব ভাবনার তন্ময়তায় দুটো দিন কেটেছে। তার পরের দিন সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকে যাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে এসেছে, একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের একজনের নাম নমিতা। তাদের বাড়ি খুব কাছে নয়, কম করে মাইল খানেকের পথ। পড়াশুনার ব্যাপারে যমুনার এ-বাড়িতে কিছু যাতায়াত ছিল। নমিতার বাবা ব্যারাকপুর কোর্টের মোটামুটি নামী উকিল। নমিতার বাবা-মা দুজনেই যমুনাকে চেনেন। এই ঠাণ্ডা মেয়েটাকে দু'জনে পছন্দও করেন। নমিতার বাবা মোটর বাইকে ব্যারাকপুর কোর্টে যাতায়াত করেন।

এত সকালে ভদ্রলোক একলাই সেরেস্তায় বসে ছিলেন। যমুনা এটাই আশা করেছিল। ওকে দেখে ভদ্রলোক একটু অবাক আবার বিব্রতও। পূর্ণ ঘোষ অর্থাৎ পানু ঘোষের নাম এখন শ্যামনগরে না জানে কে? তাছাড়া ওই ছেলেকে নিজেও চিনত। আর ওই ডাকাতির ব্যাপারে এই মেয়ের বাড়িতেও পুলিশ এসেছে সার্চ করেছে জেরা করেছে এও তাঁর

জানতে বাকি নেই। কিন্তু এই ঠাণ্ডা মুখের দিকে চেয়ে কেমন মায়াই হল। জিজ্ঞেস করলেন, কি মা, এত সকালে যে? নমি তো ঘুমোচ্ছে—

—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

—ও···বোসো। বলো ···

যমুনা বসল না। জিজ্ঞেস করল, খুনের আসামীর সঙ্গে কোনরকমে দেখা করা আর কথা বলা সম্ভব?

ভদ্রলোক থমকে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর জবাব দিলেন, সম্ভব ···কিন্তু তুমি তো তার কোনো আত্মীয় নও, কি পরিচয় দিয়ে দেখা করার অনুমতি চাইবে?

—আমি তার ভাবী স্ত্রী হিসেবে দেখা করতে চাই।

এই স্পষ্ট জবাব শুনে ভদ্রলোক আবার থমকালেন।—তুমি তার উকিলকে চেনো?

—চিনি না, কাগজে নাম দেখেছি—কলকাতায় গিয়ে চিনে নিতে পারি।

—ডিফেন্সের প্রয়োজনে তোমার দেখা করা দরকার জানিয়ে তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।···পানু ঘোষ নিজে কোনো উকিল দেয়নি কাগজে পড়েছি, সরকারের প্যানেলের উকিল তার হয়ে দাঁড়াবে—তাঁর পক্ষে এটা আরো সহজ হবে। ফোন গাইড দেখে সেই উকিলের চেম্বারের ঠিকানা লিখে দিলেন।

বাবা শুনে রেগেই গেল।—কেন, তুই তার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে যাবি কেন, তার সঙ্গে আর আমাদের কি সম্পর্ক?

একটু চুপ করে থেকে যমুনা বলল, তোমার কষ্ট হলে আমি একলাই যাব, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না।

বাবা আরো রেগে গেল।—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল, একলা কলকাতা গিয়ে তুই তার উকিলকে খুঁজে বার করবি! এমনিতেই ও-ছেলের জন্য আমরা বে-ইজ্জত হয়েছি নাকাল হয়েছি, এখন কঠিন সাজার অপেক্ষা—এর মধ্যে তুই যাবি কেন?

ঠাণ্ডা দু'চোখ তুলে যমুনা চেয়ে রইলো একটু। খুব স্পষ্ট অথচ শান্ত গলায় বলল, মায়ের ইচ্ছে তাই যাব।

বাবা হকচকিয়ে গেল। নিজের এই মেয়েকেও যেন নতুন দেখছে।—মায়ের ইচ্ছে!···কার মায়ের?

—এ বাড়িতে সকলেরই তো একজনই মা।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বাবা কি দেখল বা কি বুঝল সেই জানে। আর বাধা দিল না। সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। যাবার আগে যমুনা মায়ের পটের সামনে বসল। খানিক চোখ বুজে থেকে আবার তাকালো। খুব অস্ফুট স্বরে বলল, বাবাকে আমি মিথ্যে বলিনি মা, তোমার ইচ্ছে বুঝেই যাচ্ছি।

চেম্বারে উকিলের দেখা পেল। বয়স্ক আর বেশ ভালো মানুষই মনে হল যমুনার। বাবাকে অন্য ঘরে বসিয়ে যমুনা একলাই তাঁর সঙ্গে কথা বলল, তাঁর কাছেও নিজেকে পূর্ণ ঘোষের ভাবী স্ত্রী বলেই পরিচয় দিল। ভদ্রলোক সাগ্রহেই আসামী সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে চাইলেন, কারণ সে তাঁর সঙ্গে সে-রকম কো-অপারেট করছে না। তার লেখাপড়া, চাকরির চেষ্টা, স্বভাবচরিত্র ইত্যাদির সম্পর্কে নিজেই খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন। সব বলার পর যমুনার একটাই আর্জি, পূর্ণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করা এবং কথা বলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে—এটুকুর ওপর ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

কথা বলে আর এই মুখের দিকে চেয়ে ভদ্রলোকও অভিভূত একটু। ইতস্ততঃ করে বললেন, তোমার উদ্বেগ বুঝতে পারছি ··কিন্তু কঠিন শাস্তি তো সে এড়াতে পারবে না, নিজেই পুলিশের কাছে দোষ কবুল করেছে।

—তবু তার মুখ থেকে আমার কিছু জানা দরকার, শোনা দরকার—আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবস্থা হল। অ্যাডভোকেটেরও আগ্রহের আরো কারণ, তার আশা, এই মেয়েকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করাতে পারলে বিচারকের মন কিছু নরম হতে পারে।

পানু ঘোষকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে। সেখানেই

দেখা হল। একটা খুপরির গরাদের ও ধারে সে, এ ধারে যমুনা। খানিক দূরে প্রহরা-রত পুলিশ।

…যমুনা যা ভেবেছিল তা নয়। সেই উদ্ভ্রান্ত দিশেহারা মূর্তি নয়। বরং খুব স্থির, খুব শান্ত। ওকে দেখার প্রথম আবেগটুকু অবশ্য সংযত করতে পারল না। বলে উঠল, যমুনা তুমি এখানে কেন—এই মুখ আর দেখতে এলে কেন? তোমার কাছ থেকে তোমাদের সকলের কাছ থেকে শুধু ঘৃণা ছাড়া আমাব আর কিছু পাওনা নেই—আমার কথা ভেবে কেন তুমি এখনো কষ্ট পাচ্ছ! তুমি যাও, এ-মুখ আর দেখতে এসো না!

যমুনা স্থিব চেয়ে আছে। দেখছে। বলল, দেখতে আসব কিনা সেটা বোঝার জন্যই এসেছি…আমার কয়েকটা কথাব জবাব দাও।

পানু থমকালো।—বলো।

—ট্রেন ডাকাতির সময় ওই খুন কে করেছে—তুমি?

—না, ফণী…ভদ্রলোক বাধা দিতে চেষ্টা করতেই সোজা কপালে গুলি করে বসল…কিন্তু এ জেনে কি লাভ, দলে যখন ছিলাম সকলেই খুনী।

একটু চুপ করে থেকে যমুনা আবার জিজ্ঞেস করল, এর আগে যে-সব ডাকাতি হয়েছে তাতে তুমি ক'জনকে খুন জখম করেছ?

—বলে কি হবে, তুমি বিশ্বাস করবে?

—করব।

—এক জনকেও না। কারো গায়ে আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি।…ফণী সর্বদাই বলত, শতেকে পঁচানব্বুই জনেরও বেশি কি যে ভীতু তুই জানিস না—এইটেই আমাদের আসল পুঁজি—রিভলবার আর ছোরা উঁচিয়ে ধরলেই আর ত্ু'চারটে বোমা ফাটালেই কাজ হয়ে যায়—আর কিছুই করতে হয় না।…সত্যিই এর আগে কারো গায়ে আঁচড় কাটারও দরকার হয়নি। আবেগের মুখ খুলে যেতে পানু আরো বলে গেল, ফণী আরো বলেছিল দয়ামায়া নেই এমন বড়লোক ছাড়া তারা অন্য কাবো ক্ষতি করে না—কিন্তু পবে দেখেছি টাকার গন্ধ পেলেই ও পাগল হয়ে যায়।…ওই ট্রেন ডাকাতিতে খুব একটা বড়লোক কেউ ছিল কিনা জানি না, ও মিথ্যে

করে বলেছিল আছে।…আর, যারা ছিল তারাও কেউ দয়ামায়া-শূন্য বড়লোক নয়, ফণীর মতো আমাদের মতো নিষ্ঠুর মানুষ আর হয় না— হয়—না যমুনা, এই নরকের মধ্যে তুমি আর এসো না—তুমি যাও!

যমুনা অপলক চেয়ে আছে।—সেই সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে যখন বাগানে এলে, তুমি জানতে পুলিশ তোমাকে ধরতে আসছে?

—জানতাম।…ফণী ধরা পড়েছে খবর দিয়ে দলের লোক যে যেখানে পারে পালিয়েছিল…ফণীকে নিয়ে আমাদের দলে ছ'জন ছিল…

—সকলে পালিয়েছিল তুমি পালাওনি কেন?

পানু ঘোষের আর্তমুখ।—এ-সব শুনে কি হবে যমুনা?

—বলো।

—ট্রেনে ওই ভদ্রলোককে ফণী গুলি করতেই ভদ্রলোকের ছোট্ট মেয়ের আর স্ত্রীর যে-মুখ দেখেছিলাম তা আর ভোলার নয়—সেই মুহূর্তে দাদা দেহ নিয়ে আসার পর রাণু স্মুমু আর বউদির মুখ আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এদের এই মুখ তাদের থেকেও কত বেশি ভয়ার্ত আর স্তম্ভিত সে আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাই ফণী ধরা পড়েছিল শুনে আমার উৎকট আনন্দ হয়েছিল।…হ্যাঁ, পালানোর কথা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার ভিতরের কেউ পালাতে দেয়নি। কেবলই মনে হয়েছে, ধরা না দিলে এত কালি মুছবে কি করে—আর মনে হয়েছিল এত পাপ গোপন করে জীবনে আর আমি তোমার নাগাল পাব কি করে —তাহলে ধরা দেব না কেন?

যমুনা যেমনি স্থির, তেমনি নিষ্পলক।—তাই ধরা দিলে?

চোখের জল সামলে পানু ঘোষ মাথা নাড়ল। তাই ধরা দিল।

কয়েক পলকের জন্য যমুনা ছ'চোখ বুজে ফেলল। তারপর তাকালো। তারপর বলল, যে-বিচারই হোক, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে মাথা পেতে নেবে… আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

পানু ঘোষ হাসল।—হ্যাঁ ফাঁসি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ফাঁসি হবে না।

—তোমাকে কে বলল, আমার উকিল?

চোখে চোখ, যমুনা আরো ঠাণ্ডা।—না।···মা। মা কালী।

এর পর দীর্ঘ বিচার পর্ব। এ-পর্ব কাহিনীর অঙ্গ নয়, ধরাবাঁধা নিয়মের পর্ব।

···বিচারে সব আসামীরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।

যমুনা প্রতিদিন বিচারের পর্বে যা করেছে এই দিনও তাই করল। দূরে বসে পানু ঘোষকে দু'চোখে কেবল আশ্বাস দিয়েছে, ভয় পেও না মাথা পেতে নাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক এত দিনে যমুনার ওপর আরো সদয়। কোর্টেই তার কাছে এসে বলল, কিছুই করতে পারলাম না মা···।

যমুনা শান্ত মুখে বলল, আপনি অনেক করেছেন। জিগ্যেস করল, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে কি মৃত্যু পর্যন্ত ?

—না না মানেটা অবশ্য তাই—কিন্তু বড় জোর কুড়ি বছর—জেল কনডাক্ট ভালো থাকলে তা-ও কারো থাকতে হয় না, পনেরো ষোল বছরের মধ্যেও ছাড়া পেয়ে যায়।

যমুনা তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। বলেছে, আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

বছরের পর বছর গঙ্গার ওপর দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেল। প্রতিটি দিনের ছবি যমুনার চোখের ওপর দিয়ে পার হয়ে যেতে লাগল। ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে প্রথমে সে টাইপিং শিখল আর প্রাইভেটে আই এ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। যে স্কুলে পড়ত সেই স্কুলেই খুব সহজে টাইপিস্টের চাকরি পেল। প্রাইভেটে আই এ পাশ করল, ডিস্টিংশনে বি এ পাশ করল, তিন বছর বাদে প্রাইভেটে এম-এও পাশ করল। তার ওই স্কুলই ওকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে বহাল করল। এম-এ পড়ার সময় সোনা পিসি মারা গেল, আর আরো তিন বছর পরে বি-টি পড়ার সময় বাবা। বাবার মৃত্যুতে যমুনার বুকের ভেতরটা কতটা খেয়ে গেল কেউ বোঝেনি। ঠাণ্ডা মুখে সকলে তাকে কর্তব্য পালন

করতে দেখেছে। বাবা চলে যাবার পর কাজিতলা থেকে নিমুদার বউ আর রাণু স্বমুকে নিজের বাড়িতে তুলে এনেছে। বউদি একবারও আপত্তি করেনি। এ রকম একটা বোঝাপড়া যেন তাদের মধ্যে হয়েই ছিল। কাজিতলার বাড়িতে দেখেশুনে ভাড়াটে বসানো হয়েছে। এই ব্যবস্থাও যমুনাই করেছে।

…এ দিকে সেই পঞ্চাশ সাল থেকে হাজারো সমস্যা আর ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও পশ্চিম বাংলার রূপ রেখা বদলাচ্ছে। রূপকার মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়। ময়ূরাক্ষী প্রোজেক্ট হল, বাহান্নর সাধারণ নির্বাচনের পর ফারাক্কা ব্যারাজ আর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা হল, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকুইজিশন বিলেব ধাক্কায় জমিদারি প্রথার কাল গেল। কিন্তু সবটাই তা বলে শান্তির চিত্র নয়। তিপ্পান্ন সালে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানোর যুদ্ধে কলকাতায় আবাব রক্ত গঙ্গা বইলো, আগুন জ্বলল। সেই বছরই পশ্চিম বাংলার আর এক যোদ্ধা শ্যামাপ্রসাদ চোখ বুজলেন। অনেক অশান্তি আর দুর্যোগেব মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের বেকাব সমস্যা সমাধানের বিরাট পবিকল্পনার পদক্ষেপ। তিন হাজার শিক্ষক আর সমাজ কর্মী নিয়োগ, গৃহনির্মাণ, নতুন কুটিব শিল্প আর দুর্গাপুরে কোক কয়লার গ্যাস কারখানা স্থাপন লক্ষ্য। পবের পদক্ষেপে একে একে হবিণ-ঘাটা, চিত্তবঞ্জন লোকোমোটিভ, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট-এর জন্ম। ছাপ্পান্নয় বিধান রায়ের আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনায় দু'লক্ষ লোকের ঘরবাড়ি গড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। সাতান্নর কলকাতায় ইলেকট্রিক ট্রেনের উদ্বোধন।

মুখে নয়, যমুনা নিজের মনে বলেছে তুমি ক'টা বছর সবুর সইতে পারলে না, ধরেই নিলে নিজের দু'পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ আর পাবে না। হতাশা কতবড় শত্রু এ যেন তুমি জীবনে আর ভুলো না।

অশান্তি আর সংঘাত আর তাণ্ডবের চিত্র এর পরেও অবশ্যই কম ভয়াবহ নয়। ঊনষাট সালের মূল্যবৃদ্ধি আর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির গণ-আন্দোলনের পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত সমাজবিরোধীদের হাতে চলে যেতে দেখল যমুনা। শুধু কাগজ পড়ে ওর মতো চোখে দেখার অনুভব যন্ত্রণা আর ক'জনের। যমুনা পড়তে চায় না জানতে চায় না, আবার না পড়ে না

জেনেও পারে না।···একের পর এক থানা আক্রমণ লুঠতরাজ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি আক্রমণ আগুন গুলি মৃত্যু। যমুনার নির্বাক প্রার্থনা শান্তি হোক শান্তি হোক শান্তি হোক।

একষট্টির জানুয়ারিতে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী, দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্বামী ডিউক অফ এডিনবরাকে নিয়ে কলকাতা সফর করে গেলেন। উচ্ছ্বাসের ঢেউ শ্যামনগরেও কম আছড়ে পড়ল না। যমুনা নিরুৎসুক নির্লিপ্ত। বাষট্টির পয়লা জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের জন্ম দিনেই তাঁর মৃত্যুদিন ঘনিয়ে এলো। দেশের মানুষ শোকে ভেসে গেল। যমুনার নির্বাক শোক কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এলো। এই নির্বাক যোদ্ধার প্রতি তার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। সে বছরেই ভারতের আকাশে আবার যুদ্ধের মেঘ। নেফা ফ্রণ্টে চায়নার বিপুল হিংস্র আক্রমণে দেশ সচকিত। তেষট্টির শেষের দিকে কলকাতার সমস্ত রেশনিং ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ার দাখিল। চালের দাম হু হু করে বেড়ে সাত চল্লিশ টাকা মণে উঠে গেল। অন্য জিনিসপত্রের দামও আগুন। কাগজে কলকাতার দমদম দাওয়াইয়ের ফিরিস্তি। বউদি মানে নিমুদার বউ-র হাতে সংসারের দায়িত্ব—সে চিন্তিত। যমুনা নির্লিপ্ত, ভেবো না, চলে যাবে।

বাড়িতে খাওয়ার মুখ একটি কমেছে। নিমুদার বড় মেয়ে রাণুর দু'বছর আগে ভালো বিয়ে হয়ে গেছে। সুশ্রী মেয়ে, বি এ পাশ করেছিল। ছেলে নিজের পছন্দে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। তাদের দাবি ছিল না। কিন্তু ওই বিয়ে দিতে গিয়ে বউদির শেষ পুঁজি ঝাঁঝরা আর যমুনারও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে মোটা ধার। কিন্তু সেজন্য তার কোনো উদ্বেগ নেই। সুমুকে প্রায় সুন্দরীই বলা চলে। বি এ পড়ছে। যমুনাকে শুধু ভালোবাসে বললে কিছুই বলা হবে না—ও যেন সমস্ত সুখে দুঃখে তার ছায়া। এই মেয়ের বিয়ে নিয়েও বউদির এখন দুশ্চিন্তা। তাই দেখে সুমু রাগ করে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে।—কাকিমাকে দেখে তোমার চিন্তা করতে লজ্জা করে না।

রাণু সুমু যমুনাকে কাকিমাই বলে। সেই ছেলেবেলায় মাসি বলত। পরে—ওদের মা—কাকিমা বলতে শিখিয়েছে। যমুনার তাতে আপত্তি করার কি আছে। না, সুমুর বিয়ের জন্য তার কোনো চিন্তা নেই। রাণুর

বেলায়ও ছিল না। ওর মন সবেতে বলে ঠিক আছে। কোনো ব্যাপারে মনে সংশয় এলে পুজোর ঘরে চলে আসে। পটের দিকে চেয়ে বলে, ঠিক আছে তো মা? দেখো—

চৌষট্টি সাল। যমুনা মনে মনে একটা হিসেবের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে।...চৌদ্দ বছর হয়ে গেল। সময় হয়নি। আরো একটা বছর পার করতে হবে। সেই গোড়া থেকে কে ওর মনে পনেরো বছরের ওপর আঙুল ফেলেছে জানে না। তাই ধরে বসে আছে।...কলকাতায় তখন আবার সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ। খুন লুঠ কারফিউ সৈন্য নামানো। মে মাসে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের শেষ নিঃশ্বাস। নতুন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

তারপর এই পঁয়ষট্টি সাল।

ভারতের রাজনীতির আসর আবার তোলপাড় হয়ে সবে থিতিয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী বিগত। তাঁর জায়গায় আবির্ভাব ইন্দিরা গান্ধীর। এতগুলো বছর যমুনার চোখের সামনে দিয়ে সব কিছু নিয়ে একটা নির্বাক তথ্যচিত্রের মতো পার হয়ে গেছে। এবারে যমুনার দেহে মনে সাড়া জেগেছে। পনেরোটা বছর কেটে গেছে।...সময় হয়েছে। পনেরোটা বছর যে-দিন পার হল, রাতের নিরিবিলিতে পুজোর ঘরে এসে বসল। বসবে বলেই মাকে এখনো শয়ান দেয় নি।

মায়ের পট তার সামনে, মুখোমুখি। অস্ফুট স্বরে বলল, সময় হয়েছে তো মা?...বলো, সময় হয়েছে?

অপলক চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে নিজের ভিতর থেকে সাড়া পেল। হ্যাঁ...সময় হয়েছে।

মহিলা বিদায় নিতে জুডিসিয়াল ডেপুটি সেক্রেটারি মুখার্জি সাহেব বিরক্ত মুখে নতুন ফাইল টেনে নিলেন।

রাগ আর ক্ষোভ ছেপে যে আধ-বয়সী মুসলমান মহিলাটি চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল, তার এখনো যা রূপ, বয়েসকালে সে ডাকসাইটে রূপসী ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার স্বামী সশ্রম কারা-

দণ্ডের আসামী। পাঁচ বছর পার হয়েছে, আরো দু'বছর বাকি। মহিলা এসেছিল এই দু'বছর মকুবের আবেদন নিয়ে। এটা আইনের রীতি। মারসি পিটিশন পেলে জেলের আসামীদের কেস রিভিউ হয়। জেল কনডাক্ট ভালো থাকলে এই বিভাগের বিবেচনায় শাস্তির মিয়াদ কমানোর সুপারিশ করা যেতে পারে। ডেপুটি সেক্রেটারি সেই বিবেচনার কেস পাঠালে তার-পর জয়েণ্ট সেক্রেটারি, সেক্রেটারি, আইনমন্ত্রী এবং শেষে রাজ্যপালের অনুমোদন পেলে আসামী নির্দিষ্ট কালের আগেই ছাড়া পেতে পারে।

কিন্তু প্রথম ধাপে যিনি, সেই ডেপুটি সেক্রেটারি রাশভারী মুখার্জি সাহেব কড়া মানুষ। আসামীর অপরাধের গুরুত্বই তাঁর প্রধান বিবেচনার বিষয়। অপরাধ গুরুতর হলে নিজেই তিনি নাকচ করে দেন। এ ব্যাপারে তাঁর মায়া-দয়া নেই।···কিছুদিন আগে ছে-চল্লিশের দাঙ্গায় নিহত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষের হত্যাকারীর কেস রিভিউয়ের জন্য এসেছিল। তার মুসলমান দরোয়ান তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সেই হত্যার দৃশ্য বয়েসকালে কল্পনায় দেখেছিলেন মুখার্জি সাহেব। যাবজ্জীবন কারা-দণ্ডের এই আসামীর জন্য সুপারিশ করার বদলে কঠোর আপত্তিকর নোট দিয়েছিলেন। জেলে থেকে থেকে লোকটা শেষে পাগলই হয়ে গেল বলে কেউ কেউ মুখার্জি সাহেবের সমালোচনা করেছিল। মুখার্জি সাহেব ভ্রূক্ষেপও করেননি।

···এই মুসলমান মহিলাও পদস্থ একজনের সুপারিশের জোরে তাঁর কাছে এসেছিল। এই কেসও স্পষ্ট মনে আছে মুখার্জি সাহেবের। গুলসম রেপ কেস। নামকরা খানদানী ঘরের মুসলমানের বেগম এই মহিলা, স্বামীকে খুব ভালবাসে, কিন্তু স্বামীর শয্যায় সংসর্গ-বিমুখ। ওদিকে স্বামীটি বিপরীত, নারী মাংসলোলুপ। বেগম দশ বছরের বাঁদী একটা সুশ্রী মেয়েকে পাঠাতো স্বামীর ক্ষুধা মেটাবার জন্য। মেয়েটা যেতে না চাইলে তাকে মেরে গায়ে গরম ইস্তিরির ছেঁকা দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠাতো। দিনের পর দিন দশ বছরের মেয়ে গুলসমের ওপর ওই নির্দয় স্বামী পাশবিক অত্যাচার করত। আদালতের বিচারে তার সাত বছর সশ্রম জেল হয়েছে। পাঁচ বছরের মাথায় তার বেগম এসেছে মুক্তির আবেদন নিয়ে। তাকে ক্ষুব্ধ এবং

হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে।

ফাইলে মন দেবার আগেই বেয়ারা আর একটা স্লিপ নিয়ে টেবিলে রাখল। মুখার্জি সাহেব দেখলেন। সুমনা ঘোষ, ছাত্রী—কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। হুকুম করলেন, নিয়ে এসো—

বেয়ারা তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। মুখার্জি সাহেব দেখলেন। বেশ সুন্দর দেখতে একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে, খুব সাদাসিধে বেশ। এমন চেহারার মেয়েরা সাধারণত আর একটু বেশিই সাজগোজ করে থাকে।

—বসুন।

মেয়েটির করুণ মুখ, করুণ চাউনি। টেবিলের পাশ দিয়ে তাব চেয়ারের দিকে এগিয়ে এসে নত হল। উদ্দেশ্য পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে।

মুখার্জি সাহেব ব্যস্ত হয়ে চেয়ার একটু সরিয়ে নিলেন। বললেন, এখানে এসে প্রণাম-টনাম করার রীতি নেই—ওই চেয়ারে বসুন, তারপর বলুন কি চাই।

মুখ দেখেই বুঝেছে বিশেষ কোনো প্রার্থনা নিয়ে এসেছে। তাই অল্প-বয়সী মেয়েকেও 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' করে বললেন না।

সুমনা ঘোষ বসল। চোখ তুলে তাকালো। দুই ঠোঁট কিছু বলার চেষ্টায় কেঁপে উঠল। সেই আবেগের মুখেই ঝপ করে বলে বসল, আমাব কাকাকে এবারে দয়া করে ছেড়ে দিন, তার পনেরো বছব জেল খাটা হয়ে গেছে।

মুখার্জি সাহেব অবাক। এই মুখ দেখে মায়া হওয়াও স্বাভাবিক।—কে কাকা?

—পূর্ণ ঘোষ…।

মুখার্জি সাহেবের নাম শুনে কিছু স্মরণ হল না।—কোন্ কেসের জন্য পনেরো বছর জেল খাটছেন?

—পুরী এক্সপ্রেস ডাকাতি আর খুনের মামলায়…।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠল। স্ত্রীর সামনে শিশুসন্তানের সামনে বৃদ্ধ মা-বাবার সামনে ট্রেনে সেই হত্যাকাণ্ডের

আসামী। রুক্ষ গলায় জবাব দিলেন, আই অ্যাম সরি, আমার দ্বার কিছু করা সম্ভব নয়—ইউ মে গো।

মেয়েটি আকুল গলায় বলে উঠল, আমরা পনেরো বছর ধরে এই আশায় দিন গুনছি স্যার, আপনি দয়া করুন, কাকা এখনো ছাড়া না পেলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে—

—সেটা জেলে কাকার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলা ভালো আর এক পরিবারের সর্বনাশ করার এই ফলের জন্য দায়ী কে—নাউ প্লিজ···আই অ্যাম বিজি।

সুমনা ঘোষ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আঁচলে মুখ চেপে কাঁদতে কাঁদতেই চলে গেল।

এম-এ পড়া এই সুশ্রী সাদাসিধে মেয়েটার করুণ মুখ আর কান্না দেখে মুখার্জি সাহেবেব মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফলে ওই অদেখা আসামীর ওপর আরো ক্রুদ্ধ আরো বিরূপ তিনি।

সুমুর গায়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে যমুনা বলল, তোর এখন এত কান্নার কি হল, তোকে বললাম অফিসে গিয়ে মারসি পিটিশন কার কাছে কিভাবে করতে হবে, কার সঙ্গে দেখা করতে হবে—এ-সব জেনে আসতে —আর তুই সর্দারি করে একেবারে অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলি কেন?

ভুল স্বীকার করেও সুমু রাগে আর দুঃখে গজগজ করে বলল, অফিসের লোকেদের কথাতেই তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম—তারা বলল, মুখার্জি সাহেব সুপারিশ না করলে রিভিউ বা মারসি পিটিশন করে কোনো লাভই হবে না, কলমের এক খোঁচায় নাকচ করে দেবেন—এক-জন নয়, দু'তিন জন বলল, মুখার্জি সাহেব খুব ভালো লোক, বাইরে কড়া হলেও ভেতরটা নরম—পিটিশন দেবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অ্যাপীল করে যান, তিনি সদয় হলে চেষ্টা করা সহজ হবে—তাই তো সাহস করে চলে গেলাম—মাঝখানে থেকে আমি এ-রকম ক্ষতি করে

বসলাম কাকিমা !

—তুই কোনো ক্ষতি করিস নি, তিনি সদয় হবেন—তাঁর অফিসের লোক তাঁকে খুব ভালো লোক বলেছে ?

—বললে কি হবে, গিয়ে তো দেখলাম, একটুও দয়ামায়া নেই !

যমুনা জোর দিয়ে বলল, দয়ামায়া কারো না কারো থাকতেই হবে—তুই মনখারাপ করিস না।

দিন পাঁচেক পরে।

সুমুকে নিয়ে যমুনা বেলা তিনটের পর মুখার্জি সাহেবের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। সুমুকে বলল, আমার নামে স্লিপ পাঠা।

সুমু লিখল, যমুনা বিশ্বাস, এম-এ বি-টি। শিক্ষয়িত্রী।

আধ মিনিটের মধ্যেই ভিতরে যাবার হুকুম পেল। অপরিচিত মহিলার সঙ্গে সুমনা ঘোষকে দেখেই মুখার্জি সাহেব বিরক্ত এবং গম্ভীর। ধরেই নিল, এই শিক্ষয়িত্রী মহিলা কারো সুপারিশ সংগ্রহ করে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে। তাদের বিনীত নমস্কারের জবাবে মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না। – বসুন।

দু'জনে দুটো চেয়ারে বসল। শিক্ষয়িত্রীর মুখে চোখে পড়ার মতোই একটু কমনীয় ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করলেন মুখার্জি সাহেব।

সুমনা ঘোষই আবেগে কাঁপা গলায় বলল, ইনি আমার কাকিমা··কাকার ছাড়া পাবার আশায় পনেরো বছর ধরে অপেক্ষা করছেন, আপনি দয়া না করলেই নয় স্যার—

—সুমু ! মহিলার খুব কোমল অথচ স্পষ্ট বাধাটুকু কানে এলো মুখার্জি সাহেবেরও।

কিন্তু যেটুকু শুনেছেন তাতেই অবাক। স্লিপটার দিকে আবার তাকালেন। তারপর মহিলার কপাল আর সিঁথির দিকে। বললেন—ঠিক বুঝলাম না, স্লিপে তো নাম দেখছি যমুনা বিশ্বাস !

কাকিমার মুখে বিড়ম্বনার আভাস দেখে চাপা ধমক খাওয়া সত্ত্বেও সুমনাই আবার জবাব দিল, বিয়ের আগেই ওই সর্বনাশ হয়ে গেল···কাকা

ছাড়া পেলেই বিয়ে হবে···মাকে নিয়ে আমি এই কাকিমার কাছেই থাকি স্যার।

মুখার্জি সাহেবের ছ'চোখ আবার যমুনা বিশ্বাসের মুখের ওপর।·· বছর তেত্রিশ চৌতিরিশ হবে বয়েস ···সুঠাম স্বাস্থ্য, বড় বড় ছটো ঠাণ্ডা চোখ, মুখে ভারি মিষ্টি ব্যক্তিত্ব, এম-এ বি-টি শিক্ষয়িত্রী—এমন কোনো মহিলা রেল ডাকাতি আর খুনের আসামীর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে এ কি চোখের সামনে দেখলে বা কানে শুনলেও বিশ্বাস করার মতো! মন খারাপ হলেও কর্তব্য বড়। বললেন, আমি খুব ছঃখিত এ-রকম ক্রাইমে পনেরো বছর খুব যথেষ্ট নয়, আপনাদের আরো কিছু বছর অপেক্ষা করতে হবে।

—আমার অপেক্ষা করার সময় ফুরিয়েছে এই নির্দেশ পেয়েই আমি এসেছি···। যমুনার মুখ দিয়ে কথাগুলো যেন আপনিই বেরিয়ে এলো।

মুখার্জি সাহেবের ভুরুর মধ্যে ভাঁজ পড়ল একটু।—আপনি কার কাছ থেকে কি নির্দেশ পেয়ে এখানে এসেছেন?

কমনীয় ব্যক্তিত্বের ওপর আবার বিড়ম্বনার ছায়া। সামলে নিয়ে বলল, ক্ষমা করবেন, এ-রকম বলা আমার উচিত হয়নি···এটা কোনো মানুষের নির্দেশ নয়।

শুনে মুখার্জি সাহেবকে একটু থমকাতে হল। তারপর বললেন, আমার কিছু করার নেই আমি আগের দিনই বলে দিয়েছিলাম।

—কেন করার নেই দয়া করে বলবেন?

মুখার্জি সাহেব গম্ভীর।—আমি চেষ্টা করলেও আমার ওপরে যাঁরা আছেন, তাঁরা নাকচ করে দেবেন। এ-রকম ম্যাগনিচ্যুডের ক্রাইমে পনেরো বছরে রেমিশন হয় না, ছাড়া পাওয়া যায় না।

যমুনার বড় বড় ছটো চোখ তার মুখের ওপর অপলক কয়েক মুহূর্ত। কথাগুলো আরো বিনীত। বলল, আমার অপরাধ নেবেন না।···জাতির জনক গান্ধী হত্যার অপরাধ কি এর থেকে কম কিছু? নাথুরাম গডসের ফাঁসি হয়েছে, কিন্তু ওই হত্যা আর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত গোপাল বিনায়ক গডসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মকুব হয়ে পনেরো বছরের মধ্যেই ছাড়া

পেয়েছে। সরকার তাকেও সুস্থ সামাজিক জীবন-যাপনের পক্ষে বিপজ্জনক ভাবেনি।

মুখার্জি সাহেবকে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসতে হয়েছে। জীবনে অনেক রকমের আবেদনের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে···কিন্তু এ-রকম কি হয়েছে! যা শুনলেন তা আদৌ মিথ্যে নয়, এর ছাপা নথিপত্রের নকল তাঁর দপ্তরেই আছে। তবু গাম্ভীর্যে ফাটল ধরল না বরং আরো এঁটে বসল। জিজ্ঞেস করলেন, এই যুক্তি কি আপনাকে কোনো অ্যাডভোকেট শিখিয়ে দিয়েছেন?

জবাবে মুখের কমনীয় মাধুর্য স্পষ্টই আহত একটু। যমুনা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। না, এই পনেরো বছর ধরে খবরের কাগজই আমার অবসর সময়ের সম্বল। আমি কারো দ্বারস্থ না হয়ে সোজা আপনার কাছেই এসেছি। আঁচলের তলা থেকে একটা লম্বাটে খাম বার করে তাঁর সামনে রাখল।——আপনি আপনার সময়মতো অনুগ্রহ করে এর ভিতরের লেখাটুকু পড়ে দেখবেন···তিন-চার দিন পরে এসে জেনে যাব আমি দয়া পেতে পারি কিনা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। মুখার্জি সাহেব নিজের অগোচরে চেয়ে রইলেন। যেন নারীর শাশ্বত সংহত কোনো মহিমা দেখছেন। পাশের মেয়েটিব দিকে চোখ গেল। সুমনার দু'চোখে ধারা নেমেছে।

নমস্কার করে চলে গেল। মুখার্জি সাহেব তক্ষুনি খামটা খুললেন। চার পাতা জোড়া পরিচ্ছন্ন মুক্তাক্ষর। পড়তে শুরু করে দিলেন।

···বিয়াল্লিশ সালে গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুড়ি-একুশ বছরের দাদার মৃত্যু থেকে শুরু। তারপর স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের সংসারের ছোট্ট চিত্র। তারপর ছেলেবেলা থেকে আর এক ছেলের সঙ্গে তার জীবনের যোগের কথা। সে ছেলের নিজের জীবন বিপন্ন করে ওকে জলে ডুবে মরা থেকে বাঁচানো। যমুনাকে বিষাক্ত সাপে কাটা আর মুখ দিয়ে বিষ টেনে নিয়ে ওই ছেলের জ্ঞান হারানোর কথা। সেই প্রসঙ্গে ডাক্তারদের অভিমত। ছোট দুটি ভাইঝির প্রতি অপার স্নেহ ভালবাসা। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় একমাত্র চাকুরে দাদার বীভৎস মৃত্যু, সেই দুই ভাইঝি

আর ভ্রাতৃ-বধূকে নিয়ে তার অনাথ হবার চিত্র, তা সত্ত্বেও টিউশনি করে ডিস্টিংশনে বি-এসসি পাস করা—তারপরের দুটো বছরের সেই অক্লান্ত জীবন-যুদ্ধ আর হতাশা। বাল্যবন্ধুর ডাকাতের দলে ভিড়ে ক্রমে তার মানসিক ভারসাম্য খোয়ানোর প্রসঙ্গ, সবশেষে ওই ট্রেন-ডাকাতির পরে দলের প্রধান ধরা পড়ার খবর পেয়েও আর সকলের মতো না পালিয়ে ধরা দেবার জন্য বাড়িতে বসে অপেক্ষা করার সেই সন্ধ্যা আর রাত্রের চিত্র—শাস্তির আগুনে জীবনের অভিশাপ মুছে ফেলার সংকল্প।

…মুখার্জি সাহেব তাঁর কর্মজীবনে এমন অভিভূত আর কখনো হন নি। গোছানো লেখাটুকুতে যমুনা বিশ্বাস নিজের বুকভাঙা যন্ত্রণার কথা বলতে গেলে কিছুই লেখেনি। কিন্তু এ-লেখার ছত্রে ছত্রে তিনি সে যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। এ-জন্যই তিনি এত অভিভূত।

পরদিন অফিসে এসে তিনি জেলখানা থেকে পূর্ণ ঘোষের পনেরো বছরের জেল-কনডাক্টের ফাইল চেয়ে পাঠালেন। যা আশা করেছিলেন আর মনে মনে চেয়েছিলেন তাই। ডেসক্রিপটিভ ফাইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও নেই, উল্টে প্রশংসাই আছে।

এরপর চুপচাপ দুটো দিন তিনিই যমুনা বিশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করলেন।

চার দিন বাদে সুমু—সুমনাকে নিয়ে যমুনা বিশ্বাস এলো। দু'হাত বুকের কাছে যুক্ত করে নমস্কার জানালো।

আজও তার দিকে চেয়ে রমণীর শান্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের মহিমা দেখলেন তিনি।

—বসুন।

সামনের দুটো চেয়ারে তারা বসল। মুখার্জি সাহেবের মনে হল, সংকট কেবল যেন ওই সুমনা মেয়েটির, তার চোখে-মুখে উদগ্রীব প্রতীক্ষা। যমুনা বিশ্বাস স্থির অচঞ্চল। তার দিকে চেয়ে মুখার্জি সাহেব বললেন, আমার যেটুকু সাধ্য আমি করব…কিন্তু আমার সাধ্য খুব সীমিত।…

আপনার কাছ থেকে রিভিউ আর মারসি পিটিশন লিখিয়ে এ কেস নিয়ে আমি প্রোসিড করলে জয়েন্ট সেক্রেটারি আর সেক্রেটারিই তা নাকচের মন্তব্য করে মিনিস্টারের কাছে পাঠাবেন—তখন মন্ত্রীকে দিয়ে আর কিছু করানো যাবে না।

রমণীর তেমনি স্থির শান্ত প্রতীক্ষা।

একটু থেমে মুখার্জি সাহেব আবার বললেন, শুনন, অ-ফ্ দি রেকর্ড আপনাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি ··আশা করব সেটা আপনারা দু'জন ছাড়া আর তৃতীয় কেউ জানবে না —

যমুনা বিশ্বাস সামান্য মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

—আমি চাই আপনার রিভিউ আর মারসি পিটিশন মন্ত্রীর হাত দিয়েই আমার কাছে আসুক। পিটিশনে কি লেখা হবে আমি বলে দিচ্ছি, সেটা নিয়ে আর আপনি এই খামে যা লিখেছেন সেটা অন্য আর একটা খামে পুরে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন। দুটোই তাঁর হাতে দিন—

মৃদু গলায় যমুনা জিজ্ঞেস করল, মন্ত্রী ঈশ্বরদাস জালান?

মুখার্জি সাহেব হাসলেন একটু। —তা-ও জানেন দেখছি!

—কিন্তু তাঁর নাগাল আমি কি করে পাব?

—সকাল সাতটার মধ্যে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করুন···অগাধ পণ্ডিত আর খুবই সজ্জন মানুষ তিনি, তাছাড়া আপনি ছাড়বেন কেন, দেখা না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকতে পারবেন না?

যমুনা আস্তে মাথা নাড়ল। পারবে।

—খুব বেশি ব্যস্ত না থাকলে সে-সময় তিনি সকলের সঙ্গেই দেখা করেন। একদিনে না হলে দু'দিন তিনদিন যাবেন। মোট কথা পিটিশন আর আপনার লেখা এই স্টেটমেন্ট নিজে তাঁর হাতে দেবেন, পিটিশনের আগে আপনার লেখাটা তাঁকে আগে পড়তে অনুরোধ করবেন···তিনি বাংলাও খুব ভালো বলতে বা পড়তে পারেন—তিনি সদয় হোন বা না হোন আপনার পিটিশন অফিসিয়ালি ডিল্ করার জন্য প্রথমে আমার কাছেই আসবে—সেটা তাঁর হাতে দেবার দিন দশেক পরে এখানে এসে খবর নেবেন।

টেবিলের বোতাম টিপতে বাইরে বেল বাজল। বেয়ারা আসতে তাকে বললেন, আমি আধঘণ্টার মতো ব্যস্ত থাকব, তার মধ্যে অফিসের বা বাইরের কেউ যেন এসে বিরক্ত না করে। আর কয়েক শিট সাদা কাগজ দিয়ে যাও।

সে কাগজ রেখে চলে যেতে যমুনার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, যা বলি লিখে নিন—

পিটিশন বলতে ইংরেজিতে আসামীর কেস রিভিউ এবং ছাড়ের আবেদন। মুখার্জি সাহেব ডিক্টেট করে গেলেন, যমুনা বিশ্বাস চুপচাপ লিখে চলল। আবেদনের প্রায় সবটাই দণ্ডিত আসামীর শিক্ষাদীক্ষা তার পোষ্য আত্মজনের দিন-যাপনের সমস্যা আর আবেদনকারিণীর নিজের ব্যক্তিজীবনের দীর্ঘ সংগ্রাম আশা-আকাঙ্ক্ষা আর পনেরো বছরের প্রতীক্ষার যন্ত্রণার কথা। মুখার্জি সাহেব ইংরেজিতে সুপণ্ডিত, তাঁর বয়ানও সেই রকমই সহজ স্বচ্ছ আর হৃদয় স্পর্শ করার মতো। লিখতে লিখতে যমুনা বিশ্বাসের কৃতজ্ঞতা ভরা দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর উঠে এসেছে।

শেষ হতে মুখার্জি সাহেব বললেন, এত বড় অ্যাপীল পিটিশন টাইপ করে দিতে পারলে ভালো হত কিন্তু এ-সব জিনিস--

সুমু বলে উঠল, তার কোনো অসুবিধে নেই, কাকিমা নিজেই খুব ভালো টাইপিং জানে—

মুখার্জি সাহেবের প্রসন্ন দু'চোখ যমুনার দিকে।—আপনার স্ট্রাগলের কথা আমি কিছুই বাড়িয়ে বলিনি তাহলে···যাক, ভালো করে টাইপ করে সই করে নিজে মন্ত্রীর হাতে দেবেন, মন্ত্রীর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি—আর আপনার এই লেখাটা নিন, এটা অবশ্যই মন্ত্রীকে আগে পড়তে অনুরোধ করবেন—

—একটা কথা বলব?

এ-ও খুব কোমল আবেদনের মতো। মুখার্জি সাহেব তক্ষুনি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, বলুন—

—আপনি যতবার আপনি করে বলছেন আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে ··আমি সবদিক থেকে আপনার অনেক ছোট, দয়া করে তুমি করে

বলুন···।

অফিসে বসে মুখার্জি সাহেব এ-রকম আবেদনের প্রশ্রয় দেন না। মেয়েছেলেকে তো নয়ই। কিন্তু আজ দিলেন। হেসে বললেন, ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি পারো এটা টাইপ করে রেডি হয়ে নাও—দরকার হলে স্কুলে ছুটি নিয়েও মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে—

সুমনার দিকে চোখ পড়তেই কি ভেবে থমকালেন একটু। একবার আঙুল তুলে তাকে দেখিয়ে বললেন, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় একেও সঙ্গে নিও—মন্ত্রী সদয় না হলে ও চোখের জল ফেলতে পারবে, যেটা তুমি পারবে না বোধ হয়।

যমুনা বিশ্বাসকে এই প্রথম হাসতে দেখলেন তিনি। রূপসী নয়। কিন্তু এই হাসি যেন সুন্দরের আর এক রূপ। সুমনা লজ্জা পেয়ে মাথা নামিয়েছে। যমুনা বলল, ও সব সময়েই আমার সঙ্গে থাকে।

ওরা উঠল। মুখার্জি সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। যমুনা বিশ্বাসকে বললেন, একটা কথা, তোমরা আমাকে চেনো না, জানো না, কখনো দেখোনি—এখানে কখনো আসনি।

শোনার পর অদ্ভুত কমনীয় মুখ দেখল যমুনা বিশ্বাসের, কোনো কথা বলল না। শুধু মাথা নাড়ল।

তিন দিন পরে। টেবিলের ফোন বেজে উঠল। মুখার্জি সাহেব রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন।

—মুখার্জি, লাঞ্চের পরে একবার ঘরে এসো, কিছু কথা আছে। মন্ত্রী ঈশ্বরদাস জালান স্বয়ং।

গেলেন। ছুটো খাম তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী বললেন, এই ছুটো মন দিয়ে পড়ো, একজন মহিলার সেই পুরী প্যাসেঞ্জার ড্যাকুইটি অ্যাণ্ড মার্ডার কেসে কনভিকটেড এক আসামীর কেসে রিভিউ আর অ্যাকুইট্যালের অ্যাপীল, অলরেডি তার পনেরো বছর জেল-খাটা হয়ে গেছে—আর অন্যটা সেই মহিলার নিজের কিছু বক্তব্য, এটাই আগে পড়ো।

আমার মনে হয় হিউম্যানিটেরিয়ান পয়েন্ট অব ভিউ থেকে আমাদেব কিছু করার আছে—আই উইল বি হ্যাপি ইফ ইউ ক্যান ডু সামথিং—অফকোর্স এই আসামীর জেল-কনডাক্ট যদি ভালো হয়।

খাম দুটো নিয়ে মুখার্জি সাহেব নিজের ঘবে এলেন। কি ভাবে নোট দেবেন মুসাবিদা কবেই রেখেছিলেন। পবদিনের মধ্যেই তাঁর নোট প্রস্তুত। ··আসামীব পনেরো বছরেব জেল-কনডাক্ট আশ্চর্য রকমের ভালো, শিক্ষিত সংগ্রামী ছেলের এ-রকম ভয়াবহ অপরাধের প্রেরণা সম্পর্কে ইঙ্গিত, লিডার ধরা পড়া সত্ত্বেও তার না-পালানো এবং প্রকারান্তরে আত্ম-সমর্পণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত বড় ভাইয়ের অসহায় বোনের জীবন সংগ্রাম এবং আকূতি, সবশেষে সেই মোক্ষম যুক্তি—জাতির জনকের হত্যাব সঙ্গে যুক্ত গোপাল বিনায়ক গড্সেব রিভিউ ও মারসি-পিটিশন মঞ্জুরের নজির, তাকে যদি সমাজ-জীবনে পুনর্বাসনেব সুযোগ দেওয়া হতে পাবে, তাহলে নিষ্কলঙ্কভাবে পনেরো বছর জেল-খাটার পব পূর্ণ ঘোষকেও সেই সুযোগ দেবাব কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

সেই ফাইল প্রথমে গেল জয়েন্ট সেক্রেটারির টেবিলে, তাঁর কাছ থেকে সেক্রেটারির কাছে। দু'জনেই তাঁবা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মন্তব্য করলেন। এতবড় জঘন্য অপরাধের শাস্তি পনেরো বছরেব মধ্যে মকুব করা উচিত নয়। সেক্রেটারি আব জয়েন্ট সেক্রেটারি মুখার্জি সাহেবের সাক্ষাতে রসিকতা করে বলেছেন, মহিলার অ্যাপীল পড়ে এত সফ্ট হয়ে গেলে কেন হে মুখার্জি—এত উদার হলে দেশ থেকে যে জেলখানাই তুলে দিতে হয়!

মুখার্জি সাহেব মুখে আর তাঁদের কি বলবেন? ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন। তাঁদের এত প্রতিকূল মন্তব্য পড়ে মিনিস্টার না মত বদলান!

এই সময়েই সুমুকে নিয়ে যমুনা এলো খবর জানতে। বিমর্ষ মুখে মুখার্জি সাহেব তাকে জানালেন, মন্ত্রী তোমার ওপর খুবই সদয় ছিলেন, কিন্তু আমার ওপরওয়ালা দুজন খুব আপত্তি জানিয়ে নোট দিয়েছেন। এরপর মিনিস্টার কি করবেন তিনিই জানেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যমুনা বলল, মিনিস্টার ভালই করবেন। আপনি কিছু ভাববেন না···ওর ছাড়া পাবার

সময় হয়েছে, ছাড়া পাবে।

এমন অকপট সহজ জোরের সঙ্গে এ-কথা বলতে পারল কি করে মুখার্জি সাহেব ভেবে পেলেন না। তিনি তাকে আবার চার-পাঁচদিন পরে আসতে বললেন।

পরদিনই মুখার্জি সাহেবের ভাবনার অবসান। মন্ত্রীর কাছ থেকে সেই ফাইল আবার সেক্রেটারির কাছেই মন্তব্যসহ ফেরত এলো। তিনি নিজের হাতে লিখেছেন, পিটিশনারের আবেদন আর আসামীর সম্পর্কে বিবরণ পড়ে আমি ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রী মুখার্জির মত সমর্থন করতে বাধ্য হচ্ছি। আসামীর অপরাধের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও সেটা জাতির জনক হত্যার অপরাধের থেকে বড় নয়। সেই ষড়যন্ত্রের আসামীকে যদি সমাজ-জীবনে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে যে আসামীর জেল-কনডাক্ট এত ভালো তাকেও একই সুযোগ দেবার কথা চিন্তা করা উচিত।

সেক্রেটারি এ-সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে তাঁর মন্তব্য জানালে ভালো হয়।

বিপাকে পড়ে সেক্রেটারি তড়িঘড়ি পুনর্বিবেচনা করে এবারে আসামীকে মুক্তি দেবার অনুকূলে অনেক কথা লিখলেন। মন্ত্রীর সই হয়ে সে ফাইল গেল রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কাছে। তাঁর অনুমোদন নিতান্তই আনুষ্ঠানিক।

চতুর্থদিন দুপুরে সুমুকে নিয়ে যমুনা এলো। মুখার্জি সাহেব হাসি-মুখে উঠে দাঁড়ালেন।—কংগ্র্যাচুলেশানস, তোমারই জয় হয়েছে, গভর্নরের কাছ থেকে আজই ফাইল সই হয়ে এসেছে— পূর্ণ ঘোষ কালকের মধ্যেই রিলিজ-অর্ডার পেয়ে যাবে।

সুন্দর হাসিতে যমুনার সমস্ত মুখখানা ভরে গেল। সুমু আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আনন্দ দেখে এত আনন্দ মুখার্জি সাহেব কমই পেয়েছেন। আবার বসতে যাচ্ছিলেন, যমুনা এগিয়ে গিয়ে বলল, দাঁড়ান একটু—

ভালো করে বোঝার আগেই যমুনা নত হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

মুখার্জি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, প্রণাম কেন, আসল ক্রেডিট তো তোমার—তুমি তো আগে থেকেই জানতে তোমার ভদ্রলোকের ছাড়া পাবার সময় হয়েছে, জোর দিয়ে তা বলেওছো।

পনেরো বছরের তাপে-তপে এই শ্রান্ত মুখের হাসিটুকু আবারও বড় সুন্দর মনে হয়েছে মুখার্জি সাহেবের। জবাবটুকুও কানে লেগে থাকাব মতো।—আপনার কাছ থেকেও কত জোর পেয়েছি সে শুধু আমিই জানি। একটু ইতস্ততঃ করে আবার বলেছে, ও ছাড়া পেলে এখন আমরা আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করতে পারি?

মুখার্জি সাহেব নির্দ্বিধায় মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন। হেসে বলেছেন, পারো, বাট্ উইদাউট মাচ্ পাবলিসিটি।

তারপর···

আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় এই বড় হরফের রিপোর্ট।

কাল যমুনার বিয়ে।
